প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনও বিষয়ে সাম্মানিক (honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এ-ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়ণের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে সাম্মানিক মানের পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে — যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এই সব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন ; যখনই কোনো শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনও শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এরপর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হতে পারবে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ-ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার

উপাচার্য

চতুর্থ পুনর্মুদ্রণ : জানুয়ারি, 2016

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী এবং অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations and financial assistance of the Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

পরিচিতি

বিষয় : রাষ্ট্রবিজ্ঞান (সহায়ক পাঠ) : প্রথম পত্র : স্নাতকস্তর

Political Science (Subsidiary) : First Paper (SPS-I) : Bachelor Degree Programme (BDP)

পাঠক্রম

	রচনা	সম্পাদনা
পর্যায় : (Module) : 01 : রাজনীতিবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রতত্ত্ব		
একক (Unit) : 01-04 :	ড. রাখকৃষ্ণ দে	ড. শোভনলাল দত্তগুপ্ত অধ্যাপক সূর্য বন্দ্যোপাধ্যায়
পর্যায় : (Module) : 02 : মার্কসবাদ ও সমাজতন্ত্র		
একক (Unit) : 05-08 :	অধ্যাপক প্রসেনজিৎ মাইতি অধ্যাপিকা চিত্রিতা চৌধুরী	ড. অশোক মুখোপাধ্যায় অধ্যাপক সূর্য বন্দ্যোপাধ্যায়
পর্যায় : (Module) : 03 : সরকারের বিভিন্ন বিভাগ		
একক (Unit) : 09-12 :	ড. প্রভাসচন্দ্র রায়	অধ্যাপক শ্যামাপদ পাল অধ্যাপক সূর্য বন্দ্যোপাধ্যায়
পর্যায় : (Module) : 04 : সংবিধান ও সংবিধানবাদ		
একক (Unit) : 13-16 :	অধ্যাপক শ্যামলেশ দাস অধ্যাপক অরুণ দাঁ	ড. রাধারমণ চক্রবর্তী অধ্যাপক সূর্য বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিমার্জন, বিন্যাস ও সম্পাদনা

ড. দেবনারায়ণ মোদক

অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ ও অধিকর্তা, স্কুল অব্ হিউম্যানিটিস্ অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সেস

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনও অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনভাবে উদ্ধৃতি দেওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

অধ্যাপক (ড.) দেবেশ রায়

নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

স্নাতকস্তর **[Bachelor Degree Programme (BDP)]**

রাষ্ট্রবিজ্ঞান (সহায়ক পাঠ) প্রথম পত্র

[Political Science (Subsidiary) Paper-1 (SPS-I)]

[জুলাই, ২০১২ এবং তৎপরবর্তী শিক্ষাবর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য]

পর্যায় 01 : রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রতত্ত্ব

পৃষ্ঠা

একক 01 ❑ রাজনীতিবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও দৃষ্টিভঙ্গি 7–26

একক 02 ❑ রাষ্ট্রের উদ্ভব ও প্রকৃতি সম্পর্কিত বিভিন্ন তত্ত্ব 27–46

একক 03 ❑ রাষ্ট্রের কার্যাবলি সংক্রান্ত বিভিন্ন তত্ত্ব 47–74

একক 04 ❑ সার্বভৌমিকতা সম্পর্কিত বিভিন্ন তত্ত্ব 75–88

পর্যায় 02 : মার্কসবাদ ও সমাজতন্ত্র

একক 05 ❑ মার্কসবাদ 89–98

একক 06 ❑ নৈরাজ্যবাদ 99–105

একক 07 ❑ গণতান্ত্রিক সমাজবাদ, গিল্ড সমাজবাদ এবং ফেবিয়ান সমাজবাদ 106–113

একক 08 ❑ সর্বোদয় 114–123

পর্যায় 03 : সরকারের বিভিন্ন বিভাগ

পৃষ্ঠা

একক 09 ❑ আইন বিভাগ বা ব্যবস্থা বিভাগ **124–137**

একক 10 ❑ শাসন বিভাগ **138–152**

একক 11 ❑ বিচার বিভাগ **153–160**

একক 12 ❑ ক্ষমতা পৃথকীকরণের তত্ত্ব **161–166**

পর্যায় 04 : সংবিধান ও সংবিধানবাদ

একক 13 ❑ সংবিধান ও সংবিধানবাদ **167–174**

একক 14 ❑ সরকার ও তার বিভিন্ন রূপ **175–187**

একক 15 ❑ রাজনৈতিক দল **188–199**

একক 16 ❑ স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী এবং চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী **200–212**

প্রথম মুদ্রণ : ডিসেম্বর 2015

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর নিয়ম অনুযায়ী এবং অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations and financial assistance of the Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

একক—১ ❐ রাজনীতিবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও দৃষ্টিভঙ্গি

গঠন

১.০ উদ্দেশ্য

১.১ রাজনীতিবিজ্ঞানের সংজ্ঞা

১.১.১ রাজনীতিবিজ্ঞান হ'ল রাষ্ট্রকেন্দ্রিক বিজ্ঞান

১.১.২ রাজনীতিবিজ্ঞান সর্বজনিক বিষয়ের বিজ্ঞান

১.২ রাজনীতিবিজ্ঞান–অনুশীলনে অনুসৃত বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী

১.২.১ বিভিন্ন সাবেকি দৃষ্টিভঙ্গি

(ক) দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি

(খ) অভিজ্ঞতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি

(গ) ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি

(ঘ) আইনানুগ দৃষ্টিভঙ্গি

(ঙ) তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি

১.২.২ বিভিন্ন আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি

(ক) মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি

(খ) আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি

(গ) নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি

(ঘ) বাস্তু-পরিবেশ-তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি

১.৩ অনুশীলনী

১.৪ গ্রন্থপঞ্জী

১.০ উদ্দেশ্য

ব্যক্তি, সমাজ ও উভয়ের সম্পর্ককে জানার জন্য ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে বিভিন্ন শাস্ত্রের উদ্ভব ঘটেছে। রাজনীতিবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞানেরই একটি শাখা। ইউরোপে প্রাচীন গ্রীসে খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম-চতুর্থ শতকে রাজনীতি চর্চার নজির পাওয়া যায়। ভারতেও পঞ্চম শতকে রাজনীতিচর্চার নিদর্শন রয়েছে তৎকালীন ধর্মগ্রন্থ, নীতিশাস্ত্র, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে। পরবর্তী প্রায় কয়েক হাজার বছর ধরে রাজনীতিচর্চা সমাজবিজ্ঞানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে বিবেচিত হয়েছে। বিষয়বৈচিত্র্যও সমাজবিজ্ঞানের এই শাখাটিকে সমৃদ্ধ করেছে। বিভিন্ন ধরনের বিষয়কে রাজনীতিচর্চার আলোচ্য বিষয় হিসেবে গ্রহণ করায় রাজনীতিবিজ্ঞানের সংজ্ঞা প্রদানের ক্ষেত্রেও ভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। রাজনীতি আলোচনার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কেও রাজনীতিবিজ্ঞানীগণ একমত পোষণ করেন না। একক 'ক' -এর উদ্দেশ্য হ'ল রাজনীতিবিজ্ঞানের সংজ্ঞাপ্রদানের বিষয়টি আলোচনা করা। পরবর্তী পর্যায়ে রাজনীতিবিজ্ঞান-অনুশীলনের যে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পন্ডিতগণ কর্তৃক অনুসৃত হয়েছে তার মধ্যে প্রধান কয়েকটি দৃষ্টিভঙ্গিকে বাছাই করে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। এই সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গিগুলিকে সাধারণত সাবেকি এবং আধুনিক—এই দুটি ভাগে ভাগ করা হয়, যদিও এ ধরনের বিভাজন আদৌ যুক্তিসঙ্গত কিনা সে সম্পর্কে প্রশ্ন থেকে যায়। সাম্প্রতিককালে নারীবাদী আন্দোলন ও বস্তু-পরিবেশবাদী (Ecological) আন্দোলন রাজনৈতিক তত্ত্ব হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং রাজনীতির বিশ্লেষণে নুতন মাত্রা যোগ করেছে। আমাদের আলোচনার এই দু'টি দৃষ্টিথভঙ্গি সম্পর্কেও আলোকপাত করা হবে। এই এককটি পঠন-পাঠনের মধ্যে দিয়ে আমরা যে বিষয়গুলো জানতে পারব তা হ'ল —

- রাজনীতিবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর ভিন্নতার সংজ্ঞাপ্রদানে বহুমাত্রিকতা
- রাজনীতিবিজ্ঞানের অনুশীলনে অনুসৃত বিভিন্ন সাবেকি দৃষ্টিভঙ্গি, যেমন—দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি, অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি, আইনানুগ দৃষ্টিভঙ্গি এবং তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি।
- রাজনীতিবিজ্ঞানের অনুশীলনে অনুসৃত বিভিন্ন আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি, যেমন—মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি, আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং বাস্তু-পরিবেশবাদী দৃষ্টিভঙ্গি।

আমরা প্রত্যেকেই কোনও না কোনও ভাবে রাজনীতির সঙ্গে জড়িত—হয় সরাসরি নতুবা পরোক্ষভাবে। আমাদের মধ্যে অনেকেই আবার রাজনীতি থেকে দূরে থাকি বা রাজনীতি-নিরপেক্ষ বলে দাবি করি। এসব ক্ষেত্রে হয় আমরা রাজনীতির প্রতি অনীহাবশত নিরপেক্ষ থাকি অথবা নিরপেক্ষতার আড়ালে একধরনের সুযোগসন্ধানী রাজনীতির আশ্রয় নিই। কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করা হয়—রাজনীতি ব্যাপারটা কি? রাজনীতি বলতে কি বোঝায়?-তাহ'লে দেখা যাবে এই প্রশ্নের উত্তরদানে প্রত্যেকেই হয় ইতস্তত করছেন নতুবা উত্তরে যা বলছেন তা বিভিন্ন রকমের। কেউ হয়ত বললেন, রাজনীতি হ'ল কীভাবে দেশ পরিচালনার জন্য ক্ষমতাদখল করা যায় এবং ক্ষমতায় টিকে থাকা যায় তার কৌশল বা কার্যকলাপ ; অনেকে হয়ত বলবেন, রাজনীতি আসলে কিছু পাবার জন্য এক ধরনের ব্যবস্থা ; আবার কেউ হয়ত মন্তব্য করবেন, আজকের রাজনীতি এতই সর্বগ্রাসী

যে সমাজের সর্বত্র—ক্লাবে, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে, মাঠে-ময়দানে, স্কুল-কলেজে, চাকুরিপ্রার্থী বাছাইকরণে এমনকি পরিবারের মধ্যেও রাজনীতি ঢুকে পড়েছে। হয়তো এও শোনা যাবে, রাজনীতি একটা নোংরা ব্যাপার বা কাজ যার সঙ্গে মিথ্যা, কপটতা, লোভ, স্বার্থপরতা এমনকি হিংসাও জড়িত ; এর থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই ভালো। উনবিংশ শতকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক হেনরি এডামস রাজনীতিকে ঘৃণা ও বিদ্বেষের এক সুশৃঙ্খল কাঠামো বলে অভিহিত করেছিলেন অথচ প্রাচীন গ্রীসের অ্যারিস্টটল থেকে শুরু করে আধুনিক যুগের বহু তাত্ত্বিকই রাজনীতিকে অন্যতম মহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে অভিহিত করেন।

১.১.১ রাজনীতিবিজ্ঞান হ'ল রাষ্ট্রকেন্দ্রিক বিজ্ঞান

প্রাচীন গ্রীসে খ্রীষ্ট পূর্ব ষষ্ঠ-চতুর্থ শতকে এথেন্স, স্পার্টার ন্যায় বহু জনপদ ছিল। এই সমস্ত জনপদগুলোকে বলা হ'ত Polis যা বর্তমানে নগরের আয়তন বা ক্ষদ্রায়তন বিশিষ্ট হওয়ায় নগর-রাষ্ট্র (ciy-state) নামে অভিহিত করা হয় (যদিও নগর-রাষ্ট্রের পরিবর্তে জনপদ বা পুরসমাজ বলাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত)। এই সমস্ত জনপদগুলোর শাসনকার্য পরিচালনার ধরনও ছিল বিভিন্ন রকমের—রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র, বণিকতন্ত্র, সাধারাণতন্ত্র প্রভৃতি। এই সমস্ত Polis বা তথাকথিত নগর-রাষ্ট্র সম্পর্কিত বিজ্ঞানকে Politics, বা রাজনীতিবিজ্ঞান হিসেবে উল্লেখ করা হয়। তৎকালীন গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল এই অর্থেই তাঁর গ্রন্থের নামকরণ করেন Politics। রাজনীতির প্রাচীনতম সংজ্ঞাটি এই উদ্ভবগত দিকটিকেই চিহ্নিত করে—'রাজনীতিবিজ্ঞান হল রাজনীতি তথা রাষ্ট্র সম্পর্কিত বিশেষ জ্ঞান'।

রাজনীতিশাস্ত্রের এই সংজ্ঞাটি দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতিচর্চার অন্যতম সংজ্ঞা হিসেবে চলে আসছে। ঊনবিংশ-বিংশ শতকের প্রথম দিকে জাতীয় রাষ্ট্রের প্রাধান্যের সময়ে রাজনীতিবিজ্ঞানীগণ এই প্রাচীনতম সংজ্ঞাটিই গ্রহণ করেন। উদাহরণ হিসেবে গার্ণার (Garner)–এর দেওয়া সংজ্ঞাটির উল্লেখ করা যেতে পারে-'সংক্ষেপে বলা যায়, রাজনীতিবিজ্ঞানের শুরু ও শেষ রাষ্ট্রকে নিয়ে।' গার্ণার-এই সংজ্ঞাকেই আরো সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেন গেটেল (Gettel)। গেটেল যে সংজ্ঞা দেন তাহল, 'রাষ্ট্র কি ছিল, কি হয়েছে আর ভবিষ্যতে কিরূপ হওয়া উচিত তারই নীতিভিত্তিক অনুসন্ধান ও চর্চার নাম রাজনীতিবিজ্ঞান'। গিলক্রাইস্ট (Gilchrist) –এর মতে, 'রাজনীতিবিজ্ঞান রাষ্ট্র ও সরকারের আলোচনা করে'। পল জানে (Paul Janet) –এর মতে, রাজনীতিবিজ্ঞান হ'ল সমাজবিজ্ঞানের সেই শাখা যা রাষ্ট্রের ভিত্তি, সরকারের নীতি ও আদর্শ নিয়ে আলোচনা করে।' পোলক (Pollock) এবং জেলিনেক (Jellinek) রাজনীতিবিজ্ঞানকে তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক—এই দুই ভাগে বিভক্ত করে বলেন, 'তত্ত্বগতভাবে রাজনীতিবিজ্ঞান রাষ্ট্রের উদ্ভব, প্রকৃতি, ব্যপ্তি ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক, স্বাধীনতা প্রভৃতি আলোচনা করে আর ব্যবহারিক দিক থেকে রাজনীতিবিজ্ঞান হ'ল সরকার, সংবিধান, আইনপ্রণয়ন, বিচার কূটনীতি প্রভৃতি আলোচনা সংক্রান্ত বিজ্ঞান।

রাজনীতিবিজ্ঞানের রাষ্ট্রকেন্দ্রিক সাবেকি সংজ্ঞার পরিমার্জিত আধুনিকরূপ দেখা যায় ডেভিড ইস্টন (David Easton) -এর রচনায়, যদিও ইস্টন রাজনীতির আলোচনায় ব্যপ্তি আচরণকেই গুরুত্ব দেন। ইস্টন (১৯৫৩/১৯৬৫) রাজনীতিতে মানের কর্তৃত্বমূলক বন্টন, (authoritative allocation of values) বলে অভিহিত করেন। আপাতদৃষ্টিতে ইস্টনের সংজ্ঞায় রাষ্ট্রের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ না থাকলেও কর্তৃত্বমুলক বন্টন যে রাষ্ট্রর মাধ্যমেই একমাত্র সম্পাদিত হয় তা উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না।

সীমাবদ্ধতা : সাম্প্রতিকালে হেউড (Haywood) রাজনীতিবিজ্ঞানের রাষ্ট্রকেন্দ্রিক সংজ্ঞার কতগুলি সীমাবদ্ধতার উল্লেখ করেন। প্রথমত, রাজনীতিকে শুধুমাত্র রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ / সংগঠনের মধ্যে আবদ্ধ রাখার অর্থ হ'ল রাজনীতির পরিধিকে সংকুচিত করা; রাজনীতি যেন শুধুমাত্র আইনসভা, মন্ত্রিমন্ডলী, বিভিন্ন সরকারী বিভাগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং রাজনীতিবিদ ও সরকারী কর্মচারীদের এক্তিয়ারভুক্ত। সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যেমন, ব্যবসায়ী সংস্থা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠী, পরিবার রাজনীতির উর্ধ্বে। তাছাড়া রাজনীতিকে রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীর মধ্যে আবদ্ধ রাখলে বর্তমানে বহুজাতিক সংস্থাগুলি বা প্রচারমাধ্যম, আন্তর্জাতিক সংগঠন ও বিধিনিষেধ ব্যক্তিজীবনকে যে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে তাকে অস্বীকার করতে হয়। দ্বিতীয়ত, বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্ট্রই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। জনপ্রতিনিধিমূলক শানব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের উদ্ভব ও প্রসার অবশ্যম্ভাবী। এমতাবস্থায় রাজনীতিকে রাষ্ট্রকেন্দ্রিক করার অর্থই হ'ল রাজনীতি ও দলীয় রাজনীতিকে সমার্থক হিসেবে দেখা। এর ফলে দলীয় ব্যবস্থার কুফলগুলি রাজনীতির কুফল হিসেবে বিবেচিত হতে থাকে। স্বার্থপরতা, শঠতা, উৎকোচগ্রহণ, ঘৃণা, দুর্নীতি, হিংসা—সমস্তই যেন রাজনীতির বৈশিষ্ট্য। প্রত্যাশা করা হয় সরকারী কর্মচারী এবং বিশেষ করে বিচারকগণ রাজনীতিনিরপেক্ষ থাকবেন। সম্ভবত এই ধারণার বশবর্তী হয়েই সাম্প্রতিককালে তথাকথিত অরাজনৈতিক সংগঠনগুলির উপর গুরুত্ব আরোপের পৌরসমাজ (civil society—অর্থের রূপান্তর ঘটিয়ে অরাজনৈতিক সংস্থা হিসেবে বিবেচনা করে) গঠনের প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। রাজনীতি থেকে বিমুখ হয়ে বা সরে দাঁড়িয়ে সুস্থ সমাজ গঠনের সম্ভাবনা তাই অলীকই রয়ে গেছে।

১.১.২ রাজনীতিবিজ্ঞান সর্বজনিক বিষয়ের বিজ্ঞান

রাজনীতিবিজ্ঞানী অ্যারিস্টটল, জন লক, হেগেল, জন স্টুর্য়ার্ট মিল সাম্প্রতিককালে আরেন্ট (Arendt) রাজনীতিকে সর্বজনিক বিষয় বা সরকারী বিষয় (Public) বলেও উল্লেখ করেন। অর্থাৎ রাজনীতি (politics) এবং সর্বজনিক বিষয় (Public) সমার্থক। অন্যভাবে বলা যায় রাজনীতি ও অরাজনীতির মধ্যে পার্থক্য হল সর্বজনিক (public) এবং ব্যক্তিগত (private) বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য। সাধারণত Public –এর বাংলা সরকারী করা হয় কিন্তু সঠিক অর্থ হল সর্বজনীন যা সরকারী এবং বেসরকারী (যেমন পাবলিক লাইব্রেরী, পাবলিক হল) হতে পারে। হেউড (Haywood)–এর মতে, রাজনীতিকে এভাবে সংজ্ঞায়নের নজির পাওয়া যায় অ্যারিস্টটলের Politics গ্রন্থে যেখানে অ্যারিস্টটল মানুষকে রাজনৈতিক জীব বলে উল্লেখ করেন। একমাত্র রাজনৈতিক সমাজেই মানুষের সুন্দর জীবন সম্ভব। এ কারণেই অ্যাসিস্টটল রাজনীতিকে প্রধান বিজ্ঞান (Master Science) বলে উল্লেখ করেন।

কিন্তু সমস্যা হ'ল সার্বজনীন ক্ষেত্র এবং ব্যক্তিগত ক্ষেত্র—এই দুই এর মধ্যে সীমারেখা টানা কি সম্ভবপর? সাধারণত সর্বজনিক বা সরকারী (যদিও উভয় শব্দ সমার্থক নয়) বলতে রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন সংগঠন/সংস্থা, রাষ্ট্রাধীন সংস্থাসমূহকে বোঝায় এবং ব্যক্তিগত ক্ষেত্র বলতে পুরসমাজকে বোঝায় যেমন পরিবার, ব্যবসায়ী গোষ্ঠী, বিভিন্ন ক্লাব, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা যা ব্যক্তিদের নিজস্ব প্রচেষ্টায় স্বীয় গোষ্ঠস্বার্থ সাধনের জন্য গড়ে ওঠে ও পরিচালিত হয়। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে পরিচালনা ও ব্যয়ভারের দায়িত্ব থাকে রাষ্ট্রের হাতে। টমাস হবস্ (Thomas Hobbes) এর রচনায় অবশ্য এ ধরনের বিভাজন নেই। কিন্তু জন লক্ (John Lock) এবং বিশেষ করে হেগেলের (Hegel) রচনায় রাষ্ট্র ও পুরসমাজের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট। হেগেলকে অনুসরণ করে পরবর্তী

তাত্ত্বিকগণও পুরসমাজকে রাষ্ট্র বিকাশের পূর্ববর্তী স্তর হিসেবে ব্যাখ্যা করেন।

কিন্তু আর এক দল তাত্ত্বিক রয়েছেন যাঁরা ব্যক্তিগত ক্ষেত্রকে আরো সংক্ষিপ্তকরণে এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের সম্প্রসারণে পক্ষপাতী। উপরোক্ত বিশ্লেষণে পুরসমাজের বিভিন্ন সংস্থাসমূহ যেমন ব্যবসায়ী সংগঠন, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, ক্লাব গোষ্ঠী সংস্থাসমূহ কমবেশী সর্বজনিক ও রাজনীতিসম্পৃক্ত। এ কারণে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রকে সংকুচিত করে একান্ত ব্যক্তিগত ক্ষেত্র যেমন পরিবার, জাতিগোষ্ঠী, ব্যক্তি সম্পর্কের মধ্যে আবদ্ধকরণের চেষ্টা করা হয়। জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill)–এর একান্ত ব্যক্তিগত ক্ষেত্র (self-regarding aspect) এবং যা অপরকে স্পর্শ করে এমন ক্ষেত্র (other regareding aspect) মধ্যে পৃথকীরণের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

হেউড (Haywood)–এর মতে রাজনীতিকে সর্বজনিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত করায় রাজনীতি সম্পর্কে কতকগুলি ইতিবাচক ও নেতিবাচক ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। অ্যারিস্টটল-এর ঐতিহ্য অনুসারী বিশ্লেষণে রাজনীতিকে সর্বজনিক হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং রাজনীতিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক নৈতিক ক্রিয়াকলাপ বলে গণ্য করা হয়েছে। আধুনিক যুগে Arendt ১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত The Human Condition গ্রন্থে রাজনীতিকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মানবিক কাজ বলে উল্লেখ করেন। জন স্টুয়ার্ট মিলও গণতন্ত্রে সাফল্যের জন্য রাজনৈতিক চেতনাবৃদ্ধিতে শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেন। রুশো (Russeau) তো রাজনৈতিক ক্ষমতার হস্তান্তরকরণেরই বিরোধী ছিলেন। অপরদিকে আর এক দল তাত্ত্বিক রয়েছেন যাঁরা রাজনীতির নেতিবাচক দিকের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন, রাজনীতির ক্ষেত্রে থেকে ব্যক্তিকে যতদূর সরিয়ে রাখা যায় ততই নিরাপদ মনে করেন। একমাত্র ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেই ব্যক্তির পক্ষে বাছাইকরণ, স্বাধীনতা ও দায়িত্বের প্রশ্নগুলো গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়। যে রাষ্ট্র যত কম কাজ করেন। সেই রাষ্ট্র তত ভালো—এই বক্তব্যের মধ্যেই উপরোক্ত ধারণা স্পষ্ট। সাধারণত উদারনীতিবাদীতত্ত্বে এবং সাম্প্রতিককালে এই শতকের নয়ের দশকে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিপর্যয়ের পরে, গ্লসনস্ত ও পেরেস্ত্রৈকার যুগে এই প্রবণতা নূতন করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

সর্বজনিক ও ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের মধ্যে পৃথিকীকরণ এবং ব্যক্তিগত ক্ষেত্রকে সর্বজনিক তথা রাজনীতি থেকে বিমুক্ত করার বিরুদ্ধে মতও লক্ষ্য করা যায়। জন স্টুয়ার্ট মিল বর্ণিত একান্ত ব্যক্তিগত (self–regarding) ক্ষেত্র এবং 'অন্য বিষয়' (other regarding) ক্ষেত্রের মধ্যে ভেদরেখা টানা অসম্ভব। সাম্প্রতিক নারীবাদী আন্দোলনে (Feminist movement) এই বিভাজন সম্পর্কে আপত্তি তোলা হয়েছে। পরিবারকে রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখার অর্থই হ'ল নারীকে রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখা। পরিবার, নারীবাদীদের মতে, রাষ্ট্রেরই সংক্ষিপ্ত রূপ যেখানে রাষ্ট্রের মতই পরিবারে বিভাজন, শোষণ, বঞ্চনা রয়েছে। এযাবৎকাল বিদ্যমান সমাজের ইতিহাস হ'ল শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস—পুরুষ ও নারীর মধ্যে সংগ্রামের ইতিহাস—কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর বহুল প্রচলিত প্রারম্ভিক বক্তব্যটিকে সামান্য পরিবর্তন করে উপস্থাপন করা হয়। নারীবাদীদের মতে, পরিবার ও রাজনীতির অত্যুক্তি—একান্ত ব্যক্তিগত ক্ষেত্র হিসেবে পরিবারকে সরিয়ে রাখা শুধমাত্র নিরর্থকই নয়—উদ্দেশ্যপ্রণোদিতও।

একইভাবে বলা যায়, ধর্মকে রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রেখে ধর্মনিপেক্ষতার যে বক্তব্য পেশ করা হয় তা অসঙ্গতিপূর্ণ। মানবিক চেতনা/মূল্যবোধের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ যে কোন ধর্মীয় আচরণই রাষ্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। বহুধর্ম-অধ্যুষিত রাষ্ট্রের একমাত্র রাষ্ট্রই যেহেতু সর্বজনিক সংস্থা সেহেতু রাষ্ট্রে এক্তিয়ার

থাকা উচিত সকল সংস্থাগুলো এমনকি ধর্মীয় সংস্থাকেও নিয়ন্ত্রণ করার। সাম্প্রতিককালে স্বল্পক্ষমতাসম্পন্ন (minimal state) এর প্রবক্তাগণ অবশ্য সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণের জন্য রাষ্ট্রের ক্ষেত্রকে সীমিতকরণ করে পৌরসমাজ /স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোর ক্রমবর্ধমান প্রসারের পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

কোন রাজনৈতিক ঘটনা, সমস্যা বা বিষয় বিশ্লেষণে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি অনুসৃত হতে দেখা যায়। এই সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গির আলোচনায় রাজনীতিবিজ্ঞানীগণ যে সমস্ত তালিকা পেশ করেছেন তা যেমন সম্পূর্ণ নয়, এই সমস্ত তালিকার বিষয়সূচিও সমরূপ নয়। যেমন, রাজনীতিবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিগুলোকে সাধারণত মূল্যমানসাপেক্ষ (Normative) এবং অভিজ্ঞতামূলক (Empirical) এই দুইভাগে ভাগ করা হয়। এ্যালান বল (Alan Ball) দৃষ্টিভঙ্গিগুলোকে সাবেকি এবং আধুনিক—এই দুইভাগে ভাগ করেছেন। সাবেকি দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে দার্শনিক (Philosophical), ঐতিহাসিক (Historical) এবং আইনানুগ (Juristic/Legalistic) এই তিনভাগে ভাগ করেন। হেউড রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে সাবেকি এবং বৈজ্ঞানিক এই দুইভাগে ভাগ করে সাবেকি দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে দার্শনিক (যা মূল্যমানসাপেক্ষ) এবং অভিজ্ঞতামূলক এই দুইভাগে ভাগ করেন। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোচনায় অন্যান্য তাত্ত্বিকগণ যেখানে শুরু করেন আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে হেউড সেখানে কার্ল মার্কসকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রথম তাত্ত্বিক বলে অভিহিত করে পরবর্তী পর্যায়ে আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করেন। ভ্যান ডাইক ১৯৬০ সালে প্রকাশিত তাঁর Political Science : A Philosophical Analysis গ্রন্থে রাজনীতি বিশ্লেষণের অনুসৃত দৃষ্টিভঙ্গির এক বিশাল তালিকা পেশ করেন। যেখানে চারটি ভাগে মোট বাইশটি দৃষ্টিভঙ্গি স্থান পেয়েছে। এই বিস্তারিত তালিকার বিশ্লেষণে না গিয়ে আমরা রাজনীতি বিশ্লেষণে বহুল ব্যবহৃত যে শ্রেণীবিভাগ যথা সাবেকি এবং আধুনিক—এই দুই ভাগে বিভক্তকরণের মধ্য দিয়ে আলোচনা করব।

১.২.১ বিভিন্ন সাবেকি দৃষ্টিভঙ্গি

প্রথমেই বলে নেওয়া প্রয়োজন, সাবেকি এবং আধুনিক শব্দ দু'টি অত্যন্ত ভারাক্রান্ত শব্দ (loaded term)। রাজনীতিচর্চার এই বিভাজন করা শুধুমাত্র অসম্ভবই নয়, অবৈজ্ঞানিক এবং কষ্টকল্পিত। সাধারণত, আধুনিক এবং বৈজ্ঞানিক শব্দ দু'টিকে সমার্থক হিসেবে গণ্য করা হয়। রাজনীতিচর্চার ইতিহাসে ম্যাকিয়াভেলিকে (Machavelli) আধুনিক রাজনীতিচর্চার পুরোধা বলা হয় অথবা রাজনীতি বিশ্লেষণে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির সূচনাপর্ব হিসেবে ১৯০৮ সালে প্রকাশিত গ্রাহাম ওয়ালেস (Graham Wallas)-এক Human Nature in Politics এবং আর্থার বেন্টলের (Arthur Bentlay) 'The Process of Government' গ্রন্থ দুটিকে ধরা হয়। অনেক সময় আবার ১৯২৫ সালে প্রকাশিত মেরিয়ামের New Aspects of Politics গ্রন্থটিকে এবং পরবর্তী দুই দশকে ল্যাসওয়েলের Politics : Who gets, What, When, How, ডেভিড ট্রুম্যানের (David Truman) The Governmental Process এবং ইস্টনের The Political System অনুসৃত

দৃষ্টিভঙ্গিকে রাজনীতিচর্চার আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

দৃষ্টিভঙ্গির শ্রেণীবিভাজনের উপরোক্ত সীমাবদ্ধতার কথা মনে রেখেও আমরা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে সাবেকি এবং আধুনিক—এই দুইভাগে বিভক্তকরণের মাধ্যমে আলোচনা করব। সাবেকি দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যে সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গিগুলি আলোচিত হবে তা হ'ল—(ক) দার্শনিক (Philosophical) (খ) অভিজ্ঞতামূলক (Empirical) (গ) ঐতিহাসিক (Historical) (ঘ) আইনানুগ (Legalistic/Juridical) এবং (ঙ) তুলনামূলক (Comparative) দৃষ্টিভঙ্গি।

(ক) দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি

হেউড দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং মূল্যসাপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিকে সমার্থক হিসেবে গণ্য করেন। এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসৃত হয়েছে রাজনীতিচর্চার সূচনাপর্ব থেকেই গ্রীসে প্লেটোর রচনায়। বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের পরিবর্তে রাজনৈতিক ব্যবস্থা কিরূপ হওয়া উচিত, ব্যক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রে সম্পর্ক রাষ্ট্রকে মান্য করার কারণ বা ব্যক্তির অধিকারে সীমারেখা কী হওয়া উচিত—এই ধরনের প্রশ্নগুলিই প্রধান বলে বিবেচিত হয়। নৈতিক (Ethical), নির্দেশক (Prescriptive), মূল্যসাপেক্ষ (value – oriented), উদ্দেশ্যমূলক (Teleological)-প্রভৃতি বিষয়গুলি আলোচনার মানদণ্ড হয়ে দাঁড়ায়। মধ্যযুগে সেন্ট অগাস্টিন (Augustine), সেন্ট টমাস এ্যাকুইনাস (St, Thomas Acquians), পরবর্তীকালে বেন্থাম, হেগেল, টি. এইচ. গ্রীন প্রমুখ দার্শনিকগণ রাজনীতিচর্চার এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করেন। রাজনীতিবিজ্ঞান যেহেতু উদ্দেশ্যমূলক বিজ্ঞান-শুধুমাত্র বর্তমান সমাজবিশ্লেষণে নয়, নূতন সমাজ গড়ে তোলারও বিজ্ঞান—তাই রাজনীতি বিশ্লেষণে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্ব অসীম। সাম্প্রতিক কালে, বিশেষত আচরণবাদোত্তর পর্বে রাজনীতি বিশেষজ্ঞগণ পুনরায় দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি তথা মূল্যসাপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিকে রাজনীতিচর্চায় অনুসরণ করছেন।

(খ) অভিজ্ঞতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি

অভিজ্ঞতামূলক দৃষ্টিভঙ্গির সূচনাপর্বে প্রাচীন গ্রীসে এবং অ্যারিস্টটলের রচনায়। তৎকালীন গ্রীসের ১৫৮ টি (তথাকথিত নগর-রাষ্ট্রের) জনপদের প্রকৃতি অনুধাবন ও বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে অ্যারিস্টটল রাজনৈতিক ব্যবস্থার শ্রেণীবিভাগ করেন। পরবর্তীকালে ম্যাকিয়াভেলি, মন্তেস্কু-এর রচনায় এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসৃত হয়। লক এবং ডেভিড হিউম-এর রচনায় এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রধান বলে বিবেচিত হয় এবং ঊনবিংশ শতকে অগাষ্ট কোঁৎ (Auguste Connte)–এর রচনায় এই দৃষ্টিভঙ্গি পূর্ণতা লাভ করে।

এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে জ্ঞানের একমাত্র উৎস হ'ল অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞতা অর্জিত হয় পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে। সুতরাং, যে কোন তত্ত্ব বা প্রকল্প (Hypothesis) গড়ে তোলা এবং পরীক্ষিত হওয়া উচিত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে। এ কারণে বাস্তবে অবিকল উপস্থাপনা ও বিশ্লেষণের উপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত। প্রকৃতিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেহেতু জ্ঞানার্জন ঘটে পর্যবেক্ষণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে সেহেতু অভিজ্ঞতামূলক দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তাগণ রাজনীতিবিজ্ঞানের আলোচনায় প্রকৃতিবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করতে বলেন। বৈশিষ্ট্য হিসেবে বলা যায়, এই দৃষ্টিভঙ্গি—(১) পর্যবেক্ষণ তথা অভিজ্ঞতামূলক (২) বর্ণনাত্মক (২) মূল্যমান নিরপেক্ষ (৪) বিষয়গত (objective) । এই দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্ব আধুনিককালেও হ্রাস পায়নি। একদিকে যেমন এই দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির সোপান হিসেবে কাজ করেছে অপরদিকে প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক এবং তুলনামূলক রাজনীতির

বিশ্লেষণে ভিত্তিমূলক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

(গ) ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি

ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির মূল বৈশিষ্ট্য হ'ল বর্তমানের কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থা, সমস্যা, ধারণার বিশ্লেষণে তার পূর্বতন অবস্থা, প্রকৃতি কিরূপ ছিল, কিভাবে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হ'ল তার ব্যাখ্যা করা। এক কথায় অতীতের প্রেক্ষাপটে বর্তমানকে বিশ্লেষণ এবং বর্তমানের আলোকে ভবিষ্যৎকে গড়ে তোলা। এর জন্য প্রয়োজন প্রাপ্ত প্রমাণ ও তথ্যাদির ভিত্তিতে অতীতের বিশ্লেষণ। অ্যারিস্টটল রাষ্ট্রে উদ্ভবের কারণ অন্বেষণ করেছেন জৈবিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের তথা স্বাভাবিক সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা পরিবারের মধ্যে। এর থেকে তিনি সিদ্ধান্তে আসেন রাষ্ট্র ব্যক্তিজীবনে এক স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান। রোমান দার্শনিক সিসেরো (Cicero), জার্মান দার্শনিক হেগেল (Hegel), কার্ল মার্কস (Karl Marx) ঐতিহাসিক সাহায্যেই রাজনীতিকে ব্যাখ্যা করেছেন। আইভর জেনিংস (Ivor Jennings). রবার্ট ম্যাকেঞ্জিও (Robert Mackenzie) ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই ব্রিটিশ সংবিধানকে ব্যাখ্যা করেছেন। সাম্প্রতিককালে রাজনীতিবিজ্ঞানী মাইকেল ওকসট (Michael Oakeshot) রাজনীতির বিশ্লেষণে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্বের কথা বলেন।

অবশ্য অধিকাংশ সময়েই অতীতকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রকৃত তথ্যের অভাব বা অপূর্ণতা অনুমাননির্ভর ইতিহাস (Conjectural History) গড়ে তোলে। এর ফলে বিভিন্ন পর্বে ইতিহাসের বিনির্মান ঘটতে থাকে। তাছাড়া, ইতিহাস রচনায় কোন একটি বিশেষ দিক যেমন রাজনৈতিক বা সামরিক দিকের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় অথবা আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটকে বাদ দিয়ে রাজনীতির স্বরূপ উদঘাটন সম্ভবপর নয়। সর্বোপরি, ইতিহাস শুধুমাত্র ধারাবাহিক ঘটনার বিবরণমাত্র নয়। অনুসন্ধানী তথা ঐতিহাসিকের প্রবণতা ইতিহাস বিশ্লেষণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। হেগেল, কার্ল মার্কস-উভয়েই রাষ্ট্রে উদ্ভবে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুমান করছেন কিন্তু একজন রাষ্ট্রকে দেখেছেন ভাব / সত্ত্বার চরম প্রকাশ হিসেবে ; অন্যজন শ্রেণীশোষণের যন্ত্র বা সংগঠিত ক্ষমতার প্রকাশ হিসেবে।

(ঘ) আইনানুগ দৃষ্টিভঙ্গি

আইনানুগ দৃষ্টিভঙ্গি বলতে বোঝায় আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের বিচার-বিশ্লেষণ। সাংবাদিক ও সাধারণ আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন সংস্থা, সরকারী বিভাগসমূহের গঠন, ক্ষমতা, কার্যাবলী ও পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণই এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রধান লক্ষণ। এ কারণে এই দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি (Institutional Apporach) এবং বর্ণনাত্মক ও অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সংগত বলে মনে করা হয়। অ্যারিস্টটলের পলিটি (Polity) বিশ্লেষণে যেমন এর নজির পাওয়া যায়। আধুনিক যুগে ডাইসির (A.V. Dicey) বিশ্লেষণে এই দৃষ্টিভঙ্গিই অনুসৃত হয়েছে। দুর্গাদাস বসু (Durga Das Basu) –র ভারতীয় সংবিধান বিশ্লেষণেও এই দৃষ্টিভঙ্গির ছাপ অত্যন্ত স্পষ্ট।

আইনানুগ দৃষ্টিভঙ্গি এক ধরনের সংকীর্ণতা দোষে দুষ্ট। আইনানুগ কাঠামোর বাইরে যে সমস্ত সংস্থা বা গোষ্ঠী, যেমন রাজনৈতিক দল, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী, নৃজাতি গোষ্ঠী (Ethnic group) রয়েছে যা রাজনীতিকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে তা এই বিশ্লেষণে গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয় না। তাছাড়া, কোন রাজনৈতিক কাঠামো গড়ে ওঠার পিছনে যে আর্থ—সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক শক্তিগুলি ক্রিয়াশীল থাকে তাও এই বিশ্লেষণে

স্থান পায় না।

(ঙ) তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি

রাজনীতির বিশ্লেষণে তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি গুরুত্বপূর্ণ। ওই দৃষ্টিভঙ্গিকে সাবেকি দৃষ্টিভঙ্গির তালিকায় রাখা কতদূর যুক্তিযুক্ত সে সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে। প্রাচীন গ্রীসে অ্যারিস্টটলের রাজনীতিচর্চার মূলে ছিল এই দৃষ্টিভঙ্গি। আবার, এই শতকের ষাটের দশকে গোষ্ঠীকেন্দ্রিক রাজনীতি বিশ্লেষণের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্ব অসাধারণভাবে বৃদ্ধি পায়। জি. এ. আলমন্ড (G. A. Almond), লুসিয়েন পাই (Lucian Pye). প্রমুখের রচনায় এই দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাপক ছাপ ফেলে। সুতরাং তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিকে সাবেকি এবং আধুনিক—এই দুই ধারাতেই রাখা যেতে পারে।

তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির সাবেকিকরণ লক্ষ্য করা যায় অ্যারিস্টটলের রচনায়। অ্যারিস্টটল বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে তুলনার জন্য দু'টি মানদণ্ড বেছে নেন—এখন রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য এবং দুই শাসকের সংখ্যা। তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলিকে ছয়টি ভাগে ভাগ করেন এবং পলিটি (Polity)-র সর্বাপেক্ষা কাম্য শাসনব্যবস্থা বলে মনে করেন। মন্তেস্কুও ব্রিটেন ও ফ্রান্সের রাজনৈতিক ব্যবস্থার তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাঁর রাষ্ট্রদর্শন গড়ে তোলেন। লর্ড ব্রাইস, স্ট্রং, ডাইসি প্রমুখ সংবিধান বিশারদগণও সংবিধানের শ্রেণীবিভাজনের এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করেন। তুলনামূলক বিশ্লেষণের সাবেকি দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণনাত্মক, প্রাতিষ্ঠানিক এবং রাষ্ট্রকেন্দ্রিক কিন্তু সাম্প্রতিক রাজনীতির বিশ্লেষণে, বিশেষত ষাটের দশকে মার্কিন-রাজনীতিবিজ্ঞানীদের রচনায় তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি এক নূতন মাত্রা পায়। রাজনীতি গোষ্ঠীকেন্দ্রিক বিশ্লেষণ শুরু হওয়ায় অপ্রাতিষ্ঠানিক গোষ্ঠীগুলির (যেমন রাজনৈতিক দল, চাপসৃষ্টিকারীগোষ্ঠী, পরিবার, নৃজাতিগোষ্ঠী) বিশ্লেষণ তুলনামূলক আলোচনায় গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হ'তে থাকে। তাছাড়া, রাষ্ট্র ও সরকারের পরিবর্তে রাজনৈতিক ব্যবস্থা আলোচনার কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিশ্বের রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রকৃতিও তুলনামূলকভাবে আলোচিত হ'তে থাকে। এই বিশ্লেষণে অনেক ক্ষেত্রেই উন্নয়নের মাত্রা, আধুনিকতা, শিল্পায়ন, রাজনৈতিক সচেতনতা প্রভৃতি বিষয়গুলি আলোচনার মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত হ'তে থাকে। অবশ্য এই বিশ্লেষণের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যেহেতু আধুনিকীকরণ (পশ্চিমী গণতন্ত্র ও পুঁজিতন্ত্রে অনুসরণ) ও পশ্চিমী রাজনৈতিক ধারণাসমূহ প্রধান মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত হয় সেহেতু তৃতীয় বিশ্বের রাজনীতি বিশ্লেষণে উক্ত মানদণ্ডের ব্যবহার কতদূর যুক্তসংগত সে প্রশ্ন থেকেই যায়।

১.২.২ বিভিন্ন আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধ থেকেই রাজনীতি বিশ্লেষণে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিসমূহ বিশেষত জীববিজ্ঞান ও পদার্থবিদ্যার পদ্ধতি ও সূত্রসমূহ ব্যবহৃত হ'তে থাকে। একদিকে সমাজতত্ত্বের উদ্ভব অপরদিকে সাবেকি দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে নূতনতর রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিশ্লেষণের সীমাবদ্ধতা রাজনীতিবিজ্ঞানীদের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিসমূহ প্রয়োগে অনুপ্রাণিত করে। সাবেকি দৃষ্টিভঙ্গিসমূহের রাষ্ট্রকেন্দ্রিক, প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যসাপেক্ষ, দার্শনিক বিশ্লেষণের পরিবর্তে পর্যবেক্ষণ, তথ্যসংগ্রহ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে রাজনীতির বিশ্লেষণ এবং সমাজসমস্যার সমাধানের তত্ত্বসমূহকে কাজে লাগানোর প্রবণতা দেখা যায়। ঊনবিংশ শতকের ত্রিশের দশকে অগাষ্ট কোঁৎ-এর সমাজবিশ্লেষণ শেষের ডুর্কহাইম (Durkheim) Rules of Sociological Method -এর প্রকাশ এই

প্রবণতারই প্রমাণ। অপরদিকে, কার্ল মার্কস সাবেকি রাজনীতিচর্চার দৈন্যতাকে তুলে ধরেন এবং সামগ্রিকতার প্রেক্ষাপটেই রাজনীতির বিশ্লেষণে এবং সমাজ পরিবর্তনের মূলসূত্রগুলি চিহ্নিতকরণে অগ্রসর হন। সমাজকে শুধমাত্র বিশ্লেষণই নয়—এই বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে সমাজ পরিবর্তনের মূল চালিকাশক্তিকে চিহ্নিতকরণ ও তৎসহ প্রয়োগের উপর গুরুত্ব দেন। এদিক থেকে কার্ল মার্কসকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির মাধ্যমে রাজনীতি বিশ্লেষণের প্রথম তাত্ত্বিক বলা যায়।

বিংশ শতকের প্রথম থেকেই রাষ্ট্রকেন্দ্রিক বিশ্লেষণের পরিবর্তে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর আচরণকেন্দ্রিক বিশ্লেষণ শুরু হয় এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে এই প্রবণতা এক বৌদ্ধিক আন্দোলনের রূপ নেয়। এই আন্দোলনেকে রাজনীতিচর্চার ইতিহাসে আচরণবাদী বিপ্লব নামে অভিহিত করা হয়। ১৯৬০-এর দশকে রাজনীতিচর্চার অনুসৃত সব দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ শোনা যায় নারীবাদী আন্দোলনের এবং পরিবেশবাদী তাত্ত্বিকদের রচনায়। নারীবাদীতাত্ত্বিকদের বক্তব্য হ'ল এযাবৎকাল রাজনীতিটা পুরোমাত্রায় পুরুষতান্ত্রিক এবং এ কারণে নারীদের যোগ্য অবস্থানের বিষয়টি অনুচ্চারিত এবং অবহেলিত থেকে গেছে। পরিবেশবাদীগণ রাজনীতিচর্চায় দক্ষিণপন্থী, বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গিসমূহের তথা যাবতীয় দৃষ্টিভঙ্গিগুলিকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক বলে সমালোচনা করেন এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিকবাদের পরিবর্তে গোটা বিশ্ব-পরিবেশের প্রেক্ষাপটে, জীবজগৎ-এর বিভিন্ন প্রাণী, উদ্ভিদ ও পদার্থসমূহের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে রাজনীতির বিশ্লেষণ করেন। এভাবে ১৯৭০-এর দশকে পরিবেশ-পরিমণ্ডল শুধমাত্র জীববিদ্যা বা পদার্থবিদ্যার অন্তর্গত না থেকে রাজনীতিচর্চার অন্যতম মতাদর্শ হিসেবে স্থান করে নেয়। আমাদের এই প্রবণতাগুলিকে বিবৃত করার চেষ্টা হয়েছে। আধুনিক রাজনীতিচর্চার দৃষ্টিভঙ্গির তালিকায় যে-সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গিগুলিকে স্থান দেওয়া হয়েছে তা হ'ল—(১) মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি (২) আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি (৩) নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি (৪) বস্তু-পরিবেশবাদী দৃষ্টিভঙ্গি।

(ক) মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি

মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে হেউড রাজনীতিচর্চার প্রথম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি বলে অভিহিত করেন। মিলিব্যান্ড (Miliband) *Marxism And Politics* গ্রন্থের ভূমিকায় রাজনীতি সম্পর্কে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির আলোচনার কয়েকটি সমস্যার উল্লেখ করেন। প্রথম সমস্যা হ'ল মার্কসবাদ শব্দটি নিয়ে। মার্কসবাদ শব্দটি কার্ল মার্কস-এর মৃত্যুর পর ব্যবহৃত হয়েছে কার্ল মার্কস এবং তার সহযোগী বন্ধু ফ্রেডরিক এঙ্গেলস-এর অনুসৃত তত্ত্ব আলোচনায়। পরবর্তীকালে এই মতবাদ আলোচিত, অনুসৃত এবং সমৃদ্ধ হয়েছে বহু তাত্ত্বিক / রাজনীতিবিদদের দ্বারা, যাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন লেনিন, রোজা লুক্সেমবুর্ক, গ্রামসি এবং ট্রটস্কি প্রমুখ যাদের মিলিব্যান্ড ধ্রুপদী মার্কসবাদী বলে উল্লেখ করেছেন। সোভিয়েত রাশিয়া এবং চীনে মার্কসবাদের প্রয়োগিক দিকগুলির উপর বিশেষ যত্নশীল হন যথাক্রমে স্তালিন এবং মাও-জে-দঙ। বিংশ শতকের বিশের দশকের পরবর্তী পর্যায়ে একদিকে যেমন সোভিয়েত রাশিয়ার মার্কসবাদের মূলসূত্রগুলিকে চিহ্নিতকরণের প্রয়াস শুরু হয় এবং মার্কস-এঙ্গোলস-লেনিনবাদের প্রবক্তা (বাছাই করা) বিরোধী বক্তব্য সংশোধনবাদী প্রতিক্রিয়াশীল বলে বাতিল করা হয়; অপরদিকে প্রায় প্রত্যেক তাত্ত্বিকই নিজস্ব ধাঁচে মার্কস এবং এঙ্গোলস -এর রচনাকে ব্যবহার করে মার্কসবাদ -এর বিভিন্ন ধারার সৃষ্টি করেন। আমাদের আলোচনা মার্কস এবং এঙ্গোলস -এর বক্তব্যের মধ্যে মূলত সীমাবদ্ধ থাকবে।

মার্কস এবং এঙ্গেলস -এর বক্তব্যকে নিজের মত করে সাজিয়ে নিয়ে মার্কসবাদের বিভিন্ন ধারার সৃষ্টির অন্যতম কারণ হ'ল রাজনীতি সম্পর্কে কার্ল মার্কস -এর কোন সুনির্দিষ্ট, সুবিন্যস্ত তত্ত্বের অভাব। কার্ল মার্কস -এর অধিকাংশ রচনাই, যেমন The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte (১৮৫২), The Civil war in France (১৮৭১), Communist Manifesto (১৮৪৮), Critique of the Gotha Programme (১৮৭৫) কোন বিশেষ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আশু ঘটনার চাপে লিখিত। এই ঐতিহাসিক পটভূমি বাদ দিয়ে কার্ল মার্কস-এর বক্তব্য ব্যবহার করায় বিভিন্ন মার্কসবাদের সম্ভাবনা থেকে যায়। তাছাড়া, মার্কস সাধারণভাবে কোন রাজনৈতিক তত্ত্ব রচনার পরিবর্তে সমাজবিকাশের ধরন, প্রকৃতি এবং মূলসূত্রগুলিকে চিহ্নিতকরণ করেছেন। রাজনীতি যেহেতু সমাজেরই—এর ব্যবস্থাপনা তাই সমাজবিশ্লেষণে রাজনীতির প্রসঙ্গটি বার বার এসেছে। ব্যক্তি তথা সমাজজীবনের এই সামগ্রিকতার প্রেক্ষাপটেই মার্কস রাজনীতির বিশ্লেষণ করেছেন। ফলে রাজনীতি, দর্শন ইতিহাস সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতির মধ্যে কোন সুস্পষ্ট ভেদরেখা টানা সম্ভবপর নয়। সর্বোপরি কার্ল মার্কস রাজনীতির বিশ্লেষণ করেছেন সমাজবিকাশের প্রেক্ষাপটে; বিদ্যমান সমাজকাঠামোর বিশ্লেষণের মধ্যেই তিনি এই আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। সমাজরূপান্তরের প্রশ্নটিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তাই রাজনীতি সম্পর্কে মার্কসীয় দর্শন শুধুমাত্র বিদ্যমান সমাজব্যবস্থার বিশ্লেষণ-এর দর্শনমাত্র নয়—সমাজ পরিবর্তনেরও এক দর্শন।

কার্ল মার্কস রাজনীতিকে দেখেছেন ক্ষমতা বা প্রাধান্যের সমার্থক হিসেবে। রাজনীতি হ'ল সেই প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একটি শ্রেণী গোটা সমাজজীবনের উপর ক্ষমতা তথা প্রাধান্য বজায় রাখে। মার্কসীয় তত্ত্বে ক্ষমতার ধারণাটি যেহেতু শ্রেণী — ধারণার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, সেহেতু শ্রেণীর উদ্ভবের সঙ্গে রাজনীতির উদ্ভব। উদারনীতিবাদীতত্ত্বে এই মত পোষণ করা হয় যে, রাষ্ট্র কর্তৃক ব্যবহৃত বল প্রয়োগ যথাযথ ও বৈধ, কারণ রাষ্ট্র সামগ্রিকভাবে সমাজের সকলের অথবা অন্ততপক্ষে সংখ্যাধিক জনের জন্য গঠিত একটি প্রতিষ্ঠান। উদারনীতিবাদীদের এই ধারণাকে মার্কসীয় তত্ত্ব অসত্য বলে মনে করে প্রত্যাখ্যান করে এবং রাষ্ট্রকে শ্রেণীশোষণের যন্ত্র বলে মনে করে। মার্কসের মতে, আদিম সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং সমাজস্বার্থের মধ্যে কোন সংঘাত ছিল না। ব্যক্তি কোন গোষ্ঠী দ্বারাই পরিচালিত হত এবং ঐ গোষ্ঠীতে তার অংশগ্রহণ ছিল প্রত্যক্ষ। ক্ষমতা বিচ্ছিন্নকরণ (Alienation) হয়নি। কিন্তু, ক্রমবিভাজনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে এবং এর ফলে ব্যক্তিস্বার্থের সঙ্গে সমাজস্বার্থের সংঘাত অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। প্রয়োজন হয় এই স্বার্থের দ্বন্দ্বের মোকাবিলার এক বিচ্ছিন্ন ক্ষমতার (alienated power) বা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার। রাষ্ট্র এবং অন্যান্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হ'ল ক্ষমতারই বাহন।

বস্তুত, মার্কসবাদ রাজনীতিকে সমাজজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে ব্যাখ্যা করেনি। এই মতবাদে সমাজজীবনকে একটি অখন্ড সমগ্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই সমাজজীবনের প্রকৃতি এবং পরিবর্তন ব্যাখ্যা সম্পর্কিত মার্কস -এর বক্তব্যকে মার্কস পরবর্তী মার্কসবাদী তাত্ত্বিকগণ বিশেষত এঙ্গেলস এবং প্লেখানভ শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে প্রকাশ করতে গিয়ে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ শব্দটি ব্যবহার করেন। একে মার্কসবাদের মূল তাত্ত্বিক ও দার্শনিক ভিত্তি বলে গণ্য করা হয়। এই ভিত্তির ওপরেই গড়ে ওঠে ঐতিহাসিক বিকাশ সংক্রান্ত নির্দিষ্ট তত্ত্ব যাকে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বা ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা বলা হয়। মার্কসীয় রাজনীতির আলোচনায় তাই এ বিষয়ে জানা অত্যন্ত জরুরী।

মার্কসবাদীরা মনে করেন যে, বস্তু, প্রকৃতি ও সত্তার বাস্তব অস্তিত্ব আছে; আমাদের চৈতন্যের বাইরে স্বতন্ত্রভাবে এর অবস্থান। দ্বিতীয়ত, এই তত্ত্ব মনে করে যে, সব বস্তু বা ঘটনার প্রবাহের বৈশিষ্ট্য তার অন্তর্দ্বন্দ্বে যা বিরোধের মধ্যে দিয়ে উচ্চস্তরে বিকাশ লাভ করে। আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে এই বিকাশে প্রক্রিয়াকে দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া বলে। সুতরাং, কোন বস্তু বা ঘটনাকে বুঝতে গেলে এর প্রকৃতি যে পরিবর্তনশীল তা উপলব্ধি করা প্রয়োজন। এই তত্ত্ব মনে করে যে, মানবজীবনের অস্তিত্বের জন্য প্রথম প্রয়োজন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান। মানুষ যা ভোগ করে তার সব কিছু অন্য প্রাণীর মত প্রকৃতি থেকে সরাসরি পাওয়া যায় না; যা তারা ভোগ করে তা তাদের উৎপাদন করতে হয়। উৎপাদন করতে গিয়ে তারা দৈহিক অথবা মানসিক শ্রমের মাধ্যমে প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদকে ভোগ্যবস্তুতে রূপান্তরিত করে। এই শ্রমপ্রক্রিয়ার মধ্যে যুক্ত রয়েছে (ক) উৎপাদনের উপকরণ, অর্থাৎ হাতিয়ার বা যন্ত্রপাতি, প্রাকৃতিক সম্পদ ও শ্রম ছাড়া অন্য উপাদান এবং (খ) শ্রম, যেহেতু মানুষের শ্রম ছাড়া উৎপাদন হতে পারে না। একদিকে উৎপাদনের প্রয়োজনে মানুষের তৈরী যন্ত্রপাতি বা হাতিয়ার-সহ সব বস্তু এবং অন্যদিকে মানুষের কর্মক্ষমতা, তার জ্ঞান এবং দক্ষতা উভয়ের এই সমন্বয় ও পারস্পরিক সম্পর্কে সৃষ্ট হয় উৎপাদিকা-শক্তি। (গ) বিষয়গত উৎপাদন করার জন্য মানুষকে সামাজিকভাবে সংগঠিত হতে হয় যা উৎপাদন সম্পর্ক নামে পরিচিত। সমাজের উৎপাদন সম্পর্কে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের উপর নির্ভরশীল। এই দুই-এর ঐক্যকে মার্কসীয় তত্ত্বে উৎপাদনপদ্ধতি বা উৎপাদনপ্রক্রিয়া বলা হয়।

উৎপাদন সম্পর্ক মানুষকে দু'টি মূল শ্রেণীতে বিভক্ত করে—একটি শ্রেণী মালিকানা বা অন্য উপায়ে উৎপাদনের উপকরণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং অন্য শ্রেণী উৎপাদনের উপকরণের মালিকানা ভোগ না করলেও শ্রম-শক্তির সাহায্যে উৎপাদনে অংশগ্রহণ করে। এই দুই শ্রেণীর অবস্থান পরস্পরবিরোধী, যেহেতু স্বার্থ পরস্পরবিরোধী। এরই ফলে শ্রেণীদ্বন্দ্ব বা শ্রেণীসংগ্রামের সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই দ্বন্দ্ব বিদ্যমান উৎপাদনপদ্ধতির উৎপাদনক্ষমতা নিঃশেষিত না হওয়া পর্যন্ত সংকটজনক বা বিস্ফোরক পর্যায়ে পৌঁছায় না। মার্কসবাদীদের মতে উৎপাদিকাশক্তির নূতন সম্ভাবনার পথে প্রচলিত উৎপাদন সম্পর্কে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এই দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি হয় সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তরের মাধ্যমে। এভাবেই জন্ম নেয় নূতন উৎপাদনপদ্ধতি। আদিমসাম্যবাদী সমাজ থেকে দাসসমাজ, সামন্তসমাজ, পুঁজিবাদী সমাজের বিকাশ এই দ্বান্দ্বিক নিয়মেই চালিত।

মার্কসীয় তাত্ত্বিকগণ মনে করেন, মানুষ অন্যান্য প্রাণী থেকে পৃথক এই অর্থে যে, সে তার জীবন ও পরিবেশ সম্পর্কে চিন্তা করতে পারে। এক্ষেত্রে বাস্তব জীবনই মুখ্য এবং চিন্তা-পরবর্তী কার্যক্রম যা জীবন দ্বারা অর্থাৎ সমাজজীবনের বাস্তব অবস্থার দ্বারা নির্ধারিত হয়। Preface : A Contribution to the Critique of Political Economy (১৮৫৯) এবং Capital গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে কার্ল মার্কস উল্লেখ করেন যে, মানুষ তাদের জীবনের সামাজিক উৎপাদনে তাদেরই ইচ্ছানিরপেক্ষ এবং আবশ্যিক এক উৎপাদন সম্পর্কে আবদ্ধ হয়, যে উৎপাদন সম্পর্ক তাদের বস্তুগত উৎপাদিকা-শক্তির এক উন্নত পর্যায়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। উৎপাদন সম্পর্কের এই সামগ্রিক অবস্থা সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো বা প্রকৃত ভিত্ তৈরী করে যার উপরে আইনগত এবং রাজনৈতিক উপরি কাঠামো এবং তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সামাজিক চেতনা গড়ে ওঠে। বস্তুজীবনের উৎপাদন-পদ্ধতি সাধারণভাবে সামাজিক রাজনৈতিক এবং বৌদ্ধিক জীবনপ্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে।

অর্থনৈতিক কাঠামোকে সমাজের ভিত্তি হিসেবে এবং রাজনৈতিক কাঠামো এবং প্রক্রিয়াকে উপরি কাঠামো হিসেবে উল্লেখ করায় মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে অর্থনৈতিক নিয়তবাদী দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে সমালোচনা করা হয়। অর্থাৎ. রাজনৈতিক ব্যবস্থা বা প্রতিষ্ঠান সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোরই প্রতিফলন। মার্কসবাদী তত্ত্বকে এভাবে ব্যাখ্যা করা আসলে মার্কসবাদের দ্বান্দ্বিক উপলব্ধি করতে অসমর্থ হওয়া। The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte গ্রন্থে কার্ল মার্কস এবং এঙ্গেলস রাষ্ট্রকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার হুবহু প্রতিচ্ছবি হিসেবে না দেখে রাষ্ট্রের আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্যের কথা বলেন। নিকোস পুলানৎজাস (Nicos Poulantzas) রাষ্ট্রে এই আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্যের বিরাটত্ব বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেন। J. M. Maquire-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী পুঁজিবাদীব্যবস্থা যেহেতু অপরিকল্পিত এবং প্রতিযোগিতামূলক, সেহেতু শ্রেণীপ্রাধান্য বজায় রাখার জন্য এবং পুঁজিপতিশ্রেণীর মধ্যেকার দ্বন্দ্ব নিরসনের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে পুঁজিবাদীব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্য রাষ্ট্রে স্বাতন্ত্র্য প্রয়োজন।

(খ) আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি

আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভবের অন্যতম কারণ ছিল সাবেকি মূল্যবানসাপেক্ষ, প্রাতিষ্ঠানিক, রাষ্ট্রকেন্দ্রিক রাজনীতিচর্চার বিলোপ ঘটিয়ে মূল্যমানিরপেক্ষ, অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিসমৃদ্ধ রাজনীতিচর্চার সূচনা করা। আচরণবাদী তাত্ত্বিকগণ ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর রাজনৈতিক আচরণকে রাজনৈতিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন এবং রাজনীতির রাষ্ট্রকেন্দ্রিক সংকীর্ণ পরিধিকে অতিক্রম করে ক্ষমতা, মূল্যবন্টন, সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রভৃতি বিষয়গুলির উপরে গুরুত্ব দেন। শাসনপ্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সব রকমের কাজকর্মকেই রাজনৈতিক আচরণ বলে ডেভিড ট্রুমান মনে করেন। হ্যারল্ড ল্যাসওয়েল-এর রচনায় ক্ষমতার বিষয়টি, ডেভিড ইস্টন এর রচনায় মানের কর্তৃত্বসম্পন্ন বরাদ্দের বিষয়টি রাজনীতির মুখ্য বিষয় বলে বিবেচিত হয়। এই ধরনের বিষয়গুলি যেহেতু যে কোন সমাজ-সংগঠনেই লক্ষ্য করা যায়, সেহেতু রাষ্ট্রের পরিবর্তে যে কোন সমাজ-সংগঠনই আচরণবাদী আলোচনার ক্ষেত্র। রাষ্ট্রের পরিবর্তে এ কারণে রাজনৈতিক ব্যবস্থা শব্দগুচ্ছ ব্যবহৃত হতে থাকে। দ্বিতীয়ত, আচরণবাদী তাত্ত্বিকগণ রাজনীতিচর্চাকে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত করতে চেয়েছেন। ফলে প্রকৃতিবিজ্ঞানের মূলসূত্রগুলি এবং বিশ্লেষণপদ্ধতিগুলি অনুকরণের মাধ্যমে রাজনীতিচর্চার শুরু হয়। রাজনীতি-বিজ্ঞানীগণ পর্যবেক্ষণ, তথ্যসংগ্রহ, পরিসংখ্যান, বিশ্লেষণ প্রমাণ প্রভৃতি বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তৃতীয়ত, আচরণবাদী তাত্ত্বিকগণ রাজনীতির বিশ্লেষণে মূল্যবোধের বিষয়টি বর্জন করতে চেয়েছেন এবং পরিবর্তে রাজনীতিবিজ্ঞানকে তথ্যনিষ্ঠ মূল্য-নিরপেক্ষ বিজ্ঞান হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। চতুর্থত, আচরণবাদী তাত্ত্বিকগণ সামাজিক বিজ্ঞানগুলির আন্তঃসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ব্যক্তি-আচরণ তথা রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সঠিক উপলব্ধির জন্য মনস্তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, অর্থনীতি, নৃতত্ত্ব প্রভৃতি সমাজবিজ্ঞানের শাখাগুলির মূলসূত্রগুলিকে কাজে লাগাতে হবে। এ ব্যাপারে ডেভিড ইস্টন মন্তব্য করেন, একটি সমাজের সামগ্রিক মূল্যবোধের যথাযথ বিবরণ সংগ্রহ করতে গেলে রাজনীতিবিজ্ঞানকে অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানগুলির সাহায্য নিতে হবে।

ডেভিড ইস্টন আচরণবাদের আটটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেন। সেগুলি হ'ল— (১) আচরণের নিয়ম অনুসন্ধান (২) সত্যতা প্রমাণ (৩) শৃঙ্খলাবদ্ধ গবেষণাপদ্ধতি (৪) পরিমাপপদ্ধতির ব্যবহার। (৫) মূল্যমান

নিরপেক্ষতা (৬) গবেষণা প্রণালীর উদ্ভব (৭) বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব রচনা এবং (৮) সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সঙ্গে সংহতিসাধন।

আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাবে রাজনীতিচর্চায় কতকগুলি বিশ্লেষণ ধারা পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে বিশেষ প্রাধান্য বিস্তার করে। এই বিশ্লেষণ ধারাগুলি হ'ল ডেভিড ইস্টন-এর ব্যবস্থাপক বিশ্লেষণ ধারা (system Analysis), আলমন্ড (Almond), কোলম্যান (Coleman), পাওয়েল (Powell) প্রমুখ তাত্ত্বিক-এরা কাঠামোকার্যাবলী বিশ্লেষণধারা (Structural Functional Analysis), ডেভিড ট্রুম্যান (David Truman). ডেভিড আপ্টার (David Apter) প্রমুখ তাত্ত্বিকদের গোষ্ঠীকেন্দ্রিক বিশ্লেষণধারা (Group Analysis), কার্ল ডয়েশ (Karl Dertsch)-এর যোগাযোগ তত্ত্ব (communication theory)।

সীমাবদ্ধতা ঃ সত্তরের দশকে আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। বস্তুত, পঞ্চাশ ও ষাটের দশক হ'ল আচরণবাদের সুবর্ণযুগ এবং পরবর্তী দশক থেকেই শুরু হয় আচরণবাদের প্রতি বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া, এমনকি আচরণবাদের সমর্থক ডেভিড ইস্টন আচরণবাদের সীমাবদ্ধতাগুলি সম্পর্কে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির যে সমস্ত সীমাবদ্ধতাগুলি উল্লেখ করা হয় তা হ'ল নিম্নরূপ—

(১) আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পদ্ধতি সর্বস্বতা (২) বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির নামে মূল্যমাননিরপেক্ষতা, যা ব্যক্তি সমাজজীবনের বিশ্লেষণে আদৌ সম্ভবপর নয়। (৩) রক্ষণশীলতা তথা বিদ্যমান পুঁজিবাদী কাঠামো ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার প্রবণতা (৪) রাজনীতির মূল ধারণাগুলি, যথা, স্বাধীনতা, সাম্য, আনুগত্য, বিদ্রোহ প্রভৃতি বিষয়গুলির গুরুত্বহীনতা (৫) ইতিহাসনিরপেক্ষতা (৬) লক্ষ্যহীনতা (৭) সমাজপরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করার অক্ষমতা প্রভৃতি।

১৯৭০ এর দশক থেকেই আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির উপরোক্ত সীমাবদ্ধতারা বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হতে থাকে। স্বাধীনতা, সাম্য, আনুগত্য, সার্বভৌমিকতা প্রভৃতি ধারণাগুলি, যা আচরণবাদীরাও সাবেকি বলে বর্জন করেছেন, পুনরায় রাজনীতিচর্চায় বিবেচিত হতে থাকে। *সত্তরের দশকে জন রলস (John Rawls)-এর A Theory of Justice, রবার্ট নজিক (Robert Nowzick)-এর Anarchy State and Utopia ৮০-র দশকে ফ্রাঙ্ক কানিংহাম (Frank Cunningham)-এর Democratic Theory and Socialism প্রভৃতি গ্রন্থগুলি আচরণবাদীতত্ত্বের সীমাবদ্ধতাগুলি কাটিয়ে রাজনীতিবিশ্লেষণে পুনরায় দার্শনিক ও মূল্যমান দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে। যদিও তাঁদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিরও পার্থক্য যথেষ্টই ছিল। অবশ্য সাম্প্রতিককালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তথাকথিত ভার্জিনিয়া গোষ্ঠীর নির্বাচকমণ্ডলী, সরকারী কর্মচারী, প্রাধান্যবিস্তারকারী ব্যক্তি ও গোষ্ঠী, রাজনীতিবিদ্‌দের আচরণ প্রভৃতি বিশ্লেষণে আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গিকে Public choice approach বা Rational choice approach নামে অভিহিত করা হয়। প্রবক্তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ডাউনস (Downs), ওলসন (Olson) এবং নিসকানেন (Niskanen)। এই সমস্ত তাত্ত্বিকগণ রাজনীতির বিশ্লেষণে অর্থনীতিশাস্ত্রের অনুসৃত তত্ত্ব ও মডেলগুলি ব্যবহারেও অত্যন্ত তৎপর।

(গ) নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি

সাবেকি এবং আধুনিক-রাজনীতিচর্চার উভয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি সমালোচনায় মুখর ১৯৬০-এর দশকে যে নূতন দৃষ্টিভঙ্গিটি রাজনীতিচর্চায় ক্রমশ প্রাধান্য বিস্তার করে তা হ'ল নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। নারীজাতির সামাজিক

অবস্থার উন্নয়ন বা সমান অধিকার তাঁদের আন্দোলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে নারীবাদীগণ এযাবৎকাল পর্যন্ত রাজনীতিচর্চায় সংযুক্ত মূল দৃষ্টিভঙ্গিকেই আক্রমণ করেন। পঞ্চদশ শতকে পিসানের (Christian de Pisan) of the city of Ladice, অষ্টাদশ শতকে মেরী উলস্টোন ক্রাফট (Mary Wollstonecraft, Vindication of Rights of Women প্রভৃতি রচনা বা ঊনবিংশ শতকে নারীর ভোটাধিকার এবং অন্যান্য সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার আন্দোলনের মধ্যে নারীস্বাধীনতার বিষয়টি উপস্থাপিত হ'লেও রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসেবে নারীবাদী ১৯৬০-এর দশকে এক নূতন তাৎপর্য লাভ করে। ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত Betty Friedan-এর The Feminist Mysteque বা ১৯৭০ সালে প্রকাশিত Kate Millett-এর Sexual Politics গ্রন্থে নারী-পুরুষ সম্পর্ককে রাজনৈতিক প্রাধান্যের সম্পর্ক বলে অভিহিত করা হয়।

ধ্রুপদী রাজনীতিচর্চায় পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়গুলিকে রাজনীতির আওতার বাইরে রাখা হ'ত। নারীবাদীদের মতে উক্ত ক্ষেত্রগুলিতেও যেহেতু ক্ষমতার সম্পর্ক বিদ্যমান, সেহেতু রাজনীতির আলোচনার বিষয়বস্তু। 'এযাবৎকাল বিদ্যমান সামাজিক ইতিহাস হ'ল শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস'—পুরুষ কর্তৃক নারীকে শোষণের ইতিহাস। সুতরাং এই শোষণের উৎসসন্ধান, ক্ষমতাপ্রয়োগের ধরন, মতাদর্শের ভূমিকা প্রভৃতি বিষয়গুলি লিঙ্গ রাজনীতির (Gender Politics) -এর মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। উদারনৈতিক নারীবাদ (Liberal Feminism), বৈপ্লবিক নারীবাদ (Radical Feminism), মার্কসীয় নারীবাদ (Marxian Feminism), বস্তুপরিবেশবাদী নারীবাদ (Eco–feminism)—প্রভৃতি বিভিন্ন ধারা নারীবাদী বক্তব্যের মধ্যে গড়ে উঠলেও কতকগুলি ব্যাপারে ঐক্যমত্য দেখা যায়।

নারীবাদের প্রবক্তাগণ শ্রেণী, ধর্ম, গোত্র, নৃজাতি (Ethnic Group) প্রভৃতির ন্যায় লিঙ্গকেও (Gender) এক সামাজিক বর্গ হিসেবে দেখেন এবং শ্রেণী-রাজনীতির ন্যায় লিঙ্গ-রাজনীতির প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। প্রচলিত রাজনীতিচর্চা মূলত পুরুষদের দ্বারা, পুরুষদের জন্য, পুরুষদের স্বার্থে পরিচালিত; নারীর অবস্থানের বিষয়টি সেখানে অনুপস্থিত। পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পরিবারের কর্তৃত্ব থাকে পুরুষের হাতে। অনুরূপভাবে, সমাজের অন্যান্য সংস্থাতেও পুরুষের প্রাধান্যই বজায় থাকে। পরিবারের ন্যায় রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাও পিতৃতান্ত্রিক। শিক্ষা, কর্মক্ষেত্র, রাজনীতি প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরুষের অংশগ্রহণ ও প্রাধান্য স্বীকৃত। মিলেট (Millett)-এর মতে, পরিবারের ভিতরে ও বাইরে উভয়ক্ষেত্রেই পিতৃতান্ত্রিকতা কাজ করে। পিতৃতান্ত্রিকতার দুটি নীতি হ'ল (১) পুরুষগণ নারীদের উপর কর্তৃত্ব করে, (২) বয়ঃজ্যেষ্ঠরা কনিষ্ঠদের উপর কর্তৃত্ব করে। এভাবে পিতৃতন্ত্র এক লিঙ্গভিত্তিক স্তর-বিন্যাসের জন্ম দেয়। ভারতীয় সমাজে ভ্রূণ শিশুকন্যা হত্যা, পণপ্রথা, বধূ-নির্যাতন প্রভৃতি ঘটনাগুলি এই পুরুষশাসিত সমাজেরই বহিঃপ্রকাশ। এই পুরুষতন্ত্রের উদ্ভবের কারণ, সময়; কিভাবে এর অবসান ঘটবে—সে সম্পর্কে অবশ্যনারীবাদীদের মধ্যে মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

দ্বিতীয়ত, সমাজে নারী ও পুরুষের পার্থক্যকে সাধারণত প্রকৃতিবিজ্ঞানের দ্বারা পূর্বনির্ধারিত বলে ব্যাখ্যা করা হয় এবং এই সিদ্ধান্তে আসা হয় যে,সমাজে নারী ও পুরুষের ভূমিকা প্রকৃতি দ্বারাই নির্ধারিত। নারীর মুখ্য ভূমিকা সন্তানপ্রজনন, প্রতিপালন। তাছাড়া শারীরিক দিক থেকে দুর্বল বলে (weeker sex) নারী গৃহকর্মের মধ্যেই আবদ্ধ থাকবে। সেবা, সহানুভূতি, ধৈর্য প্রভৃতি নারীর প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য। অপরদিকে শারীরিক দিক থেকে সবল পুরুষ (stronger sex) যুদ্ধবিগ্রহ, অর্থনৈতিক কার্যসম্পাদন, রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ,

সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রভৃতি বিষয়ে যুক্ত থাকবে। নারাবীদে নারী ও পুরুষের এই তথাকথিত প্রকৃতিপ্রদত্ত ভূমিকাকে অস্বীকার করা হয়। এ ব্যাপারে নারীবাদীগণ যৌন (sex) এবং লিঙ্গ (Gender) এই দুই এর মধ্যে পার্থক্য করেন। যৌনগত দিক থেকে নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য প্রকৃতিপ্রদত্ত। তাছাড়া মাতৃত্বের বিষয়টিও নারীর সামাজিক মর্যাদা কমায় না, বরং বাড়ায়। বলা হয়, নারীর মা হওয়ার তথা নারীর প্রজনন ক্ষমতায় ভীত পুরুষ চায় নারীকে অবদমিত রাখতে। প্রকৃতিগত এই ভিন্নতা ছাড়া নারী ও পুরুষের মধ্যে যে সামাজিক,অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় তা সমাজসৃষ্ট এবং তা পুরুষের স্বার্থেই এবং এই পার্থক্যকে লিঙ্গ (Gender)-ভিত্তিক পার্থক্য বলা হয়। সাঁমো দ্য ব্যভিয়ার মন্তব্য করেন, নারী হয়ে কেউ জন্মায় না, কেউ কেউ নারী হয়ে ওঠে অর্থাৎ সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নারীর ভূমিকাকে পুরুষের স্বার্থে গড়ে তোলা হয়। ফলে, সাহস, দক্ষতা, অধিগ্রাহী প্রভৃতি গুণগুলি থেকে নারী বঞ্চিত হয়; পুরুষও সহনশীলতা, ধৈর্য, আবেগ প্রভৃতি গুণগুলি থেকে বঞ্চিত হয়।

রাজনীতির লক্ষ্য সম্পর্কে অবশ্য নারীবাদী তাত্ত্বিকগণ একমত পোষণ করেন না। উদারনৈতিক নারীবাদীগণ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী। অপরদিকে, আর এক গোষ্ঠী রয়েছেন যাঁরা নারী ও পুরুষের সমান অধিকারের পরিবর্তে, সমাজকে নারী-পুরুষ হিসেবে দ্বিখণ্ডিতকরণের পরিবর্তে চান মানুষ হিসেবে প্রত্যেকের বিকাশ,যেখানে লিঙ্গভিত্তিক সমাজ ও সামাজিক ভূমিকার পৃথকীকরণ ঘটবে না। অপরদিকে, আর এক দল তাত্ত্বিক রয়েছেন যাঁরা পুরুষ ও নারীর প্রকৃতিগত বিভাজনকে মেনে নিয়ে নারী হিসেবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। এই সমস্ত তাত্ত্বিকদের মতে, পুরুষের অধিকারগুলি রপ্ত করা, পুরুষের মতো হয়ে ওঠা আসলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজকেই পরোক্ষভাবে মেনে নেওয়া। এর মানে নারীসত্ত্বার বিলোপ ঘটে। নারী সত্ত্বার বিলোপের পরিবর্তে,এ্যাটকিনসন (Atkinson) বা সুশান ব্রাউন মিলার (Susan Brown Miler)-এর ন্যায় তাত্ত্বিকগণ চান প্রকৃতিগতভাবে নারী হয়ে ওঠা। আধিপত্য এবং আগ্রাসন যদি পুরুষের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য হয় তাহলে পুরুষকে শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করা এবং পুরুষ ও পুরুষশাসিত সমাজ থেকে নারীদের বিযুক্ত করা। 'নারীবাদ হ'ল তত্ত্ব, সমকামিতা তার প্রয়োগ'—এই হ'ল উপরোক্ত তাত্ত্বিকদের বক্তব্য। ফায়ারস্টোন (Firestone) 'নারীদের সন্তান-প্রজননের কাজ থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে যুক্তি প্রদর্শন করেন। অপরদিকে এঙ্গেলসকে (Engels) The Origin of Family Private Property and the State অনুসরণ করে সমাজতন্ত্রী নারীবাদীগণ বলেন, ঐতিহ্য অনুসারী পিতৃতান্ত্রিক সমাজ গড়ে উঠেছে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব ও মালিকানাকে সুরক্ষিত করার জন্য। রাজনীতি থেকে মুক্ত সন্তান প্রজনন ও গৃহকর্মের সঙ্গে যুক্ত নারীর ধারণা প্রকৃতপক্ষে পুঁজিবাদকেই সুরক্ষিত করে। সন্তান-প্রজনন ও প্রতিপালনের মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদী সমাজে শ্রম সরবরাহের দায়িত্ব নেয় নারীরাই। আবার সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পুরুষ ও নারীর পৃথক ভূমিকাকে চিহ্নিত করায় পুঁজিবাদী পিতৃতান্ত্রিক সমাজের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। গৃহকর্ম সম্পাদনের মধ্য দিয়ে নারী প্রতিদিন যথাসময়ে শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা নিয়ে স্বামী তথা শ্রমিককে কর্মক্ষেত্রে পাঠায়। স্বামীর পক্ষেও একটা ভালো চাকুরি অত্যন্ত দরকারী হয়ে পড়ে স্ত্রী ও সন্তানের জন্য। এভাবেই পুঁজিবাদী সমাজ তার অর্থনৈতিক দক্ষতাকে ধরে রাখে। সুতরাং পুঁজিবাদের ধ্বংস না হ'লে নারীমুক্তিও সম্ভবপর নয়। এ কারণে সমাজতন্ত্রী নারীবাদীগণ লিঙ্গ ও শ্রেণী উভয় শোষণ থেকেই মুক্ত সমাজ গড়ে তোলার পক্ষপাতী।

১৯৮০-র দশক থেকে নারীবাদী আন্দোলনের তীব্রতা হ্রাস পেতে থাকে। (১) লক্ষ্যমাত্রার ভিন্নতা (২)

রক্ষণশীলবাদের উদ্ভব তথা সমাজশৃঙ্খলা, নারীর ঐতিহ্যগত ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ (৩) নারীবাদী আন্দোলনের মূল লক্ষ্যগুলির অধিকাংশই পূরন হওয়ায় নারীবাদী আন্দোলনের তীব্রতা ৭০ -এর দশকের তুলনায় পরবর্তী দশকগুলিতে উন্নত দেশগুলিতে হ্রাস পেলেও পিতৃতান্ত্রিক সমাজ যতদিন থাকবে নারী-পুরুষ সম্পর্কের পুনর্মূল্যায়নের প্রশ্নটিও থেকে যাবে।

(ঘ) বাস্তু-পরিবেশ তাত্ত্বিক (Ecological) দৃষ্টিভঙ্গি

এ পর্যন্ত আমরা রাজনীতিচর্চার যে সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গিগুলি আলোচনা করলাম তা মানুষকেন্দ্রিক (Anthropocentric)। প্রতিটি দৃষ্টিভঙ্গিই ব্যক্তি-অবস্থান, ব্যক্তি-সমাজের সম্পর্ক, সমাজবিকাশের ধারা, সমাজ-পরিবর্তন এক কথায় ব্যক্তি-সমাজকেই দেখার দৃষ্টিভঙ্গি। ব্যক্তি ও বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীসমূহ যেমন, শ্রেণী, জাতি নৃজাতিগোষ্ঠী (Ethnic Group) জাতীয়তাবাদ, রাষ্ট্র—প্রভৃতি রাজনীতিচর্চার অন্যতম বিষয়। ব্যক্তি-প্রয়োজন ও ব্যক্তি-স্বার্থকে কেন্দ্র করে ব্যক্তি-সমাজ সম্পর্ক বিষয়ে যে সমস্ত ধারণাগুলি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত যেমন, স্বাধীনতা, সাম্য, ন্যায়, সমাজশৃঙ্খলা, আইন, আনুগত্য—রাজনীতিচর্চায় মূল আলোচিত বিষয়। একত্ববাদ অথবা বহুত্ববাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ বা সমাজতন্ত্রবাদ—যে কোন মতাদর্শই ব্যক্তিকেন্দ্রিক। ১৯৬০ -এর দশকে এই সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গিগুলি অত্যন্ত একপেশে ব্যক্তিকেন্দ্রিক, ও সংকীর্ণ বলে সমালোচিত হ'তে থাকে বাস্তু-পরিবেশবাদীদের (Ecologist) দ্বারা। বাস্তু-পরিবেশবাদীগণ Eco-র বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে পরিবেশ শব্দটি ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু, পরিবেশ শব্দটি আবার আমরা Environment-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করি। অথচ Eco শব্দটির অর্থ আরো ব্যাপক। ব্যক্তি, পরিবেশ (বস্তুগত ও জীবগত) ব্যক্তি-প্রকৃতি সম্পর্ক সবকিছুই Eco শব্দটির দ্যোতক যার বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে বাস্তু-পরিবেশ শব্দটি ব্যবহার করা যেতে পারে। রাজনীতির বিশ্লেষণে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করা হয় যেখানে ব্যক্তিই একমাত্র আলোচ্য বিষয় নয়—গোটা বিশ্ব-প্রকৃতিই আলোচ্য বিষয়।

১৯৬০-এর দশকের আগে পরিবেশ-পরিমণ্ডল নিয়ে যে ভাবনাচিন্তা হয়নি তা নয়। কিন্তু, অধিকাংশ বক্তব্যেই প্রকৃতিকে দেখা হয়েছে মানুষের প্রয়োজন মেটানোর পক্ষে অপরিহার্য অফুরান যোগানদার হিসেবে। জন লক, অ্যাডাম স্মিথ, কার্ল মার্কস প্রত্যেকেই প্রকৃতিকে ব্যক্তির সম্পদ আহরণের ক্ষেত্র হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন; অতিরিক্ত উৎপাদনের মাধ্যমেই ব্যক্তির প্রয়োজন মোকাবিলার কথা ভেবেছেন। প্রকৃতির উপর ব্যক্তি শ্রম প্রয়োগে যে সম্পদ সৃষ্টি হয় তার মালিকানা নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক দেখা গেছে, কিন্তু প্রকৃতিকে নির্বিচারে ব্যবহার করার ব্যাপারে কোন প্রশ্ন দেখা দেয়নি। ঊনবিংশ শতকে কিছু দার্শনিক, কবি, সাহিত্যিক (যেমন, রবীন্দ্রনাথ) নির্বিচারে প্রকৃতিকে লুণ্ঠন করে যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উদ্ভব, শিল্পায়ন ঘটেছে তার বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখেছেন এবং রোমান্টিক অরণ্যের দিনে ফিরে যেতে চেয়েছেন। কিন্তু রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসেবে কোন তত্ত্ব উদ্ভুত হয়নি। বেন্থাম, জেমস মিল প্রমুখ দার্শনিকগণ ব্যক্তির সুখলিপ্সাকেই প্রধান বিবেচ্য বলে ধরে নিয়েছেন এবং এই সুখলিপ্সাকেই (সুখের বৃদ্ধি, যন্ত্রণার হ্রাস) চরিতার্থ করার জন্য প্রকৃতিকে বশে আনার পক্ষে মতপ্রকাশ করেছেন। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলিরও মূল লক্ষ্য ছিল প্রকৃতিকে জানা, ব্যক্তির প্রয়োজমে প্রকৃতিকে ব্যবহার করা। বলা যেতে পারে ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত র‍্যালে কার্সনের (Rachel Carson) The silent springs গ্রন্থটি প্রকৃতিকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহারের ফল সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে। প্রকৃতিকে

যথেচ্ছব্যবহারের মাধ্যমে শিল্পায়ন, অরণ্য ও বন্য জন্তুর ধ্বংস, প্রাকৃতিক সম্পদের ক্রমহ্রাসমান অবস্থা, পরিবেশবাদ এক রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এ সময় জার্মানীতে রাজনৈতিক দলগুলির উদ্ভব ঘটতে থাকে পরিবেশ সংক্রান্ত কর্মসূচি নিয়ে। অন্যান্য দেশেও রাজনৈতিক দলগুলি পরিবেশের বিষয়টি রাজনৈতিক কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করতে থাকে। বাস্তু-পরিবেশবাদীগণ রাজনীতিকে নূতন করে ব্যাখ্যা করেন; ডান বা বাম রাজনীতির পরিবর্তে সামনে এগিয়ে যাবার রাজনীতি (Neither left nor right but ahad)-র কথা বলেন। ফিকে সবুজ (Light Green), গাঢ় সবুজ (Dark Green), রক্ষণশীল (Conservative), সমাজতান্ত্রী (Socialist), নারীবাদী (Feminist), বাস্তু-পরিবেশবাদীগণের মধ্যে বক্তব্যের ভিন্নতা থাকলেও কয়েকটি ব্যাপারে ঐকমত্য দেখা যায়।

প্রথমত, বাস্তু-পরিবেশবাদীগণ ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের নবজাগরণ, জ্ঞানদীপ্তযুগের সাফল্যের মূল বক্তব্যের সমালোচনা করেন—ব্যক্তিকে প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন জীব হিসেবে, প্রকৃতির প্রভু হিসেবে দেখার পরিবর্তে বিশ্ব -পরিমণ্ডলের প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করেন। এই সামগ্রিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ব্যক্তির সঙ্গে প্রকৃতিপরিমণ্ডলের সম্পর্ক পারস্পরিক নির্ভরশীলতার-ব্যক্তি প্রকৃতিরই অংশ। রাজনীতিচর্চায় ব্যক্তির উপর একমাত্র গুরুত্ব আরোপের ফলে ব্যক্তির সঙ্গে প্রকৃতির এবং অন্য প্রাণী-জগতের সম্পর্কের বিষয়টি বিকৃত এবং অবহেলিত হয়েছে। বাস্তু-পরিবেশবাদীগণ ব্যক্তি বা ব্যক্তির চাহিদা থেকে রাজনীতির আলোচনা শুরু করার পরিবর্তে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন প্রাণী ও পরিবেশের এক সামগ্রিক কাঠামোর বিশ্লেষণ থেকে আলোচনা শুরু করেন।

দ্বিতীয়ত, রাজনীতিচর্চায় ব্যক্তিজীবনের সম্ভাবনা ও প্রাকৃতিক সম্পদের যোগানকে অপর্যাপ্ত বলে ধরা হয়। অর্থাৎ ব্যক্তির পক্ষে সৃজনক্ষমতা ও সমৃদ্ধি সীমাহীন। বাস্তু-পরিবেশবাদীরা এই ভাবনাকে সমৃদ্ধির বাতিক (Growth mania) বলে ব্যঙ্গ করেন। প্রাকৃতিক সম্পদ অপর্যাপ্ত নয়। প্রকৃতিবিজ্ঞানীরা হিসেবে করে দেখিয়েছেন, যে হারে তৈল সম্পদ ব্যবহৃত হচ্ছে তাতে বিশ্বে ৪৫-৮০ বৎসরের মধ্যে তৈল সম্পদ শেষ হয়ে যাবে। অন্যান্য প্রকৃতিক খনিজ সম্পদও শেষ হওয়ার মুখে। অথচ, প্রতি মিনিটে ১৫০ জন শিশু জন্ম নিচ্ছে। এমতাবস্থায় প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত না করলে, জন্মনিয়ন্ত্রণ না করলে অচিরেই মানবসভ্যতা ধ্বংসের মুখোমুখি হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নিঃসন্দেহে উৎপাদনের ও ভোগ্যপণ্যের মাত্রা বহুগুণ বৃদ্ধি করেছে; কিন্তু একই সঙ্গে নূতন করে বহু সমস্যা সৃষ্টি করেছে। উন্নয়নের মাত্রাকে শূন্যাঙ্কে (zero growth) নামিয়ে আনা, পরিবেশ—দূষণকারী শিল্পায়নকে স্থগিত রাখা, টিকে থাকার অর্থনীতি চালু করা, স্থানিক প্রয়োজনভিত্তিক উৎপাদন চালু করা—ইত্যাদির মাধ্যমেই মানবপ্রজাতি টিকে থাকতে পারে।

তৃতীয়ত, বর্তমান প্রজন্মই সাধারণত রাজনীতির মূল আলোচ্য বিষয়। কিন্তু বাস্তু—পরিবেশবাদীরা আগামী প্রজন্মের কাছেও দায়বদ্ধতা স্বীকার করেন। প্রাকৃতিক সম্পদ যদি এই প্রজন্মেই বেহিসেবী ব্যবহারের ফলে শেষ হয় তাহলে আগামী প্রজন্মের কাছে আমরা রেখে যাব এক সম্পদহীন, নিঃস্ব, দূষণপূর্ণ জগৎ।

চতুর্থত, বেন্থাম, জেমস মিথ প্রমুখ রাজনীতিবিজ্ঞানীগণ রাজনীতির অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে সুখের বৃদ্ধি ও যন্ত্রণার হ্রাসকে ধার্য করেন। বলাবাহুল্য, এই সুখ—যন্ত্রণার বিষয়টি উপরোক্ত তাত্ত্বিকগণ শুধুমাত্র মানুষের ক্ষেত্রেই ব্যবহার করেছেন। বাস্তু—পরিবেশবাদীরা শুধুমাত্র মানুষের পরিবর্তে অন্যান্য প্রজাতির সুখবৃদ্ধি ও যন্ত্রণালাঘবের বিষয়টির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ফলে মানুষের মত অন্যান্য জন্তুদেরও বাঁচার অধিকারের

বিষয়টি রাজনীতিতে এসে যায়। প্রাণীহত্যা, বৃক্ষচ্ছেদন প্রভৃতি বিষয়গুলিও অপরাধমূলক বলে বিবেচিত হতে থাকে।

সর্বোপরি বাস্তু—পরিবেশবাদীগণ রাজনীতিকে মূল্য—নিরপেক্ষ বিজ্ঞান হিসেবে গড়ে তোলার পরিবর্তে মূল্যসাপেক্ষ বিজ্ঞান হিসাবে গড়ে তুলতে চান। এ কারণে নৈতিক বিষয়টি বাস্তু—পরিবেশবাদীদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে, অন্যান্য প্রজাতির কাছে, মানবপ্রজাতির এক দায় রয়েছে। এর জন্য মানুষকে তার ভোগস্পৃহা কমানো, সবার বাঁচার ও বিকশিত হওয়ার অধিকারকে মেনে নেওয়া। সমাজের অবহেলিত এবং দমিত জনগোষ্ঠী (যেমন নৃজাতিগোষ্ঠী, নারীজাতি) -র অধিকার পুরো মাত্রায় স্থান দেওয়া, ব্যক্তির চাহিদাকে নুতনভাবে সংজ্ঞায়িত করা প্রভৃতি বিষয়গুলি বাস্তু—পরিবেশ রাজনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে বিবেচিত হয়। রাজনীতি সম্পর্কে এক ধরনের নৈতিক / আধ্যাত্মিক ভাবনা বাস্তু-পরিবেশবাদীদের বক্তব্যে লক্ষ্য করা যায়—ব্যক্তি, অন্য ব্যক্তি, প্রাণী, গোটা বিশ্বজগতের মধ্যে নিজের অস্তিত্ব খুঁজে পায় এবং এভাবে বিশ্ব আত্মার সঙ্গে একাত্মবোধ করে। ডবসনের (Dobson) Green Political Thought গ্রন্থে বাস্তু-পরিবেশবাদীদের এই মানবপ্রকৃতির গুণগত পরিবর্তনের বক্তব্যটি বর্তমানে ভোগ্যবাদী দুনিয়ার কাছে এক গুরুত্বপূর্ণ আবেদন এবং একই সঙ্গে এই তত্ত্বের এক দুর্বলতম দিক। তাছাড়া বাস্তু পরিবেশবাদীগণ পুঁজিবাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ফলাফল সম্পর্কেও কম সোচ্চার। সমাজপরিবর্তনের মুখ্যভূমিকা কে নেবে সে প্রশ্নেও বাস্তু-পরিবেশবাদীদের বক্তব্য সুস্পষ্ট নয়।

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

(১) কিভাবে আপনি রাজনীতিবিজ্ঞানের সংজ্ঞা নির্ণয় করবেন?

(২) রাজনীতিবিজ্ঞানের অনুশীলনে বিভিন্ন সাবেকি দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করুন।

(৩) রাজনীতিবিজ্ঞানের অনুশীলনে বিভিন্ন আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করুন।

(৪) আপনি কি মনে করেন রাজনীতিবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু রাষ্ট্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দিন।

(৫) রাজনীতিবিজ্ঞানের মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিটি ব্যাখ্যা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

(১) রাজনীতিবিজ্ঞান অনুসৃত দৃষ্টিভঙ্গিগুলিকে সাবেকি এবং আধুনিক — এই দুইভাগে ভাগ করা কতদূর যুক্তিযুক্ত?

(২) আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির মূল বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী?

(৩) রাজনীতির বিশ্লেষণ কি মূল্যনিরপেক্ষ হওয়া উচিত?

(৪) রাজনীতির সম্পর্কে নারীবাদীদের বক্তব্য সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।

(৫) রাজনীতি সম্পর্কে বাস্তু-পরিবেশবাদীদের বক্তব্য আলোচনা করুন।

১.৪ গ্রন্থপঞ্জী

(১) Andrew Haywood : Macmillan Press—Politics (1997)

(২) Andrew Haywood : Macmillan Press—Political Ideologics—An Introduction. (1982, 1998)

(৩) Ralph Miliband : Oxford University Press—Marxism And Politics. (1977)

(৪) S. P. Verma : Modern Political Theory. Vikas (1979)

(৫) পরিমল চন্দ্র ঘোষ : রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূলসূত্র, প. ব. রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা (১৯৮০)

(৬) পরিমল চন্দ্র ঘোষ : রাষ্ট্রবিজ্ঞান : তত্ত্ব ও পদ্ধতি, প. ব. রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা (১৯৮৩)

(৭) শোভনলাল দত্তগুপ্ত : মার্কসীয় রাষ্ট্রচিন্তা, প. ব. রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা (১৯৮৪)

(৮) সত্যসাধন চক্রবর্তী ও নির্মলকান্তি ঘোষ : রাষ্ট্রবিজ্ঞান শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, কলকাতা (১৯৯৭)

একক—২ ❐ রাষ্ট্রের উদ্ভব ও প্রকৃতি সম্পর্কিত বিভিন্ন তত্ত্ব

গঠন

২.০ উদ্দেশ্য

২.১ প্রস্তাবনা

২.২ রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কিত বিভিন্ন তত্ত্ব

২.২.১ চুক্তিবাদী তত্ত্ব

২.২.২ মূল বক্তব্য

(ক) টমাস হবস

(খ) জন লক

(গ) জাঁ জাঁ রুশো

(ঘ) জন রলস

২.২.৩ সমালোচনা

২.২.৪ মূল্যায়ন

২.৩ বিবর্তনবাদী তত্ত্ব

২.৩.১ বিবর্তনবাদী তত্ত্বের ক্রমবিকাশ ও বিভিন্ন ধারা

২.৩.২ বিভিন্ন উপাদান

(ক) রক্তের সম্পর্ক

(খ) অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ

(গ) ধর্ম

(ঘ) ক্ষমতা

(ঙ) রাজনৈতিক চেতনা

২.৩.৩ উপসংহার

২.৪ রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কিত বিভিন্ন তত্ত্ব

২.৪.১ জৈব মতবাদ

২.৪.২ জীবদেহের সঙ্গে রাষ্ট্রের তুলনা

২.৪.৩ মূলবক্তব্য

২.৪.৪ সমালোচনা

২.৪.৫ মূল্যায়ন

২.৫ ভাববাদ
২.৫.১ মূল বক্তব্য
২.৫.২ সমালোচনা
২.৫.৩ ভাববাদের সাম্প্রতিক রূপ
২.৫.৪ মূল্যায়ন
২.৬ অনুশীলনী
২.৭ গ্রন্থপঞ্জী

২.০ উদ্দেশ্য

এই এককটির মাধ্যমে আমরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে জানতে পারি—

- রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে চুক্তিবাদী তত্ত্ব।
- চুক্তিবাদের প্রবক্তা হিসেবে টমাস হবস, জন লক এবং রুশোর বক্তব্য।
- চুক্তিবাদের সাম্প্রতিক রূপ।
- রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে বিবর্তনবাদী তত্ত্ব।
- রাষ্ট্রের উদ্ভবে যে সমস্ত উপাদানগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে তার বিবরণ।
- রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে জৈববাদী মতবাদ ও এই মতবাদের সীমাবদ্ধতা।
- রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে আদর্শবাদী/ভাববাদী তত্ত্ব।
- আদর্শবাদী/ভাববাদী তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা।
- আদর্শবাদের সাম্প্রতিক রূপ।

২.১ প্রস্তাবনা

বর্তমান এককে রাষ্ট্রের উদ্ভব ও প্রকৃতি সম্পর্কে যে সমস্ত মতবাদগুলি রয়েছে তার মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মতবাদকে বাছাই করে আলোচনা করা হবে। রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে সামাজিক চুক্তি মতবাদটি ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে লক্ষ্য করা গেলেও ইউরোপে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে বিশেষ প্রাধান্য বিস্তার করে। রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে ঔৎসুক্যই সামাজিক চুক্তি মতবাদীদের মূল লক্ষ্য ছিল না। তাঁরা রাষ্ট্রের উদ্ভবে চুক্তিবাদী তত্ত্ব দিয়ে ঐশ্বরিক মতবাদকে যেমন খণ্ডন করতে চেয়েছেন, অপরদিকে রাষ্ট্রের প্রতি ব্যক্তির আনুগত্যের বিষয়ে এক নতুন মাত্রা দিতে চেয়েছেন। রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে বিবর্তনবাদী তত্ত্বটি শুধুমাত্র রাজনীতিবিজ্ঞানেই নয়, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্বেও আলোচিত হয়েছে।

রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন তত্ত্বগুলির মধ্যে জৈব ও আদর্শবাদী তত্ত্বটি আলোচিত হয়েছে। আদর্শবাদী তত্ত্বটি আবার ভাববাদী তত্ত্ব নামেও পরিচিত। উভয় তত্ত্বই রাজনীতিচর্চার বিভিন্ন পর্বে আলোচিত হলেও অষ্টাদশ ঊনবিংশ শতকে এই দু'টি তত্ত্ব বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

২.২ রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কিত বিভিন্ন তত্ত্ব

রাষ্ট্রের সৃষ্টি কিভাবে হ'ল—এই প্রশ্নটি বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন দেশের রাজনীতিবিজ্ঞানীদের অনুসন্ধিৎসার বিষয়। প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থে (যেমন, মহাভারতের শান্তি পর্বে, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে, কামন্দকীয় নীতিসারে) এই প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছে। একইভাবে প্রাচীন গ্রীসের দার্শনিকগণও এই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন। মধ্যযুগের দার্শনিকগণ যেমন, সেন্ট অগাস্টিন (St. Augustine ?—604), সেন্ট টমাস একুইনাস (St. Thomas Aquinas 1225-1274)-এর রচনাতে এই প্রশ্নের উত্তর থেমে থাকেনি। আধুনিক যুগের রাজনীতিবিজ্ঞানীগণ যেমন, টমাস হবস (Thomas Hobbes 1588-1679), জন লক (John Locke 1632-1704), জাঁ জা রুশো (Jean Jacques Roussean 1712-1778), হেগেল (Hegel 1770-1831) প্রমুখ তাত্ত্বিকগণ এই প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। বিভিন্ন যুগে এই প্রশ্নটি উত্থাপিত হওয়ার কারণ শুধুমাত্র রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসাই নয় ; এই প্রশ্নটির উত্তরের মাধ্যমে ব্যক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক কী হবে, রাষ্ট্রকে মেনে চলা বাধ্যতামূলক কিনা, রাষ্ট্রের প্রকৃতি বা স্বরূপই বা কি?—এই প্রশ্নগুলির উত্তরও পাওয়া যাবে। যেমন, 'রাষ্ট্র ঈশ্বরের সৃষ্টি এবং রাজা হলেন ঈশ্বরের প্রতিনিধি'— এই তত্ত্ব প্রচার করে একসময় জনসাধারণের কাছ থেকে চরম আনুগত্য আদায়ের চেষ্টা হয়েছিল। আবার রাষ্ট্র যদি জনগণের চুক্তির মাধ্যমে সৃষ্ট হয় তাহলে জনগণই প্রকৃত রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী এই মত মেনে নিতে হয়। রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে যে সমস্ত তত্ত্বগুলি বিভিন্ন সময়ে প্রচারিত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল ঐশ্বরিক মতবাদ, চুক্তিবাদী তত্ত্ব, বলপ্রয়োগ তত্ত্ব, বিবর্তনবাদী তত্ত্ব যা ঐতিহাসিক তত্ত্ব নামেও পরিচিত। আমরা এখানে চুক্তিবাদী তত্ত্ব এবং ঐতিহাসিক তত্ত্বটি আলোচনা করব।

২.২.১ চুক্তিবাদী তত্ত্ব

রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে চুক্তিবাদী তত্ত্বের আদি নিদর্শন পাওয়া যায় ভারতে মহাভারতে শান্তিপর্বে, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে, বৌদ্ধদর্শনে, প্রাচীন গ্রীসে ও খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে সফিস্ট (Sophist) বা তাত্ত্বিক সম্প্রদায়ের মধ্যে। এই সমস্ত বক্তব্যে রাষ্ট্রকে চুক্তির মাধ্যমে সৃষ্ট এক স্বেচ্ছামূলক সংগঠন বলে প্রচার করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল স্বেচ্ছামূলক সংগঠন হিসেবে রাষ্ট্রকে প্রাকৃতিক ব্যবস্থার বিরোধী ও ব্যক্তির আত্মোপলব্ধির পথে বাধা হিসেবে প্রতিপন্ন করা। তবে সুনির্দিষ্ট আকারে ও শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে চুক্তিবাদী তত্ত্বের প্রকাশ ঘটে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে ইউরোপে টমাস হবস, জন লক ও জাঁ জা রুশোর রচনায়। উক্ত তাত্ত্বিকদের মূল লক্ষ্য রাষ্ট্রকে 'ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট' এই সিদ্ধান্তের পরিবর্তে রাষ্ট্র জনগণের চুক্তির মাধ্যমে সৃষ্ট এই মত প্রচার করে ব্যক্তিকে রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস হিসাবে চিহ্নিত করা। সাম্প্রতিককালে জন রলস্ (John Rawls, 1971)-এর রচনায় সামাজিক চুক্তি মতবাদটি আলোচিত হয়েছে ব্যক্তিকে রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে।

২.২.২ মূল বক্তব্য

ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের সম্পর্ককে চুক্তির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করার প্রবণতা লক্ষ্য করি হবস, লক ও রুশোর রচনায়, যদিও চুক্তির পূর্বেকার অবস্থা, চুক্তির ধরন, চুক্তির শর্ত প্রভৃতি বিষয়ে তাত্ত্বিকগণ ভিন্ন মত পোষণ করেন। এই তিন দার্শনিকই চুক্তির মাধ্যমে সৃষ্ট রাষ্ট্রের পূর্ববর্তী অবস্থাকে প্রাকৃতিক আইন দ্বারা পরিচালিত প্রকৃতির রাজ্যের অবস্থা (State of Nature) বলে উল্লেখ করেন।

(ক) টমাস হবস—

টমাস হবস [Thomas Hobbes (1651)]-এর মতে রাষ্ট্রপূর্ব প্রকৃতির রাজ্য ছিল প্রাক্-সামাজিক ও প্রাক্-রাজনৈতিক। হবস মানবচরিত্রের যে চিত্র অঙ্কন করেছেন তা প্রকৃতিগতভাবে স্বার্থপর। স্বার্থপরতা, প্রতিযোগিতা প্রভৃতির ফলে সমাজে মানুষের জীবন ছিল জঘন্য, পাশবিক, ঘৃণ্য ও স্বল্পায়ু। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য মানুষ চুক্তির মাধ্যমে তাদের ক্ষমতা ও অধিকার হস্তান্তর করে সার্বভৌমের হাতে। এবং এর ফলে মানুষ সার্বভৌমকে মানতে বাধ্য ; নতুবা পুনরায় প্রকৃতির রাজ্যে প্রত্যাবর্তন অবশ্যম্ভাবী, যা জঘন্য ও পাশবিক। এভাবে হবস চুক্তির মাধ্যমে চরম ক্ষমতাসম্পন্ন সার্বভৌমের সৃষ্টি করলেও সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস যে মানুষ সে সম্পর্কে হবস-এর বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট।

(খ) জন লক—

জন লক [John Locke (1690)] যে সময় রাষ্ট্রতত্ত্ব রচনা করেন তখন ইংলণ্ডে হবসের সময়ের তুলনায় পুঁজিপতিশ্রেণী অনেক বেশী সংঘবদ্ধ। সামন্তশক্তির তুলনায় রাজাই পুঁজিবিকাশের পথে অন্তরায়। এমতাবস্থায় প্রয়োজন রাজার ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় রাখা এবং ব্যক্তির অধিকারকে বৈধতা দেওয়া। জন লকের চুক্তিবাদী তত্ত্বে এই ঐতিহাসিক দায় অত্যন্ত স্পষ্ট। জন লকের মানুষ সহযোগী এবং এ কারণে সামাজিক। তিনি মনে করেন মানুষ কতকগুলি স্বাভাবিক অধিকার (natural rights) যেমন—জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকার নিয়েই জন্মায়। প্রকৃতির রাজত্বেও মানুষ এই অধিকারগুলি ভোগ করত। প্রকৃতি-রাজ্যের এই সামাজিক কিন্তু প্রাক্-রাজনৈতিক যুগে মানুষ প্রত্যেকেই যুক্তির অনুশাসন মেনে চলত। প্রকৃতি-রাজ্যে স্বাধীনতা, সম্পত্তির নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বিরাজ করলেও তিনটি কারণে তা অসম্পূর্ণ ছিল। প্রথমত, যে স্বাভাবিক আইন দ্বারা প্রকৃতি-রাজ্যের মানুষ পরিচালিত হ'ত সেই আইন সম্পর্কে মানুষের ধারণা ছিল অস্পষ্ট। এ কারণে অপরের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা থাকত। দ্বিতীয়ত, এই আইনকে ব্যাখ্যা করার মত কোনও নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা ছিল না। তৃতীয়ত, প্রকৃতির রাজ্যের স্বাভাবিক আইন বলবৎ করার কোনও সংস্থা ছিল না। এ কারণে প্রকৃতির রাজ্যের মানুষ প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের চুক্তির মাধ্যমে এক রাজনৈতিক সমাজের উদ্ভব ঘটা। এই রাজনৈতিক সমাজ যাতে ভেঙ্গে না পড়ে বা অক্ষুণ্ণ থাকে তার জন্য আরেকটি (দ্বিতীয়) চুক্তির মাধ্যমে সার্বভৌম বা সরকারের প্রতিষ্ঠা করে। সার্বভৌম জনগণের সম্পত্তি, স্বাধীনতা ও জীবনের সুরক্ষা করবে। জিম্মাদার হিসেবে সরকারের এই দায়িত্ব গ্রহণের অর্থ হ'ল সরকারের কাছে গচ্ছিত ক্ষমতার অপব্যবহার ঘটলে সার্বভৌমকে অপসারণ করা যাবে। জন লক প্রকৃত রাজনৈতিক ক্ষমতা শেষ পর্যন্ত জনগণের হাতেই রেখে দেন ; সার্বভৌম শুধুমাত্র এই গচ্ছিত ক্ষমতার জিম্মাদার বা তত্ত্বাবধায়ক। এভাবে জন লক সীমিত সার্বভৌমিকতার তত্ত্বই প্রচার করেন।

(গ) জাঁ জা রুশো—

জাঁ জা রুশো (Jean Jack Roussean) ইংলণ্ডে টমাস হবস বা জন লকের মতই ফরাসী দার্শনিক রূশোও রাষ্ট্রের উদ্ভবকে সামাজিক চুক্তিরই ফলশ্রুতি বলে উল্লেখ করেন। ১৭৫৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত Discourses on the Origin of Inequality এবং ১৭৬২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত Social Contract গ্রন্থে প্রকৃতি রাজ্যের অবস্থা ও সমাজ/রাষ্ট্রসৃষ্টির কারণ সম্পর্কে বক্তব্যের ভিন্নতা থাকলেও রাষ্ট্র যে সামাজিক চুক্তির ফলে উদ্ভুত এই মূল বক্তব্যটি থেকে তিনি সরে আসেননি। টমাস হবসের মত তিনি প্রকৃতি-রাজ্যকে হিংস্র, পাশবিক, ঘৃণ্য ও স্বল্পায়ু হিসেবে চিহ্নিত করেননি। আবার জন লকের মত প্রকৃতি-রাজ্যের মানুষ যুক্তিবোধসম্পন্ন বলেও অভিহিত করেননি। রুশোর মতে প্রকৃতি-রাজ্যের মানুষ বৌদ্ধিক ক্ষমতাশূন্য মানুষ ; ব্যক্তিস্বার্থ ও করুণা—এই দুই ভাবাবেগই মানুষকে পরিচালিত করত এবং মানুষের জীবন ছিল সরল, সমভাবাপন্ন, স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং তৃপ্ত, কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভবে সামাজিক বৈষম্য দেখা দেয়—পরিসমাপ্তি ঘটে প্রকৃতি-রাজ্যের স্বর্গসুখ। সৃষ্টি হয় পুরসমাজের (civil society) যারা নানা প্রতিষ্ঠান মানুষের সহজাত শুভবোধকে বিনষ্ট করে তাকে দুর্নীতিগ্রস্ত করল। সভ্যতা তথা পুরসমাজই মানুষের স্বাধীনতা তথা মুক্তির প্রতিবন্ধক। এই কারণে তিনি মন্তব্য করেন—মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীন কিন্তু সে হয়ে পড়ে সর্বত্র শৃঙ্খলাবদ্ধ। Discourses on the Origin of Inequality (1755) গ্রন্থে রুশো সভ্যতা তথা পুরসমাজের কঠোর সমালোচক হ'লেও social contract (1762) গ্রন্থে তিনি সামাজিক চুক্তিকে প্রকৃতির রাজ্য থেকে পুরসমাজের রূপান্তরের সহায়ক মাধ্যম হিসেবে দেখেন এবং পুরসমাজের বৈধতাবিধানে সচেষ্ট হন। রুশোর মতে, প্রকৃতিরাজ্যের মানুষ পরস্পর সম্পাদিত চুক্তির মাধ্যমে কোন ব্যক্তিবিশেষের হাতে ক্ষমতা অর্পণ না করে সামগ্রিকভাবে সমাজের উপরেই এই ক্ষমতা অর্পণ করে কারণ এই সমাজ 'সাধারণের ইচ্ছা'র (General Will) প্রতিনিধিত্ব করে। 'সাধারণের ইচ্ছা' সকল ব্যক্তিসমূহের ইচ্ছার সমষ্টিমাত্র নয়—সকলের মঙ্গলকামী ইচ্ছার সমষ্টি। একজন মানুষ পুরসমাজ গঠনের পূর্বে যে সমস্ত অধিকার ভোগ করত তা হস্তান্তর বা ত্যাগ না করে সামগ্রিকভাবে সমাজের হাতেই অর্পণ করায় ব্যক্তি আগের মতই স্বাধীন, অবিচ্ছিন্ন। এভাবে রুশো রাষ্ট্র-কর্তৃত্বের সঙ্গে ব্যক্তিস্বাধীনতার সমন্বয়সাধনে সচেষ্ট হন।

(ঘ) জন রলস—

সাম্প্রতিককালে—জন রলস [John Rawls (1921)] A Theory of Justice (1971)—গ্রন্থে ন্যায়তন্ত্র রচনার ক্ষেত্রে সামাজিক চুক্তি মতবাদটির উপর আলোকপাত করেন। রলস-এর মতে চুক্তির ধারণা অন্তত দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথমত, ব্যক্তির কাছে সমাজশৃঙ্খলার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতির রাজ্য থেকে সরে আসার অন্যতম কারণই হ'ল সমাজশৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি যা ব্যক্তির ন্যায় বোধেরই প্রকাশ। দ্বিতীয়ত, চুক্তির ধারণা এমন এক কল্প পরিস্থিতি (Imaginary Situation)-এর কথা বলে যেখানে ব্যক্তি কোন্ ধরনের সমাজে বাস করবে বা কোন্‌টি কাম্য ব্যবস্থা তা ব্যক্তিই বাছাই করবে। অর্থাৎ ব্যক্তি এখানে যুক্তিবোধসম্পন্ন যার অধিকার এবং সামর্থ্য রয়েছে কোন্‌টি তার পক্ষে মঙ্গলজনক এবং সঠিক, কোন্‌টি কম অসুবিধাজনক তা বাছাই করার। ন্যায়তত্ত্বের স্বরূপ নির্ণয়ে জন রলস তাই চুক্তিবাদীদের মত মানুষকে এক কল্প অবস্থায় (Imaginary stage) দাঁড় করায় যা ব্যক্তির মৌলিক অবস্থান অর্থাৎ

যেখান থেকেই তার যাত্রাপথ শুরু। এর সত্যতা বা ঐতিহাসিকতা যাই থাকুক না কেন তা যুক্তিবিচারে সঠিক। জন রলস চুক্তিবাদীদের মত ব্যক্তির এই মৌলিক অবস্থানকে অজ্ঞতার পর্দা (Vail of Ignorance)-র আড়ালে অবস্থান বলে মনে করেন। এখানে ব্যক্তি জানেন তার সঠিক সমাজে কোন্‌টি, তার সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থানই বা কি? তার নিজস্ব ক্ষমতা, বুদ্ধি সম্পর্কে সে অজ্ঞ। এমতাবস্থায় ব্যক্তিকে কতকগুলি সাধারণনীতি অনুসরণ করেই সঠিক সমাজ বাছাই করতে হবে কারণ যদি এই বাছাইকরণ সঠিক না হয় তাহলে তাকে এবং বংশানুক্রমিকভাবে তার পরিবারবর্গকে এর ফলভোগ করতে হবে। রলস-এর মতে এক্ষেত্রে সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হ'ল এমন একটা সমাজ বাছাই করা যেখানে বৈষম্য সবচেয়ে কম। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কোন ব্যক্তিকে যদি বলা হয় একটি কেক কাটতে এবং সবশেষে তার ভাগটুকু নিতে তাহলে সেই ব্যক্তি চেষ্টা করবে কেকের সব টুকরোগুলি যেন সমান হয়।

ব্যক্তির তার মৌলিক অবস্থায় (প্রথম বা কল্প সমাজব্যবস্থায়) কিবাবে তার পছন্দ জানায় সে সম্পর্কে রলস বিস্তারিত আলোচনা করেন। সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে দেখা যাক রলস কি ধরনের সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাইছেন।

জন রলস যে সমাজব্যবস্থার কথা বলেছেন তা মূলত দু'টি ভিন্ন সূত্রের দ্বারা পরিচালিত। এক, সবার জন্য যে ব্যাপক স্বাধীনতার কথা বলা হয় সেই স্বাধীনতার ব্যাপারে প্রত্যেক ব্যক্তি সমান অর্থাৎ যা ব্যক্তির উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য তা প্রতিটি ব্যক্তির জন্য উন্মুক্ত থাকা উচিত এবং দেখা উচিত যাতে কোনও ব্যক্তির অধিকার অপর ব্যক্তির অনুরূপ অধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, অর্থাৎ যাতে অপরের অধিকারের প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না করে। জন রলস-এর দ্বিতীয় সূত্রটি হ'ল অ-সাম্যের নীতি। জন রলস সমাজে সম-অধিকারের কথা বললেও সমাজে বৈষম্যকে অস্বীকার করেননি। কিন্তু সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই বৈষম্য দু'টি ভিন্ন নীতির দ্বারা পরিচালিত হবে। প্রথমত, সমাজে অসাম্য এমনভাবে বিন্যস্ত হবে যাতে সমাজের সর্বাপেক্ষা কম সুবিধাভোগী সর্বাপেক্ষা বেশী লাভবান হয়। দ্বিতীয়ত, এই অসাম্য একমাত্র কোন পদ বা অবস্থানের সঙ্গে জড়িত থাকবে এবং উক্তপদ বা অবস্থান প্রত্যেকের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। অর্থাৎ, এক্ষেত্রেও সুযোগের সমতা থাকবে। এই দু'টি সূত্রের মধ্যে, রলস-এর মতে, প্রথম সূত্রটি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

২.২.৩ সমালোচনা

সামাজিক চুক্তি মতবাদটি বিভিন্ন পর্বে বিভিন্ন দিক থেকে রাজনীতিবিজ্ঞানীদের দ্বারা সমালোচিত হয়েছে। প্রথমত, এই মতবাদের ঐতিহাসিকত্ব নিয়ে পণ্ডিতগণ প্রশ্ন তোলেন। বস্তুত, চুক্তিবাদী তাত্ত্বিকগণ প্রকৃতি-রাজ্যের ধারণা, চুক্তিমাধ্যমে রাষ্ট্রসৃষ্টি প্রভৃতি বিষয়গুলি অনুকল্প (Hypothesis) হিসেবে নিয়েছেন। চুক্তির বিচারে তা গৃহীত হ'লেও ইতিহাসগতভাবে তা অবাস্তব। এর কোন নজির ইতিহাসে নেই।

দ্বিতীয়ত, চুক্তিবাদীগণ ব্যক্তির যে প্রকৃতি চিত্রিত করেছেন তা একপেশে। টমাস হবস-এর ব্যক্তি স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক, রুশোর ব্যক্তি ঠিক এর বিপরীত। অপরদিকে জন লক ব্যক্তিকে চুক্তির দ্বারা শাসিত বলে উল্লেখ করেন। ব্যক্তিকে এভাবে নিছক একটি ছকে বেঁধে বিশ্লেষণ করা অনুচিত।

তৃতীয়ত, টমাস হবস বা রুশো রাষ্ট্র তথা সার্বভৌম সৃষ্টির ব্যাপারে ব্যক্তির সম্মতি (consent)-এর কথা বললেও চুক্তি সম্পাদনের পর ব্যক্তি চূড়ান্তভাবে সার্বভৌমের নিয়ন্ত্রণাধীন। এভাবে এই দুই তাত্ত্বিক চরম সার্বভৌম

(ব্যক্তি বা গোষ্ঠী) বা রাষ্ট্রক্ষমতাকে স্বীকার করেছেন। জন লক দ্বিতীয়ত চুক্তির মাধ্যমে সার্বভৌমকে নিয়ন্ত্রণের কথা বললেও লকের উহ্য সম্মতির (tacit consent) ধারণা বস্তুত ব্যক্তিকে সার্বভৌমের নিকট নিঃশর্ত আনুগত্য প্রকাশে বাধ্য করে।

চতুর্থত, চুক্তিবাদীদের মতে, প্রাক্-রাষ্ট্রীয় প্রকৃতি-রাজ্যে বসবাসকারী মানুষ চুক্তির মাধ্যমে সমাজ/সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে তুলেছে। কিন্তু চুক্তির ধারণা একটি আইনগত ধারণা যাকে বলবৎ করার জন্য একটি আইনগত কর্তৃত্বের প্রয়োজন। প্রকৃতি-রাজ্যের মানুষের পক্ষে চুক্তির এই ধারণা লাভ যেমন সম্ভবপর নয়, কোন সুনির্দিষ্ট কর্তৃত্বের অভাবে তাকে বলবৎ করাও অসম্ভব।

পঞ্চমত, চুক্তিবাদী তাত্ত্বিকগণ, বিশেষতঃ জন লক, প্রকৃতির রাজ্যে যে অধিকারের কথা বলেছেন সেই অধিকার কেবল সুনির্দিষ্ট কর্তৃত্বের অভাবে অর্থহীন। তাছাড়া রাষ্ট্র শুধুমাত্র অধিকারের রক্ষকই নয় ; অধিকারের স্রষ্টাও।

ষষ্ঠত, প্রকৃতি-রাজ্যের বর্ণনা, চুক্তির প্রকৃতি ও পুরসমাজের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে রুশোর বক্তব্যের মধ্যে অসামঞ্জস্য লক্ষণীয়। Discourses on the Origin of Inequality (1755) গ্রন্থের বিদ্রোহী রুশো Social Contract (1762) গ্রন্থে রাষ্ট্র কর্তৃত্বের প্রথম সমর্থক।

২.২.২ মূল্যায়ন

রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে চুক্তিবাদী তত্ত্বের উপরোক্ত সীমাবদ্ধতা থাকলেও এই তত্ত্বের ঐতিহাসিক গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। প্রথমত, চুক্তিবাদীদের কাছে মূল উদ্দেশ্য হ'ল রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের কারণ অন্বেষণ। এই কারণ অন্বেষণে এই তাত্ত্বিকগণ সঠিকভাবেই ব্যক্তিকে রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস হিসেবে চিহ্নিত করেছেন—মধ্যযুগীয় ভাবনায় ঈশ্বরের আসনে বসিয়েছেন ব্যক্তিকে। রাষ্ট্রসৃষ্টির পূর্বেকার অবস্থার বর্ণনা তাই অনুকল্প হিসেবে গৃহীত হয়েছে—ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে নয়।

দ্বিতীয়ত, সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে পুঁজির যে বিকাশ লক্ষ্য করা যায় তার প্রথম পর্বে প্রয়োজন ছিল সামন্ত, অভিজাত ও ধর্মীয় প্রাধান্যের নিয়ন্ত্রণ থেকে পুঁজিকে মুক্ত ও বিকশিত করার এবং এর জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রশক্তির। টমাস হবস-এর ব্যক্তি তাই পুঁজির বিকাশসাধনকারী স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক এবং সার্বভৌম ও চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। পরবর্তী পর্বে পুঁজিপতিরা যখন সংঘবদ্ধ ও বিকশিত তখন রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে বিরোধ অবশ্যম্ভাবী এবং ইতিহাসের এই পর্বে প্রয়োজন রাষ্ট্রশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ। জন লকের রচনায় এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালিত হয়েছে। রুশোর সময় পুঁজিবাদের সঙ্কটের সময়। পুঁজিবাদী সমাজের এই নগ্নরূপ রুশো তুলে ধরেন তাঁর Discourses on the Origin of Inequality গ্রন্থে। সম্পত্তির উদ্ভব যে সামাজিক বৈষম্যের অন্যতম কারণ ; শিল্পীর সভ্যতা যে বক্তিকে বিচ্ছিন্ন করে রুশোর এই ধারণাগুলি পরবর্তীকালে কার্ল মার্কসকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। সভ্যতা তথা পুরসমাজই যে সমাজবৈষম্যের প্রতীক—রুশোর এই তত্ত্ব শুধু ফরাসী বিপ্লবেই নয়—পরবর্তী পর্বের বিপ্লবকেও অনুপ্রাণিত করে।

তৃতীয়ত, ম্যাকফারসন (C. B. Macpherson)-এর মত টমাস হবস ও জন লকের রচনায় তদানীন্তন বস্তুবাদী মানুষ ও বাজারধর্মী সমাজের চিত্রই পরিস্ফুট হয়েছে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের ইংলণ্ডের সমাজ মূলত বাজারধর্মী অর্থাৎ ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির/সংস্থার সম্পর্ক বাজারী (market relation) সম্পর্ক —

দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক। ব্যক্তিও প্রকৃতিগতভাবে স্বার্থসচেতন—বস্তুকেন্দ্রিক, দখলদারী, মুনাফালোভী। ম্যাকফরসনের মূল্যায়ন অনুযায়ী ব্যক্তি অধিকার ও রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের প্রশ্নে হবস-এর দু'টি ধারণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি হ'ল প্রবাহমান গতির জন্য চাহিদার/প্রয়োজনের সমতা এবং দ্বিতীয়টি হ'ল সমান নিরাপত্তাহীনতা। টমাস হবস-এর ন্যায় জন লকের ব্যক্তি ও নিজের শ্রমের ও শ্রমসৃষ্ঠ সম্পত্তির মালিক, নিজস্বার্থ সিদ্ধির তাগিদেই অপরের সঙ্গে সম্পর্কে আবদ্ধ এবং অপরের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করে নিজে সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন। সমাজ ও রাষ্ট্র হ'ল ব্যক্তির এই অধিকার ও সম্পত্তিসংক্রান্ত পারস্পরিক সম্পর্কের এক চুক্তিগত ব্যবস্থাপনা। জন লক অবশ্য সব সামাজিক সম্পর্ককেই বাজারী সম্পর্ক এবং সব নৈতিকতাকেই বাজারী নৈতিকতা (market morality) বলে মেনে নেননি। টমাস হবস বাজারধর্মী সমাজ ও মুনাফাকেন্দ্রিক মানুষের প্রকৃতিচিত্রণ করলেও বাজার তথা পুঁজিবাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব তথা সঙ্কট সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন না। টমাস হবস-এর জ্ঞানের এই সীমাবদ্ধতাকে জন লক কাটিয়ে ওঠেন। রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে পুঁজিপতিদের বোঝাপড়ার এক ব্যবস্থাপনাও লকের দ্বিতীয় চুক্তির মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

২.৩ বিবর্তনবাদী তত্ত্ব

রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে বহুলপ্রচলিত তত্ত্বগুলির মধ্যে অন্যতম হ'ল বিবর্তনবাদী তত্ত্ব। এই তত্ত্বটি আবার ঐতিহাসিক তত্ত্ব নামেও পরিচিত। এই তত্ত্বের মূল বক্তব্য হ'ল—ঈশ্বরের ইচ্ছায় বা জনগণের চুক্তির মাধ্যমে হঠাৎ একদিন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়নি। রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছে দীর্ঘদিন ধরে, ধারাবাহিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে। এই ধরনের তত্ত্ব রচনায় প্রকৃতিবিজ্ঞানীদের গবেষণা, বিশেষত, গ্যালিলিওর গতিতত্ত্ব, ডারউইনের বিবর্তনবাদ, নৃতাত্ত্বিক গবেষণা, ইতিহাসের দর্শন রাজনীতিবিজ্ঞানীদের প্রভাবিত করেছে। এই তত্ত্বটি ঐতিহাসিক ভাববাদীদের রচনায়, ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ববাদী তত্ত্বে, বিবর্তনবাদী তত্ত্বে, নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় বিধৃত হয়েছে।

২.৩.১ বিবর্তনবাদী তত্ত্বের ক্রমবিকাশ ও বিভিন্ন ধারা

রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে বিবর্তনবাদী তত্ত্বের প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায় প্রাচীন গ্রীসের (খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম-চতুর্থ শতকে) দার্শনিকদের রচনায়। অরিস্টটল Politics গ্রন্থে রাষ্ট্রকে পরিবারেরই সম্প্রসারিত রূপ বলে উল্লেখ করেন। আরিস্টটলের দর্শনের উদ্দেশ্য হ'ল সুন্দর জীবন, যা সম্ভবপর হয় পরিবারের মাধ্যমে। ব্যক্তির দু'টি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি/সম্পর্ক যথা জৈবিক এবং অর্থনৈতিক (স্থানান্তরে তিনটি—অপত্যস্নেহ/সম্পর্ক) এর উপর ভিত্তি করে পরিবার যেহেতু গড়ে ওঠে সেহেতু পরিবার ব্যক্তিজীবনের স্বাভাবিক সংগঠন। পরিবারেরই সম্প্রসারিত রূপ হ'ল গ্রাম এবং তার সর্বোচ্চ রূপ হয় রাষ্ট্র—সেহেতু রাষ্ট্রও ব্যক্তিজীবনে স্বাভাবিক সংগঠন। পরিবারের ন্যায় রাষ্ট্রেরও লক্ষ্য হ'ল সর্বোচ্চ মঙ্গলসাধন। কারণ রাষ্ট্র হ'ল এক সুসংহত সমাজের প্রতিনিধিস্বরূপ। আরিস্টটলের এই দর্শন মধ্যযুগে অগাস্টিন-এর রচনায় এবং আধুনিক যুগে হেগেনের রচনায় লক্ষ্য করা যায়। বস্তুত, ঊনবিংশ শতকের অধিকাংশ দার্শনিকদের মধ্যে বিবর্তনবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণের প্রবণতা অত্যন্ত প্রবল। গ্যালিলিওর গতিতত্ত্ব ডারউইনের বিবর্তনবাদ, স্পেনসার, বেজহট প্রমুখ সমাজতাত্ত্বিকদের সমাজবিকাশের মূলসূত্রগুলিকে আবিষ্কার করার প্রয়াস, ইতিহাসের দর্শন গড়ে তোলার তাগিদ, অ্যাডাম স্মিথের অর্থনীতিবিকাশের

স্বরূপসন্ধান—সবই এই বিবর্তনবাদী ধারার অনুসারী। এককোষী প্রাণী থেকে বহুকোষী প্রাণীর যাত্রাপথের সঙ্গে সরল সমাজ থেকে জটিল শিল্পীয় সমাজের ক্রমরূপান্তরের বিষয়টির বিশ্লেষণ এই সমাজকার তাত্ত্বিকদের রচনার মূল বৈশিষ্ট্য।

আরিস্টটলের মত হেগেলও রাষ্ট্রকে বিবর্তনের প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করেন। পরমমঙ্গল যেখানে আরিস্টটলের লক্ষ্য, হেগেনের রাষ্ট্রদর্শনে সেখানে যুক্তি/ভাব/আত্মার বিকাশই প্রধান। হেগেনের মতে এই লক্ষ্যপূরণের জন্যই তথা যুক্তি/ভাব/আত্মার বিকাশের প্রথম স্তর হিসেবে পরিবারের উদ্ভব। এই পরিবারেই যুক্তিসিদ্ধ পারস্পরিক প্রীতি বা ভালোবাসা মূর্ত হয়, মানুষের ইন্দ্রিয়জ অভাব বা প্রয়োজন মেটে। কিন্তু দেখা গেল বহুবিচিত্র মানবিক প্রয়োজনগুলি মেটানোর জন্য পরিবার যথেষ্ট বা স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তখন উদ্ভব হয় পুরসমাজ (civil society)-এর, যা পরিবার (Thesis)-এর প্রতিবাদ (Anti-thesis), কারণ পরিবার যেখানে পারস্পরিক সর্বপ্রীতির উপর প্রতিষ্ঠিত পুরসমাজ সেখানে মানুষের প্রয়োজনগুলি মেটানো সত্ত্বেও প্রকৃতিগতভাবে ব্যক্তিমঙ্গল প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে বিচ্ছিন্ন। পরিবার এবং পুরসমাজের সুবিধাগুলি নিয়ে এবং সীমাবদ্ধতাগুলি দূর করে উভয়ের চেয়ে উন্নততর/উচ্চতর এবং পূর্ণতর যে প্রতিষ্ঠানটির উদ্ভব ঘটল তা হ'ল রাষ্ট্র। এভাবে পরিবার ও পুরসমাজের অপূর্ণতা দূর করে উভয়ের মধ্যে ঐক্য ও সমগ্রতাসাধন করে যুক্তি/ভাব/আত্মা তার চূড়ান্ত পরিপূর্ণতা লাভ করে রাষ্ট্রের মধ্যে। এ কারণে, আরিস্টটলের মত হেগেলও মনে করেন, রাষ্ট্র ব্যক্তিজীবনের এক স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রস্বার্থ ও ব্যক্তিস্বার্থের মধ্যে কোন বিরোধ নেই এবং রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ব্যক্তির কোন অধিকারও থাকতে পারে না। ব্যক্তি তার সার্থকতা খুঁজে পায় রাষ্ট্রের মধ্যে।

হেগেলের মত কার্ল মার্কসও রাজনীতিবিশ্লেষণে এই বিবর্তন ধারায় বিশ্বাসী। অবশ্য হেগেল যেখানে রাষ্ট্রকে যুক্তি/ভাব/আত্মার বিকাশের চূড়ান্ত ও পরিপূর্ণরূপ হিসেবে ব্যাখ্যা করেন, কার্ল মার্কস সেখানে উৎপাদিকাশক্তির বিকাশের প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রকে ব্যাখ্যা করেন। যে সমস্ত মানুষ নিয়ে রাষ্ট্র গঠিত তাদের জীবনের বাস্তবতা তথা বস্তুগতজীবন, উৎপাদনপ্রক্রিয়া। ও তার সঙ্গে মানানসই সামাজিক নিয়মকানুন ও সংগঠনের প্রকৃতির মাধ্যমে রাষ্ট্রকে জানা সম্ভব। মার্কসের মতে, সমাজবিকাশের তথা উৎপাদনপদ্ধতির বিকাশের এক নির্দিষ্ট পর্বে রাষ্ট্রের উদ্ভব। উৎপাদনপদ্ধতি যতদিন ছিল আদিম, যেখানে শ্রমবিভাজন ছিল না, ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণাও ছিল না এবং সে কারণে শ্রেণীও ছিল না—রাষ্ট্রের প্রয়োজনও তখন দেখা দেয়নি। কিন্তু উৎপাদনপদ্ধতির বিকাশের ফলশ্রুতিতে আদিমসাম্যবাদী সমাজ ভেঙ্গে যাবার পর সমাজে শ্রমবিভাজন দেখা দেয়। গড়ে ওঠে সম্পত্তি-সম্পর্ক ও তারই পরিণতিতে বিভিন্ন শ্রেণী, তখনই শ্রেণীনিপীড়নের সহায়ক যন্ত্র হিসেবে রাষ্ট্রের উদ্ভব। এই নবোদ্ভূত শ্রেণীবিভক্ত সমাজের এক শ্রেণীর উপর অপর শ্রেণীর শোষণে সহায়তা করা এবং শৃঙ্খলারক্ষা করাই রাষ্ট্রের অন্যতম কাজ। তাই রাষ্ট্র বাইরে থেকে সমাজের উপর চাপিয়ে দেওয়া কোন শক্তি নয়—সমাজবিকাশের একটি বিশেষ পর্যায়ের ফল। এভাবে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী পদ্ধতি প্রয়োগের মধ্য দিয়ে কার্ল মার্কস রাষ্ট্রের উদ্ভব ও বিকাশের রূপকে বিশ্লেষণ করেন। হেগেলের বক্তব্য থেকে কার্ল মার্কসের বক্তব্যের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। হেগেল যেখানে রাষ্ট্রের মধ্যে ব্যক্তিজীবনের চূড়ান্ত সার্থকতা খুঁজে পেয়েছেন কার্ল মার্কস সেখানে রাষ্ট্রের স্থায়িত্বের ধারণাকে খারিজ করে রাষ্ট্রের বিলুপ্তির কথা বলেছেন। যেদিন সমাজে শ্রেণীশোষণের অবসান হবে, সেদিন রাষ্ট্রনামক শোষণযন্ত্রের প্রয়োজনও ফুরিয়ে যাবে। যে প্রয়োজনে অর্থাৎ

শ্রেণীশোষণের স্বার্থে রাষ্ট্রের উদ্ভব সেই প্রয়োজনের অভাব রাষ্ট্রেরও অবলুপ্তি ঘটবে। গড়ে উঠবে রাষ্ট্রহীন এক সাম্যবাদী সমাজ।

রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে রাষ্ট্রদার্শনিকদের উপরোক্ত বিবর্তনবাদের পাশাপাশি আরেকটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। এই ধারাটি পুষ্ট করেন সমাজতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিকগণ। বাজার এবং ধর্মের সম্প্রসারণের তাগিদে ইউরোপের বণিক ও যাজকশ্রেণী পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে পাড়ি দেয়। ভিন্ন জনগোষ্ঠী (যা মূলতঃ আদিম ও প্রাক্-শিল্পীয়) সম্পর্কে ইউরোপীয়দের তাগিদ ও বিশ্লেষণ ইউরোপে এক নূতন ইতিহাসচর্চার সূত্রপাত ঘটায়। তারই পরিণতিতে সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের উদ্ভব। নৃতাত্ত্বিকগণ এই আদিম ও প্রাক্শিল্পীয় সমাজের রাজনৈতিক প্রকৃতিবিশ্লেষণ করতে গিয়ে ইউরোপীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে পার্থক্যকে তুলে ধরেন এবং এই সিদ্ধান্তে আসেন যে প্রতিটি সমাজই ব্যক্তি-গোষ্ঠী সম্পর্ক পরিচালনায় এক ধরনের শাসনব্যবস্থাকে কায়েম করে এই ব্যবস্থা আধুনিক রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন নাও হতে পারে। আদিম তথা প্রাক্শিল্পীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে রাষ্ট্র বলা যাবে কিনা সে সম্পর্কে ফোর্টস (Fortes), প্রিচার্ড (E. E. Evans Pritchard), স্যাপেরা (Schapera), র‍্যাডক্লিফ ব্রাউন (Radcliffe Brown) প্রমুখ নৃতাত্ত্বিকদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও এই রাজনৈতিক ব্যবস্থা যে ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে আধুনিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়েছে সে সম্পর্কে সকলে একমত পোষণ করেন।

নৃতাত্ত্বিক মর্গান ব্যক্তির রাজনৈতিক বিকাশকে দু'টি স্তরে ভাগ করেন। প্রথম স্তরটি হ'ল জ্ঞাতিগোষ্ঠী সংগঠন, যাকে পরবর্তীকালে সমাজবিজ্ঞানীগণ সামাজিক সংগঠন বলে অভিহিত করেন। মর্গানের মতে সম্পত্তির ধারণা এবং ভৌগোলিক এলাকাবিশিষ্ট সরকারের ধারণা পরবর্তী পর্যায়ে সৃষ্ট। এই পর্বটিকে রাষ্ট্র নামে অভিহিত করা না গেলেও রাজনৈতিক ব্যবস্থা বলে অভিহিত করা যায়। ফোর্টস (Fortes) এবং প্রিচার্ড (E. E. Evans Pritchard) আদর্শ সমাজের এই রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে রাষ্ট্রের পার্থক্য করেন এবং মনে করেন প্রতিটি সমাজেই রাজনৈতিক ব্যবস্থা রয়েছে। অবশ্য সরকারের উপস্থিতি রাষ্ট্রের মধ্যেই এবং কেন্দ্রীভূত কর্তৃত্ব, ভৌগোলিক প্রসারণ এবং বিচারবিভাগীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ একমাত্র রাষ্ট্রেরই বৈশিষ্ট্য যা সমাজবিকাশের ধারায় পরবর্তীকালে সৃষ্ট।

২.৩.২ বিভিন্ন উপাদান

রাষ্ট্রের উদ্ভব ও বিকাশে যে সমস্ত শক্তি/উপাদানগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে তাহ'ল—(ক) রক্তের সম্পর্ক, (খ) অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, (গ) ক্ষমতা, (ঘ) ধর্ম এবং (ঙ) রাজনৈতিক চেতনা।

(ক) রক্তের সম্পর্ক—মর্গান, হেনরী মেইন (Henry Maine) প্রমুখ তাত্ত্বিকগণ জ্ঞাতিসম্পর্ককেই রাষ্ট্রগঠনের আদি উপাদান বলে উল্লেখ করেন। রক্তের সম্পর্কই ব্যক্তিকে গোষ্ঠীবদ্ধ করে একত্রে বসবাস করার প্রেরণা যোগায়। উত্তর আমেরিকার Iroquis উপজাতিদের উপর সমীক্ষা চালিয়ে মর্গান এই সিদ্ধান্তে আসেন যে ক্রমবর্ধিত জ্ঞাতিসম্পর্কই রাজনৈতিক সম্পর্কে রূপান্তরিত হয়। ভাষাতাত্ত্বিকগণও মনে করেন king শব্দটি উদ্ভূত হয়েছে kin শব্দ থেকে। মর্গানকে অনুসরণ করে সমাজতাত্ত্বিক ম্যাকাইভার বলেন, 'জ্ঞাতিসম্পর্কই সমাজ সৃষ্টি করেছে এবং সমাজ অবশেষে সৃষ্টি করেছে রাষ্ট্র'। অধিকাংশ সমাজতাত্ত্বিকই মনে করেন, যৌন চাহিদা ও রক্তের সম্পর্কই পরিবার গঠন ও সম্প্রসারণের অন্যতম কারণ। সম্প্রসারিত পরিবার ক্রমশঃ গোষ্ঠীর রূপলাভ করলে পরিবারের বয়ঃজ্যেষ্ঠ পুরুষ বা মহিলার ন্যায় গোষ্ঠীর বয়ঃজ্যেষ্ঠ পুরুষ বা মহিলার প্রাধান্য গোষ্ঠীর

অন্যান্য সদস্যদের কাছে স্বীকৃত হ'তে থাকে। পূর্বপুরুষের নাম, বংশচেতনা, গোত্রের ধারণা একদিকে যেমন বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে ঐক্যবোধকে জাগ্রত করে অপরদিকে গোষ্ঠীচেতনা ও আনুগত্যের ধারণাকে গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

স্যাপেরা (Schapera)-র মতে এমন কোন সমাজ নেই যেখানে রাজনৈতিক ব্যবস্থার সভ্য হওয়া একমাত্র জ্ঞাতিসম্পর্কের উপর নির্ভরশীল। স্যাপেরার মতে, মর্গান যে উপজাতির উপর সমীক্ষা চালান সেই উপজাতিগুলি মূলতঃ শিকারী ও সংগ্রাহকগোষ্ঠী এবং এ কারণেই প্রকৃতিগতভাবে ভ্রাম্যমান। এই ভ্রাম্যমান প্রতিটি গোষ্ঠী রক্তের সম্পর্কে আবদ্ধ এবং প্রত্যেকে অপরগোষ্ঠী থেকে ভিন্ন ও অপরগোষ্ঠীর যে কোনরকম নিয়ন্ত্রণমুক্ত। স্যাপেরা অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী এবং দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার বুশম্যান (Bushman)-দের উপর সমীক্ষা করেন। এই গোষ্ঠীগুলি পশুপালকগোষ্ঠী এবং প্রাথমিক স্তরের কৃষিভিত্তিকগোষ্ঠী। এই গোষ্ঠীগুলির সকল সদস্যই একই পরিবারভুক্ত বা বংশোদ্ভূত নয়। যৌন সম্পর্ক যখন ক্রমশঃ নিয়ন্ত্রিত হ'তে থাকে এবং বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব ঘটতে থাকে তখন একই পরিবারের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ হ'তে থাকে, ফলে বিভিন্ন গোত্র বা বংশোদ্ভূত ব্যক্তিদের নিয়ে এই গোষ্ঠীগুলি গড়ে উঠতে থাকে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক, বিভিন্ন গোত্রের বা বংশোদ্ভূত ব্যক্তিদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হ'তে থাকে। এভাবে সম্প্রসারিত আত্মীয়তার সম্পর্ক রাষ্ট্রের জন্ম দেয়।

(খ) অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ঃ অর্থনৈতিক কার্যাবলী আদিম যুগে ব্যক্তিদের পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। শিকারী ও সংগ্রাহক সমাজব্যবস্থায় যৌথ বসবাস ছিল অপরিহার্য, কারণ প্রকৃতি ও অন্যান্য জন্তুদের সঙ্গে সংঘর্ষে মানুষ বাধ্য হয়েছে যুথবদ্ধ হ'তে। জমির যেহেতু স্থানান্তরকরণ সম্ভবপর নয়, সেহেতু কৃষিভিত্তিক উৎপাদনব্যবস্থা মানুষকে নির্দিষ্ট স্থানে বসবাসে তথা গ্রামপত্তনে সহায়তা করেছে। জঙ্গল বা অকৃষিজমিকে কৃষিজমিতে রূপান্তরকরণ, সেচব্যবস্থা, কৃষিক্ষেত্রকে অন্যান্য পশু থেকে রক্ষা করা, কৃষিকার্য সম্পাদনে হাতিয়ার তৈরী করা—প্রভৃতির প্রয়োজনে মানুষের মধ্যে সহযোগিতা গড়ে তুলতে, একত্র বাস করতে বাধ্য করেছে। গ্রামের পত্তন, উদ্বৃত্ত খাদ্য, ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব, শ্রমবিভাজন, শ্রমবিভাজনজনিত পরস্পরনির্ভরশীলতা ও বৈরিতা, শ্রেণীর উদ্ভব—সবকিছুই মানুষের সভ্যতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সম্পত্তির ধারণা, বংশজদের মধ্যে সম্পত্তির প্রবাহমানতা তথা হস্তান্তরকরণ ক্রমশঃ আইন ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার জন্ম দিয়েছে।

(গ) ধর্ম—আদিম সমাজব্যবস্থায় সমাজবন্ধনের ক্ষেত্রে ধর্ম এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আদিম সমাজে অবশ্য ধর্ম বলতে প্রকৃতি (প্রাকৃতিক শক্তি, যথা—জল, বাতাস, ঝড়, বজ্র, প্রাকৃতিক উপাদান যথা—গাছ, পাথর জন্তু) এবং পূর্বপুরুষদের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য অনুষ্ঠিত ক্রিয়াকলাপকে বোঝানো হ'ত। আদিম মানুষ ঝড়, বজ্র, ঋতুপরিবর্তন, ভূমিকম্প, দাবদাহ প্রভৃতি বিপর্যয়কে অতিপ্রাকৃত শক্তির ক্রোধ বলে মনে করত এবং এর থেকে রক্ষা পাবার জন্য কিছু অর্পণ তথা পুজো করতো। অপরদিকে রোগ, শোক, দুঃখ-দুর্দশাকে পূর্বপুরুষের অসন্তুষ্টি বলে মনে করে সন্তুষ্টিবিধানে চেষ্টা করতো। স্বপ্নের ঘটনাকেও অতিন্দ্রিয় ঘটনা বলে মনে করা হ'ত। পূজাপার্বণ ও অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বয়ঃজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি তথা গোষ্ঠীপতিই ছিলেন প্রধান এবং তাঁর নিয়ন্ত্রণেই এই অনুষ্ঠানগুলি সম্পাদিত হ'ত। এই গোষ্ঠীপতি ছিলেন একাধারে গোষ্ঠীর প্রধান পরিচালক, অপরদিকে পুরোহিত। পরবর্তীকালে শ্রমবিভাজনের ফলে এই দুই ধরনের কাজ দুই ভিন্ন পদাধিকারীর জন্ম দেয়। জেমস ফ্রেজার (James Frazer)-এর মতে উপজাতিদের মধ্যে প্রথম যে সরকারের নমুনা পাওয়া যায় তা বয়স্ক ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত সংস্থা

(Gerentocracy) এবং মনে করা হ'ত এই বয়স্ক ব্যক্তিগণ প্রকৃতি ও অতিপ্রাকৃত শক্তির রহস্যগুলি জানে এবং নিয়ন্ত্রণেও সক্ষম। ধর্মের প্রতি এই আনুগত্য সমাজের প্রতি আনুগত্যকেই বাড়িয়ে তোলে। সুতরাং বলা যায়, ধর্ম আদিম সমাজে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে যৌথভাবে কার্যসম্পাদনে তথা গোষ্ঠীচেতনায় জাগ্রত করে ; আনুগত্যের শিক্ষা দেয় এবং শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়।

(ঘ) ক্ষমতা—আদিম যুগের মানুষকে একদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরুদ্ধে, অপরদিকে অন্যান্য জন্তুদের আক্রমণ থেকে রক্ষার তাগিদে লড়াই করতে হয়েছে। খাদ্যসংগ্রাহক ও শিকারীসমাজে খাদ্য সংগ্রহের তাগিদে পশুর বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে যুথবদ্ধভাবেই। পরবর্তীকালে পশুপালন ও খাদ্য-উৎপাদনের যুগে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ ছিল স্বাভাবিক। গৃহপালিত পশু যথা গবাদিপশুর অপহরণকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের বিবরণ প্রাচীন যুগের বিভিন্ন গ্রন্থে পাওয়া যায়। ঋকবেদে স্তুতি করা হয়েছে 'গোধন'-এর জন্য, সংঘর্ষে পরাজিত ব্যক্তিগোষ্ঠীকে দাস হিসেবে ব্যবহার করার রীতিও লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তীকালে সম্পত্তি সংরক্ষণের তাগিদে, মালিকানা নিয়ে সংঘাত মীমাংসায় ক্ষমতাপ্রয়োগ ছিল আবশ্যিক। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এই ক্ষমতারই সংঘবদ্ধ রূপ। গোষ্ঠীসংঘর্ষে যে গোষ্ঠী জয়ী হ'ত সেই গোষ্ঠীর প্রধান রাজনৈতিক প্রধান বা শাসক হিসেবে এই ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী হ'ত। যখন শাসক কর্তৃক রাজত্ব আদায়ের (প্রধানত, কৃষিভিত্তিক উৎপাদনব্যবস্থার স্তরে) বিষয়টি চালু হ'ল তখন নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার ধারণার সৃষ্টি হ'ল। এভাবে গড়ে উঠল নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকাভুক্ত আধুনিক রাষ্ট্রের ধারণা। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে (নিজগোষ্ঠী ও বিজিত গোষ্ঠীগুলির মধ্যে) শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং অন্যগোষ্ঠীর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার তাগিদে এই ক্ষমতার সংরক্ষণ ছিল অপরিহার্য। এই ক্ষমতার ব্যবহারের প্রয়োজনে গড়ে উঠেছে সরকারী ব্যবস্থাপনা।

(ঙ) রাজনৈতিক চেতনা—রাষ্ট্রের বিকাশে রাজনৈতিক চেতনার বিষয়টি রাজনীতিবিজ্ঞানীগণ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেন। সমস্বার্থগোষ্ঠীর মধ্যে সমজাতীয়তার ধারণা গড়ে ওঠে। সদস্যদের এই চেতনাই মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হ'তে ও সংগঠন গড়ে তুলতে অনুপ্রাণিত করে। অ্যারিস্টটলের রচনায় দেখা যায় সুখী জীবনের চেতনা মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে। হেগেল মনে করেন ব্যক্তিচেতনার চরম প্রকাশ হিসেবে রাষ্ট্রের উদ্ভব। এমনকি, চুক্তিবাদী তাত্ত্বিক টমাস হবস এবং জন লক-এর রচনাতেও প্রকৃতি-রাজ্যে বসবাসকারী মানুষ প্রকৃতি-রাজ্য ছেড়ে রাষ্ট্র গঠন করেছে রাজনৈতিক চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে। এই চেতনাই মানুষকে তার অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে অনুপ্রাণিত করে ; রাষ্ট্রকে মেনে চলা বা না চলার তথা আনুগত্যের বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে।

২.৩.৩. উপসংহার

বিবর্তনবাদী তত্ত্বে রাষ্ট্রকে সমাজবিকাশের এক পর্বে সৃষ্ট বলে উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু ঠিক কোন্ পর্বে এবং কি ধরনের ঘটনাবলীর প্রভাবে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হ'ল সে সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট বক্তব্য নেই। যদি ধরে নেওয়া যায়, প্রতিটি সমাজেই এমনকি আদিম সমাজেও রাজনৈতিক ব্যবস্থা বিদ্যমান এবং তা আধুনিক অর্থে রাষ্ট্রপদবাচ্য নয়, তথাপি উক্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে রাষ্ট্রের পার্থক্য নির্ণয় দুরূহ হয়ে পড়ে। নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকাসম্পন্ন কর্তৃত্বের ধারণাই যদি রাষ্ট্রের জন্ম দেয় তাহলে সেই রাষ্ট্রের উদ্ভব চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকের আগে নয়। এ কারণেই প্রাচীন গ্রীসের Polis-কে রাষ্ট্র বা নগর-রাষ্ট্র বলার পরিবর্তে পুর বা নগর বলাই বাঞ্ছনীয়। রোমানপর্বে civitas কেও রাষ্ট্র বলা যাবে কিনা তাও বিতর্কের বিষয়। তাছাড়া অ্যারিস্টটল

বা হেগেল-এর বিশ্লেষণে রাষ্ট্রসৃষ্টির পিছনে কোন উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যকে সিঞ্চিতকরণ করা হয়েছে সমাজতাত্ত্বিক বা নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে এ ধরনের কোন উদ্দেশ্যকে চিহ্নিতকরণ করা হয়নি। এ কারণে রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের বিষয়টিও এই ধরনের বিশ্লেষণে অনুপস্থিত। অবশ্য রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে যে সমস্ত তত্ত্বগুলি রয়েছে তার মধ্যে বিবর্তনবাদী তত্ত্বটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য। কোন একটি উপাদান বা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রের উদ্ভবকে বিশ্লেষণ না করে রাষ্ট্রসৃষ্টির পিছনে বহুবিধ কারণের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

অবশ্য, এর ব্যতিক্রমও লক্ষ্য করা যায়। কার্ল উইটফোগেল (Karl Wittfogel, 1975)-এর ন্যায় বেশ কিছু তাত্ত্বিক রয়েছেন যাঁরা রাষ্ট্রের উদ্ভবের কারণ হিসেবে কৃষিভিত্তিক উৎপাদনব্যবস্থাকে দায়ী করেন। মেসোআমেরিকা (Mesoamerica), দক্ষিণ ইরাক (সুমেরীয় অঞ্চল) নীলনদের অববাহিকা অঞ্চলে যে প্রাচীনতম নগর-রাষ্ট্রের বিকাশ ঘটে তার অন্যতম কারণ হ'ল, উক্ত তাত্ত্বিকের মতে, কৃষিভিত্তিক উৎপাদনব্যবস্থা বা কৃষি-উৎপাদনব্যবস্থা। কৃষিউৎপাদনে সেচব্যবস্থায় শ্রমসরবরাহ ও পরিচালনার জন্য এক রাজনৈতিক এলিটগোষ্ঠীর সৃষ্টি হয় এবং এই এলিটগোষ্ঠীই সমাজে শাসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। রবার্ট অ্যাডামস (Adams, 1960) অবশ্য দক্ষিণ ইরাকে (সুমেরীয় অঞ্চলে) নগররাষ্ট্রের উদ্ভবের কারণ হিসেবে সেচব্যবস্থার পরিবর্তে কৃষি-উৎপাদনব্যবস্থায় জমির মালিকানা, সীমানানির্ধারণ, উৎপাদন, অপর গোষ্ঠীর সঙ্গে জমির এলাকা নিয়ে বিরোধনিষ্পত্তির জন্য নিরাপত্তাবাহিনী ও রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রয়োজন—প্রভৃতি কারণগুলিকে উল্লেখ করেন। রবার্ট অ্যাডামস-এর মতে, দক্ষিণ ইরাকে নগরপত্তনের গোড়ার দিকে সেচব্যবস্থা ছিল খুবই সাধারণ মানের এবং ক্ষুদ্রায়তনবিশিষ্ট যেখানে ব্যাপক শ্রম ও তা পরিচালনার প্রয়োজন হ'ত না। রবার্ট কারনায়েরো (Robert Carneiro, 1970)-র মতে ভৌগোলিক ও সামাজিক দিক থেকে আবদ্ধ এক নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে জনসংখ্যা বৃদ্ধিই রাষ্ট্রের উদ্ভবের কারণ। পেরু অঞ্চলের উপর সমীক্ষা চালিয়ে কারনায়েরো এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্ব বাড়তে থাকে এবং পরাজিত গোষ্ঠীগুলিকে বিজয়ী গোষ্ঠীর অধীনে থাকতে হয়। অবশ্য, যতদিন পর্যন্ত স্থানাভাব না ঘটে ততদিন পর্যন্ত গোষ্ঠীগুলি বশ্যতার পরিবর্তে আরো গভীর অরণ্যে বা ফাঁকা জায়গায় বসতি গড়ে। কিন্তু, যখন পাহাড়, সমুদ্র, মরুভূমি—প্রভৃতির ফলে আর নূতন বসতিস্থাপন সম্ভবপর নয় তখন আনুগত্য স্বীকার করা ছাড়া অন্য কোন পথ থাকে না। ব্লানটন (Richard E. Blanton) কোয়ানেস্কি (Kowaniski) ফিনম্যান (Fienman) অবশ্য রাষ্ট্রসৃষ্টির কারণ হিসেবে উপরোক্ত বক্তব্যকে অস্বীকার করেন। কার্ল পোলানী (Karl Polanyi, 1957)-র মতে, প্রাচীনতম রাষ্ট্রগুলির উদ্ভবের কারণ হ'ল বাণিজ্য। রাইট এবং জনসন (Wright and Johnson) এই তত্ত্বের সমর্থনে বলেন, উৎপাদিত দ্রব্যগুলির রপ্তানি, আমদানিকৃত দ্রব্যগুলির বিষয়, বাণিজ্যের নিরাপত্তা—প্রভৃতি কারণে এক সংঘটিত ক্ষমতার দরকার হয়। এই সংগঠিত ক্ষমতাই রাষ্ট্রের সৃষ্টি করে।

উপরোক্ত আলোচনা থকে বলা যায়, ঠিক কোন্ কারণে এবং কেন রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটল সে সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। সম্ভবত, বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন পরিস্থিতি কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার জন্ম দিয়েছে এবং যা পরবর্তী পর্যায়ে রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটিয়েছে। সেচব্যবস্থা, কৃষিউৎপাদন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বাণিজ্য প্রভৃতি ঘটনাগুলির মধ্যে কোন একটি ঘটনা বা একাধিক ঘটনার সমন্বয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার উদ্ভবে সহায়তা করেছে। কিন্তু সব জায়গাতেই একটিমাত্র ঘটনা উপাদানকেই রাষ্ট্রসৃষ্টির কারণ হিসেবে উল্লেখ করা সমীচীন নয়।

২.৪ রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কিত বিভিন্ন তত্ত্ব

অতিপ্রাচীনকাল থেকেই রাজনীতিবিজ্ঞানীগণ ব্যক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক, ব্যক্তিজীবনে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা, রাষ্ট্রকে মেনে চলার যৌক্তিকতা প্রভৃতি বিষয়গুলি আলোচনা করতে গিয়ে রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন তত্ত্বের অবতারণা করেছেন। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল রাষ্ট্রকে ব্যক্তি-জীবনের এক স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান বলে ব্যাখ্যা করেন এবং একমাত্র রাষ্ট্রের মধ্যেই ব্যক্তির মঙ্গল সাধিত হ'তে পারে বলে মতপ্রকাশ করেন। অ্যারিস্টটলের মত হেগেলও রাষ্ট্রকে ব্যক্তিসত্তার চরম প্রকাশ বলে ব্যাখ্যা করেন। অপরদিকে কার্ল মার্কস রাষ্ট্রকে শ্রেণীস্বার্থের প্রয়োজনে গড়ে ওঠা এক নিপীড়নমূলক যন্ত্র-বলে অভিহিত করেন। রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে প্রচলিত তত্ত্বগুলি হ'ল চুক্তিবাদী তত্ত্ব। জৈবতত্ত্ব, আদর্শবাদী বা ভাববাদী তত্ত্ব, উদারনীতিবাদী তত্ত্ব ও মার্কসীয় তত্ত্ব। এই সমস্ত তত্ত্বগুলির মধ্যে জৈববাদী তত্ত্ব এবং আদর্শবাদী তত্ত্বের আলোচনাই আমাদের উদ্দেশ্য। তত্ত্বদু'টির উদ্ভবের প্রেক্ষাপট, মূল বক্তব্য এবং সীমাবদ্ধতার বিষয়টিও আলোচিত হবে।

২.৪.১ জৈব মতবাদ

রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে জৈব মতবাদে রাষ্ট্রকে জীবদেহের সঙ্গে তুলনা করা হয়। চুক্তিবাদী তাত্ত্বিকদের ন্যায় জৈববাদের প্রবক্তাগণ রাষ্ট্রকে এক কৃত্রিম যন্ত্রবিশেষ বা ব্যক্তির সমষ্টিমাত্র না দেখে এক সজীব অখণ্ড সত্ত্বা হিসেবে ব্যাখ্যা করেন এবং জীবদেহের অনুরূপ বলে মতপ্রকাশ করেন। রাষ্ট্রকে এভাবে জীবদেহের সঙ্গে তুলনা করে রাষ্ট্রের প্রকৃতিবিশ্লেষণ করা হয় প্রাচীন গ্রীসের দার্শনিক প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের রচনায়। রোমক দার্শনিক সিসেরো ও মধ্যযুগের শেষপর্বের চিন্তাবিদ মার্সিলিওর রচনায় লক্ষ্য করা গেলেও এই মতবাদটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে ঊনবিংশ শতকের দার্শনিকদের, বিশেষত ইংলন্ডের দার্শনিক ও সমাজতাত্ত্বিকদের রচনায়।

অষ্টাদশ শতকে ইউরোপের সমাজবিশ্লেষণে বিবর্তনবাদীধারা লক্ষ্য করা যায়। সরল সমাজ থেকে ক্রমোন্নয়নের মধ্য দিয়ে জটিল যৌগিক সমাজের রূপান্তরের যে চিত্র অ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith 1723-1790), স্টিয়ার্ট (Dugald, Stewart 1753-1828), অ্যাডাম ফার্গুসন (Adam Ferguson 1723-1816) চিত্রায়িত করেন তারই পরিণতি দেখা যায় হার্বার্ট স্পেনসার (Herbert Spencer 1820-1903)-এর রচনায়। এ সময় জীববিজ্ঞানীদের এবং সমাজতাত্ত্বিকদের রচনা রাজনীতিবিজ্ঞানীদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। হার্বার্ট স্পেনসার প্রাণিজগতের বিবর্তনের সঙ্গে সমাজবিবর্তনের তুলনা করে দেখিয়েছেন যে, প্রাণিজগৎ যেমন সরল থেকে ক্রমশ জটিল অবস্থার দিকে অগ্রসর হয়েছে সমাজসভ্যতার বিবর্তন ও সেরূপ ক্রমশ সরল সমাজব্যবস্থা থেকে জটিল শিল্পীয় সমাজব্যবস্থায় রূপান্তরিত হয়েছে। পরস্পরনির্ভরশীল ও সংবদ্ধ বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে যেমন জীবদেহ গঠিত রাষ্ট্র তথা সমাজ ও বিভিন্ন ব্যক্তি/শ্রেণী নিয়ে গঠিত। একইভাবে ব্লুন্টস্‌লি (Bluntsli) মানবদেহের সঙ্গে রাষ্ট্রের তুলনা করে বলেন, মানবদেহের যেমন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রয়েছে, তাদের নির্দিষ্ট সমন্বিত একাজ প্রবাহ রয়েছে ; রাষ্ট্রেরও অনুরূপ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তথা সহকারী ব্যবস্থা ও জীবনপ্রবাহ রয়েছে।

২.৪.২ জীবদেহের সঙ্গে রাষ্ট্রের তুলনা

জৈব মতবাদের প্রবক্তাগণ রাষ্ট্রকে কৃত্রিম নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র হিসেবে না দেখে এক অখণ্ড সজীব সত্ত্বা হিসেবে,

জীবদেহের প্রতিরূপ হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। জীবদেহের যেমন জন্ম, বিকাশ ও ক্ষয় রয়েছে রাষ্ট্রেরও সেরূপ সৃষ্টি, বিকাশ ও ক্ষয় ঘটে। উভয় ক্ষেত্রেই এই বিকাশের কারণ নিহিত থাকে দেহের অভ্যন্তরে।

দ্বিতীয়ত, জীবদেহে যেমন প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এবং কার্যসূত্রে আবদ্ধ ; কোন অঙ্গকে দেহ থেকে আলাদা করে তার অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভবপর নয়—রাষ্ট্রেরও সেরূপ ব্যক্তি ও ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানগুলি রাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোন ব্যক্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভবপর নয়। শরীর থেকে কোন কোষ বিচ্ছিন্ন হ'লেও যেমন সমগ্র শরীরের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না, রাষ্ট্র থেকে কোন ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন হ'লেও সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব নষ্ট হয় না।

তৃতীয়ত, জীবদেহের নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে এবং তাহল তার বিকাশসাধন ও পরবর্তী প্রজন্মের মধ্য দিয়ে জীবনপ্রবাহ বজায় রাখা। রাষ্ট্রের সেরূপ নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে।

চতুর্থত, জীবদেহের বিভিন্ন কোষ যেমন একটি স্নায়ুতন্ত্র দ্বারা পরিচালিত হয় রাষ্ট্রও সেরূপ সরকার দ্বারা পরিচালিত হয়। জীবদেহের বিভিন্ন শিরা-উপশিরা যেমন পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, রাষ্ট্রও অনুরূপভাবে আঞ্চলিক ও স্থানীয় শাসনব্যবস্থা, সরকারের বিভিন্ন বিভাগ পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত ও কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

পঞ্চমত, জীবদেহের কোন অংশ বা কোষ ক্ষয়প্রাপ্ত হ'লে যেমন প্রাকৃতিক নিয়মে নতুন কোষ ক্ষয়প্রাপ্ত অংশের স্থান পূরণ করে, রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ব্যক্তির মৃত্যুজনিত বা স্থানান্তরজনিত অনুপস্থিতি নূতন জমি দ্বারা পূরিত হয়। অনুরূপভাবে, একটি সরকারের স্থান অপর সরকার পূরণ করে, নূতন প্রজন্ম পূর্বপ্রজন্মের স্থান দখল করে, একটি যুগের পর আরেকটি যুগ আসে, রাষ্ট্রব্যবস্থায় ধারাবাহিকতা বজায় থাকে।

২.৪.৩ মূল বক্তব্য

জীবদেহের সঙ্গে রাষ্ট্রের উপরোক্ত সাদৃশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে জৈবতত্ত্বের প্রবক্তাগণ রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে কয়েকটি সিদ্ধান্তে আসেন।

প্রথমত, রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক বৈরিমূলক নয়—ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পর-আবদ্ধ। রাষ্ট্রবিচ্ছিন্নভাবে কোন ব্যক্তির অস্তিত্ব সম্ভবপর নয়।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রের লক্ষ্যের সঙ্গে ব্যক্তির লক্ষ্যের কোথাও ভিন্নতা নেই। এ কারণে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচরণ করার অধিকার ব্যক্তির নেই।

তৃতীয়ত, অংশের তুলনায় যেমন সমগ্র প্রধান, ব্যক্তির তুলনায় রাষ্ট্রই প্রধান ও চূড়ান্ত। রাষ্ট্রের লক্ষ্য রাষ্ট্র নিজেই ; রাষ্ট্র অন্য কোনও উদ্দেশ্য পূরণের যন্ত্র বা মাধ্যম নয়।

চতুর্থত, ব্যক্তির যাবতীয় স্বাধীনতার উৎস রাষ্ট্র। রাষ্ট্রে সার্বভৌমত্বের সঙ্গে স্বাধীনতার কোনও বিরোধ নেই। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের মধ্য দিয়েই তার স্বাধীনতা ভোগ করে, ব্যক্তিজীবনের সার্থকতা খুঁজে পায়।

২.৪.৪ সমালোচনা

রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিশ্লেষণে রাষ্ট্রকে জীবদেহের সঙ্গে তুলনা করে সমরূপতা প্রতিপন্ন করা সমীচীন নয়।

বস্তুত, জৈব তত্ত্বের অন্যতম সমর্থক হার্বার্ট স্পেনসার এই ধরনের সাদৃশ্য কল্পনার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে যথেষ্ট, সতর্ক ছিলেন। এই তত্ত্বের সীমাবদ্ধতাগুলি নিম্নরূপ :

প্রথমত, জীবদেহে বিভিন্ন কোষগুলি এবং অঙ্গাপ্রত্যঙ্গাগুলি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন বা অসংলগ্ন নয়। কিন্তু সমাজ তথা রাষ্ট্রের অধিন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলি পরস্পরের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত নয়। এমনকি রাষ্ট্রে বসবাসকারী এমন অনেকেই রয়েছেন, যেমন বিদেশী, যাঁরা রাষ্ট্রের সদস্যও নন।

দ্বিতীয়ত, জীবদেহের কোনও একটি ক্ষুদ্র ও নির্দিষ্ট অংশে সমগ্র চেতনা কেন্দ্রীভূত থাকে কিন্তু রাজনৈতিক চেতনা রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানবিশেষকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। এই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের যেমন পরিবর্তন ঘটতে পারে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুরও পরিবর্তন ঘটতে পারে।

তৃতীয়ত, জীবদেহে কোনও কোষ বা অংশের কোনও স্বতন্ত্র্য অস্তিত্ব থাকে না কিন্তু কোনও ব্যক্তি এক রাষ্ট্র থেকে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে অন্য রাষ্ট্রে সদস্যপদ নিতে পারে।

চতুর্থত, জীবদেহ এবং রাষ্ট্র উভয়েই পরিবর্তনশীল হলেও জীবদেহের পরিবর্তন অনেকাংশে প্রাকৃতিক নিয়মেই ঘটে থাকে কিন্তু রাষ্ট্রের পরিবর্তন নির্ভর করে ব্যক্তির কার্যকলাপের উপর। কোনও কোনও রাষ্ট্রে দ্রুত সরকারের পরিবর্তন ঘটে। অন্যত্র সরকারের স্থিতিশীলতা বজায় থাকে।

পঞ্চমত, জীববিজ্ঞানীগণ ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের অধীন ও রাষ্ট্রের ইচ্ছা দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত বলে ঘোষণা করে এবং রাষ্ট্রকে এক অখণ্ড, ব্যক্তিনিরপেক্ষ সত্ত্বা বলে প্রচার করে চরমতন্ত্রকেই সমর্থন করে থাকে।

ষষ্ঠত, জৈব মতবাদ রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও লক্ষ্য সম্পর্কে কোনও সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা দিতে পারেনি।

২.৪.৫ মূল্যায়ন

জৈব মতবাদের উপরোক্ত সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও এই মতবাদে রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তি/ব্যক্তি সংগঠনের পারস্পরিক সহযোগিতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। রাষ্ট্র যেমন ব্যক্তিনিরপেক্ষ নয়, ব্যক্তিও সেরূপ রাষ্ট্রনিরপেক্ষ নয়। উভয়ের সহযোগিতার উপরও রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও প্রকৃতি সম্পর্কে এই তত্ত্ব কোনও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে না পারলেও এই তত্ত্ব পরবর্তীকালে দার্শনিকদের ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। ডুর্কেহ্যাইম (Durkheim)-এর কার্য কাঠামোতত্ত্বে, কার্ল মার্কস এর ভিত্তি-উপরি সৌধের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার তত্ত্বের মধ্যে জৈবতত্ত্বের ছাপ পাওয়া যায়। তাছাড়া জৈব তত্ত্ব একদিকে ব্যক্তির উপর এবং অপরদিকে সমাজের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। এর ফলে, এই তত্ত্ব একদিকে হার্বার্ট স্পেনসারের ন্যায় ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদীদের অপরদিকে হেগেলের মত সামগ্রিকতাবাদীদের দর্শনের উৎস হিসেবে কাজ করেছে।

২.৫ ভাববাদ

রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কিত তত্ত্বগুলির মধ্যে ভাববাদ বহুলপ্রচলিত তত্ত্ব। প্রাচীন গ্রীসে এই তত্ত্বটি যেমন গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়েছিল আধুনিককালের রাষ্ট্র দার্শনিকগণ যথা কান্ট, হেগেল, টি. এইচ. গ্রীণ এই তত্ত্বটি সম্পর্কে সমান আগ্রহী। রাষ্ট্রকে কোনও ভাব বা আদর্শের প্রতিরূপ এবং চরম পরিণতি হিসেবে দেখার প্রবণতা প্রাচীন গ্রীসে প্লেটো এবং অ্যারিস্টটলের মধ্যে দেখা যায়। প্লেটো রাষ্ট্রকে ন্যায়ের প্রতিরূপ হিসেবে দেখেছেন এবং আদর্শ রাষ্ট্রের রূপাঙ্কনে ন্যায়তত্ত্বকে প্রয়োগ করেছেন। অ্যারিষ্টটলের রচনায় যদিও পর্যবেক্ষণ

ও তুলনামূলক পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটেছে তথাপি সামগ্রিক বিচারে অ্যারিস্টটলও রাষ্ট্রকে ব্যক্তির সুন্দর জীবনের চরম প্রকাশ হিসেবে দেখেছেন।

ভাববাদী তত্ত্বটি বিশেষ পরিণতি লাভ করে অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকে জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট (Emanannel Kant 1724-1804) এবং হেগেল (G.W.F. Hegel 1770-1831)-এর রচনায়। কান্ট ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের পর্যবেক্ষণমূলক বস্তুবাদী দর্শনের প্রতিবাদ হিসেবে আদর্শবাদকে তুলে ধরেন। কান্টের মতে দৃশ্যময় বস্তুজগতই তার প্রকৃত স্বরূপ নয়। বাহ্যত এবং আপাতদৃষ্ট বস্তুর প্রকৃত সত্ত্বা ভিন্ন। অর্থাৎ জন লক যেখানে কাজের উৎস হিসেবে পর্যবেক্ষণকেই চিহ্নিত করেছেন কান্ট সেখানে মনন জগতের মধ্যেই প্রকৃত সত্তা বা জ্ঞানের অনুসন্ধান করেছেন। সেই বিচারে, বিদ্যমান রাষ্ট্রব্যবস্থা রাষ্ট্রের প্রকৃত স্বরূপ নয় ; আদর্শগত রূপই তার প্রকৃত স্বরূপ। কান্টের ন্যায় হেগেল-এর কাছেও রাষ্ট্র এক সাধারণ রাজনৈতিক সংগঠন নয়। রাষ্ট্র হ'ল এক নৈতিক সমগ্র বা চূড়ান্ত ও সার্বিক বিষয় যা ব্যক্তিস্বার্থ (পরিবার) ও সাধারণ স্বার্থ (civil society)-র মধ্যে সমন্বয় ঘটায়, সমগ্রের সঙ্গে ব্যক্তির সংযোগ ঘটায় এবং ব্যক্তির চরম আত্মিক উন্নতি সূচিত হয়। এককথায় যুক্তিময় ভাবসত্তার পূর্ণ প্রকাশ ঘটে রাষ্ট্রের মধ্যে। এই যুক্তিময় ভাবসত্ত্বা রাষ্ট্রের অন্তর্গত প্রতিটি ব্যক্তির যুক্তিময় ভাবসত্ত্বারই পূর্ণ প্রতিফলন। এ কারণে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিপন্থী নয় ; বরং বলা চলে ব্যক্তিস্বাধীনতার অন্যতম সহায়ক। হেগেল-এর এই রাষ্ট্রদর্শনের চূড়ান্ত পরিণতি লক্ষ্য করা যায় নীৎসে (Nietzsche), বার্নহার্ডি (Bernherdi) এবং ট্রিটশে (Treitschke)-র হাতে যাঁরা চরম ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন।

ইংলণ্ডে ভিন্নতর পরিস্থিতিতে আদর্শবাদকে তুলে ধরেন টি. এইচ. গ্রীণ (T. H. Green), ব্রাডলে (F. H. Bradley) এবং বসানকুয়েট (Basanquet) প্রমুখ তাত্ত্বিকগণ। চরম কর্তৃত্বসম্পন্ন যুক্তিময় ভাবসত্ত্বার আধারস্বরূপ হেগেলীয় রাষ্ট্রের ধারণার সঙ্গে তৎকালীন ইংলণ্ডের উপযোগিতাবাদী তথা বেন্থামীয় ভাবধারার মিশ্রণ দেখা যায় টি. এইচ. গ্রীণের রচনায়। গ্রীণের তত্ত্বে প্রতিটি ব্যক্তি আত্মসচেতন ও আত্মসন্ধানী। ব্যক্তির এই আত্মসচেতনতা এক অনন্ত আত্মচেতনার আংশিক অভিব্যক্তি। এ কারণে ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে সামগ্রিক সত্তার তথা রাষ্ট্রসত্তার কোনও বিরোধ নেই। ব্যক্তির সর্বোচ্চ নৈতিক মঙ্গল প্রকৃতপক্ষে গণমঙ্গল তথা সমাজের সকলের মঙ্গালের সঙ্গে অভিন্ন। রাষ্ট্র যেহেতু এই গণমঙ্গালের যথাযথ বাস্তবায়নে সহায়তা করে সেহেতু রাষ্ট্রের তথা গণমঙ্গালের সঙ্গে ব্যক্তিমঙ্গালের কোন বিরোধ নেই। অবশ্য, তিনি হেগেলের মত রাষ্ট্রের প্রতি ব্যক্তির আনুগত্যকে চরম ও শর্তহীন বলে মেনে নেননি। গ্রীণের কাছে ব্যক্তির দু'ধরনের বাধ্যতা রয়েছে। এক, নৈতিক বাধ্যতা (moral obligation) এবং দুই, আইনানুগ বাধ্যতা (legal obligation)। রাষ্ট্রের প্রতি ব্যক্তির যে বাধ্যতা তা আইনানুগ বাধ্যতা কিন্তু প্রতিটি ব্যক্তি নিজে অন্তর্নিহিত যুক্তি ও বিবেকের কাছে বাধ্য। নৈতিক বাধ্যতা বস্তুত গ্রীণকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচরণে অনুপ্রাণিত করে। অবশ্য, রাষ্ট্রবিরোধিতার পূর্বে ব্যক্তিকে দু'টি ব্যাপারে সুনিশ্চিত হ'তে হবে। এক, রাষ্ট্রদ্রোহী ব্যক্তিকে দেখতে হবে যে, এই বিরোধিতার ফল হবে এক নিশ্চিত সামাজিক মঙ্গাল তথা গণমঙ্গাল। সেই ব্যক্তিকে মহানাগরিকদের সঙ্গে এই গণমঙ্গাল সম্পর্কে একমত হ'তে হবে। দুই, দেখা দরকার এই বিরোধিতার ফলে যে নূতনতর পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে তা পূর্বতন অবস্থার তুলনায় কাম্য কিনা।

২.৫.১ মূল বক্তব্য

ভাববাদের মূল বক্তব্যগুলি এভাবে সূত্রায়িত করা যেতে পারে।

প্রথমত, ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের অবস্থান একরৈখিক। অর্থাৎ ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে কোনও বৈরিতা নেই। ব্যক্তি তথা সমাজবিকাশের চরম পরিণতি ঘটে রাষ্ট্রের মধ্যে। চুক্তির মাধ্যমে বা হঠাৎ করে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়নি। ক্রমবিকাশের মধ্যে দিয়েই ব্যক্তি তার সম্পূর্ণতা পায় রাষ্ট্রের মধ্যে।

দ্বিতীয়ত, মানুষ সামাজিক জীব। সমাজের বাইরে যা সমাজবিচ্ছিন্নভাবে তার কোনও অস্তিত্ব নেই। রাষ্ট্র যেহেতু সমাজেরই বিকশিত রূপ সেহেতু রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ট ; রাষ্ট্রের মধ্যেই ব্যক্তি তার জীবনের চরম সার্থকতা খুঁজে পায়।

তৃতীয়ত, ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে উদ্দেশ্যগত কোনও পার্থক্য নেই। এ কারণে ব্যক্তির স্বাধীনতা রাষ্ট্রের মধ্যেই নিহিত।

চতুর্থত, রাষ্ট্র যেহেতু এক অখণ্ড চরম সত্তা সেহেতু রাষ্ট্র কোনও লক্ষ্যসাধনের উপায় বা মাধ্যম নয়—রাষ্ট্র নিজেই নিজের লক্ষ্য।

পঞ্চমত, রাষ্ট্র কোনও স্বাভাবিক বা নৈতিক আইনের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয় ; রাষ্ট্র নৈতিকতার স্রষ্টা।

২.৫.২ সমালোচনা

রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে ভাববাদী তত্ত্বটি বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কহীন এক অসার তত্ত্ব হিসেবে সমালোচিত হয়েছে। বার্কার (Barker) মন্তব্য করেন, এই মতবাদ যে রাষ্ট্রের কল্পনা করে তা স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, কিন্তু পৃথিবীতে কখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

দ্বিতীয়ত, ল্যাস্কি (Laski), জোড (Joad) প্রমুখ তাত্ত্বিকগণ ভাববাদী তত্ত্বকে ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিপন্থী বলে মনে করেন। এই তত্ত্ব অনুযায়ী রাষ্ট্র থেকে স্বতন্ত্র্য ব্যক্তির কোনও মূল্য নেই। একমাত্র রাষ্ট্রের মধ্যে থেকেই ব্যক্তি তার অধিকারগুলি ভোগ করে। জোড এ ব্যাপারে মন্তব্য করেন, 'ব্যক্তির জন্যই রাষ্ট্রের প্রয়োজন—ব্যক্তি রাষ্ট্রের জন্য নয়'।

তৃতীয়ত, রাষ্ট্রকে এক অখণ্ড চরম সত্তা হিসেবে ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে তত্ত্বটি এক সর্বশক্তিমান রাষ্ট্রের প্রকৃতিকে তুলে ধরে। ম্যাকাইভারের মতে, এটি স্বৈরতন্ত্রের বৈধকরণের এক নূতন পন্থা। মানুষের তুলনায় মানবতাকে, রাষ্ট্রের সদস্যের তুলনায় জাতীয় জনসমাজকে (nationality) বড় মনে করা হয়। একদিকে যেমন এই তত্ত্ব রাষ্ট্রের স্বৈরাচারকে প্রশ্রয় দেয় অপরদিকে যুদ্ধবাজকে সমর্থন করে। এই তত্ত্বের মাধ্যমেই হেগেল প্রুশিয়ার স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রকে সমর্থন জানিয়েছেন।

চতুর্থত, মার্কসীয় তাত্ত্বিকগণ রাষ্ট্রকে যুক্তির চরম প্রকাশ হিসেবে না দেখে শ্রেণীশোষণ ও শাসনের প্রেক্ষাপটে বিচার করেন। হেগেলের দ্বান্দ্বিক দর্শনের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েও কার্ল মার্কস হেগেলের ভাববাদকে বর্জন করেন।

২.৫.৩ ভাববাদের সাম্প্রতিক রূপ

ভাববাদ মূলতঃ সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রের প্রকৃতিবিশ্লেষণে, ব্যক্তি-রাষ্ট্র সম্পর্ক বিশ্লেষণের তত্ত্ব। বিংশ শতকের প্রথম দিকে ইংরেজ দার্শনিকগণ, যথা—গ্রীণ, হবহাউস, বসানকোয়েট প্রমুখ উদারনৈতিক তাত্ত্বিকগণ নুতনভাবে যে ব্যাখ্যা দেন তাও মূলতঃ সার্বভৌম রাষ্ট্রকেন্দ্রিক। বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকেই সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন জাতীয় রাষ্ট্রকেন্দ্রিক ভাববাদী তত্ত্ব ক্রমশঃ আন্তর্জাতিকতাবাদের চাপে নূতন রূপ পরিগ্রহ করে। ব্যক্তি-সম্পর্ককে শুধুমাত্র জাতীয় রাষ্ট্রের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে বিশ্বজনীনভাবে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সংহতির প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ শুরু হয়। উদারনৈতিক তাত্ত্বিকগণ জাতীয় রাষ্ট্রের প্রকৃতিবিশ্লেষণে নিজেদের আবদ্ধ রাখলেও বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতা বিশ্ববাজার, বিশ্বশান্তি প্রভৃতির উপর ক্রমশঃ গুরুত্ব আরোপ করেন। অপরদিকে, আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার, রাজনীতিবিশ্লেষণকে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের পর্যায়ে উন্নীতকরণ, মূল্যনিরপেক্ষ বিশ্লেষণের প্রবণতাও বাড়তে থাকে। জাতীয় রাজনীতির বিশ্লেষণে আদর্শবাদী ভাবধারা ক্রমশঃ হ্রাস পেলেও আন্তর্জাতিক বিশ্লেষণে আদর্শবাদ স্থান করে নেয়।

বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা, সামরিক খাতে ব্যয় বৃদ্ধি, সমরায়োজন একদিকে যেমন বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘাতের সুযোগ ঘটায় অপরদিকে আন্তর্জাতিক শান্তিস্থাপনের এক পরিবেশ সৃষ্টি করে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলিরও উদ্ভব ঘটতে থাকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই গড়ে ওঠে জাতিসংঘ (League of Nations)। বিশ্বযুদ্ধকে আগ্রাসী জাতীয়তাবাদের পুরানো রাজনীতি বলে আখ্যায়িত করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতায় সন্ত্রস্ত রাষ্ট্রগুলি গড়ে তোলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nations)। বিংশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে আন্তর্জাতিকতার প্রেক্ষাপটে জাতীয় রাষ্ট্রের প্রকৃতিবিশ্লেষণে আদর্শবাদ নূতনভাবে আলোচিত হ'তে থাকে। ১৯৭০-এর দশকে মার্কিন রাষ্ট্রপতি কার্টার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে নৈতিকতার বিষয়টির উপর গুরুত্ব দেন। রাশিয়ায় ১৯৮০-র দশকে মিখাইল গর্বাচভ কমিউনিস্টদুনিয়ার পরিবর্তে বিশ্বসহযোগিতা ও যৌথ নিরাপত্তার উপর প্রতিষ্ঠিত এক বিশ্বপরিবার গঠনের কথা বলেন। অস্ট্রেলিয়ার কূটনীতিবিদ জন বার্টন (John Burton) এই বিশ্বসমাজের প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রের প্রকৃতির নবমূল্যায়ন করেন। তিনি এমন এক রাষ্ট্রের কথা বলেন যেখানে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হবে—(১) বিশ্বশান্তি স্থাপন ; (২) বিশ্বসহযোগিতা ; (৩) মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ; (৪) বিশ্বপরিবেশ সংরক্ষণ ; (৫) যৌথ নিরাপত্তা ; (৬) সন্ত্রাসবাদ দমনে প্রতিটি দেশের সহযোগিতা এবং (৭) আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার। এই নয়া ভাববাদে জাতীয় রাজনীতির বিশ্লেষণে মূল্যবোধের বিষয়টি কাম্য রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। একদিকে বৃহৎ শক্তিগুলির অনৈতিক কার্যকলাপকে সমালোচনা ও অপরদিকে সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

২.৫.৪ মূল্যায়ন

ভাববাদকে বাস্তববিবর্জিত এক অসারতত্ত্ব হিসেবে সমালোচনা করা হলেও তত্ত্বটি তৎকালীন সমাজের প্রেক্ষাপটেই সৃষ্ট। দীর্ঘকালব্যাপী পেলোপনেসীয় যুদ্ধে গ্রীস যখন বিধ্বস্ত, এথেন্স-এর গৌরব যুদ্ধোন্মত্ত স্পার্টার কাছে ম্লান তখন একজন এথেন্সবাদী হিসেবে কিভাবে এথেন্সের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করা যায়, সমাজে শৃঙ্খলা আনয়ন করা যায় তারই প্রেক্ষিতে প্লেটো আদর্শরাষ্ট্রের রূপাঙ্কন করেন ন্যায়তত্ত্বের যুক্তিজাল বিস্তারের মাধ্যমে।

একইভাবে বলা যায়, কান্ট এবং হেগেলের তত্ত্ব তৎকালীন জার্মানীর বাস্তব পরিস্থিতি থেকেই উদ্ভূত। কিভাবে জার্মানীকে এক শক্তিশালী পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে পরিণত করা যায় তাই ছিল জার্মান দার্শনিকদের লক্ষ্য। তাছাড়া প্লেটো, অ্যারিস্টটল, রুশো, কান্ট, হেগেল প্রমুখ ভাববাদী তাত্ত্বিকগণ ব্যক্তির সুন্দর জীবনকে প্রধান বলে মনে করেন। রাষ্ট্র এই সুন্দর জীবনেরই চরম প্রতিফলন। ব্যক্তিস্বার্থ যে গোষ্ঠীস্বার্থের পরিপন্থী নয়—ব্যক্তি ও গোষ্ঠী উভয়েই পরস্পরের পরিপূরক—এই বক্তব্য সমাজের শৃঙ্খলা তথা সংহতিকেই তুলে ধরে। বিংশ শতকের প্রথম দিকে রাজনীতিচর্চাকে বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত করার নামে যে মূল্য নিরপেক্ষ রাজনীতিচর্চা শুরু হয়েছিল তা এই শতকেরই শেষের দিকে ক্রমশঃ পরিত্যক্ত হতে থাকে। রাজনীতিচর্চায় ভাববাদের নবমূল্যায়ন শুরু হয়।

২.৬ অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

(১) রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে চুক্তিবাদী তত্ত্বটি সমালোচনাসহ ব্যাখ্যা করুন।

(২) রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে বিবর্তনবাদী তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করুন।

(৩) রাষ্ট্রের উদ্ভবে ধর্ম ক্ষমতার ভূমিকার মূল্যায়ন করুন।

(৪) রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে জৈববাদীদের মূল বক্তব্যগুলি কী কী? এই মতবাদের যৌক্তিকতা বিচার করুন।

(৫) রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে ভাববাদী তত্ত্বটি বিশ্লেষণ করুন। এই তত্ত্বের সীমাবদ্ধতাগুলি উল্লেখ করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

(১) চুক্তিমতবাদের সাম্প্রতিক রূপটি উল্লেখ করুন।

(২) ভাববাদী তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করুন।

(৩) রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে টমাস হবস-এর বক্তব্য উল্লেখ করুন।

(৪) নয়া ভাববাদের বক্তব্যটি উল্লেখ করুন।

(৫) রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে জৈববাদের দু'টি সীমাবদ্ধতার উল্লেখ করুন।

২.৭ গ্রন্থপঞ্জী

(১) C.B. Macpherson : The Political Theory of Possessive Individualism Hobbes to Locke. Oxford (1962)

(২) O.P. Gauba : An Introduction to Political Theory. Macmillan India Ltd., New Delhi. (1981/1995)

(৩) Roy, Amal and Bhattacharya, Mohit : Political Theory, World Press (1968).

(৪) Sabine, G.H. : A History of Political Theory, Holt Pinchart and Winston Inc. (1964) বঙ্গানুবাদ—হিমাংশু ঘোষ—রাজনৈতিক তত্ত্বের ইতিহাস। বাঁকুড়া ইনস্টিটিউট, বাঁকুড়া। (১৯৮৮)।

(৫) সত্যসাধন চক্রবর্তী ও নির্মলকান্তি ঘোষ : রাষ্ট্রবিজ্ঞান। শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানি, কলকাতা। (১৯৯৭)।

একক—৩ ❐ রাষ্ট্রের কার্যাবলী সংক্রান্ত বিভিন্ন তত্ত্ব

গঠন

৩.০ উদ্দেশ্য

৩.১ প্রস্তাবনা

৩.২ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ

- ৩.২.১ ধ্রুপদী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ
- ৩.২.২ ধ্রুপদী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মূল বক্তব্য
- ৩.২.৩ ব্যাক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সাম্প্রতিক রূপ
- ৩.২.৪ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সমালোচনা
- ৩.২.৫ মূল্যায়ন

৩.৩ সমাজতন্ত্রবাদ

- ৩.৩.১ সমাজতন্ত্র ধারণাটির ক্রমবিকাশ
- ৩.৩.২ সমাজতন্ত্রের সংজ্ঞা
- ৩.৩.৩ সমাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য
- ৩.৩.৪ সমাজতন্ত্রের বিভিন্ন রূপ
  - (ক) মার্কসীয় সমাজতন্ত্র
  - (খ) রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র
  - (গ) বাজারধর্মী সমাজতন্ত্রী
  - (ঘ) সামাজিক/গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র
- ৩.৩.৫ মূল্যায়ন

৩.৪ জনকল্যাণকর রাষ্ট্রতত্ত্ব

- ৩.৪.১ জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য
- ৩.৪.২ জনকল্যাণকর রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্ভবের কারণ
- ৩.৪.৩ জনকল্যাণকর ধারণার বিকাশ
- ৩.৪.৪ জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের সমালোচনা

(ক) জনকল্যাণকর রাষ্ট্র—পরিবর্তিত অর্থনীতি
(খ) জনকল্যাণকর রাষ্ট্র—নয়া দক্ষিণপন্থীদের সমালোচনা
(গ) জনকল্যাণকর রাষ্ট্র ও জনপছন্দ তত্ত্ব
(ঘ) জনকল্যাণকর রাষ্ট্র—মার্কসবাদী সমালোচনা
(ঙ) নারীবাদীদের বিশ্লেষণে জনকল্যাণকর রাষ্ট্র
(চ) জনকল্যাণকর রাষ্ট্র ও বর্ণবিদ্বেষবিরোধী সমালোচনা
(ছ) জনকল্যাণকর রাষ্ট্র ও সবুজ আন্দোলন
৩.৪.৫ মূল্যায়ন
৩.৫ অনুশীলনী
৩.৬ গ্রন্থপঞ্জী

৩.০ উদ্দেশ্য

রাষ্ট্রের কার্যে পরিধি সম্পর্কে প্রচলিত বিভিন্ন কয়েকটি তত্ত্বের ব্যাখ্যা করাই এই এককের (একক 'গ') উদ্দেশ্য। আমাদের ব্যক্তিগত ও সমাজজীবনে রাষ্ট্রের প্রয়োজন আদৌ আছে কিনা, যদি বা থাকে তাহলে রাষ্ট্র কী ধরনের কাজ করবে ইত্যাদি বিষয়গুলি আমরা এখানে আলোচনা করব। আমাদের আলোচনার মধ্যে রয়েছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী তত্ত্ব, সমাজতান্ত্রিক মতবাদ ও জনকল্যাণকর রাষ্ট্রতত্ত্ব।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ সম্পর্কে অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকের বক্তব্যটি বিংশ শতকের সত্তরের দশকে নতুন করে ফিরে এসেছে। আমাদের আলোচনায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের এই দুই ধারাই আলোচিত হবে। সমাজতন্ত্র সম্পর্কে এত বেশী মত রয়েছে যে, সেগুলিকে একটি তত্ত্বের মধ্যে রাখা যায় কিনা সে প্রশ্ন উঠতে পারে। তাই সমাজতন্ত্রের কয়েকটি মূল বক্তব্য এখানে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী ইউরোপে এবং সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের কর্মসূচী গ্রহণ ও রূপায়ণের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। জনকল্যাণকর রাষ্ট্র কাকে বলে, এ ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্ভবের কারণ, মূল বক্তব্য ইত্যাদি যেমন আলোচিত হবে, জনকল্যাণকর রাষ্ট্র সম্পর্কে সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন মহলে সমালোচনার যে ঝড় উঠেছে তাও বিবেচিত হবে। এই অধ্যায়টি পঠন-পাঠনের পরে আমরা জানতে পারব :

- রাষ্ট্রের কার্যাবলীর সম্পর্কে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের সাবেকি বক্তব্য।
- ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের আধুনিক রূপ।
- ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সীমাবদ্ধতা।
- সমাজতন্ত্র কাকে বলে?
- সমাজতন্ত্রের বিভিন্ন রূপ যেমন মার্কসীয় সমাজতন্ত্র, রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র বাজারধর্মী সমাজতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র।

- জনকল্যাণকর রাষ্ট্র কাকে বলে?
- জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের উদ্ভবের কারণ।
- জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও ধরন।
- জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের সীমাবদ্ধতা।

৩.১ প্রস্তাবনা

ব্যক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক, রাষ্ট্রের কাজের পরিধি প্রভৃতি বিষয়ে রাজনীতিবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল (Aristotle, 384-322 BC) রাষ্ট্রকে ব্যক্তিজীবনের পক্ষে অপরিহার্য বলে মনে করেন। মানুষ প্রকৃতিগতভাবে রাজনৈতিক জীব ; রাষ্ট্রবিহীন মানুষ হয় অতিমানুষ নতুবা অমানুষ—হয় দেবতা নতুবা পশু—এই ছিল অ্যারিস্টটলের মত। টমাস হবস (Thomas Hobbes, 1588-1679) রাষ্ট্রকে ব্যক্তির সমাজজীবনযাপনের পক্ষে অপরিহার্য বলে মনে করেন। অপরদিকে টমাস পেইন (Thomas Paine, 1737-1809) বেন্থাম (Bentham, 1748-1832) প্রমুখ দার্শনিকগণ মনে করেন, রাষ্ট্র যত কম কাজ করে ততই ব্যক্তির পক্ষে মঙ্গল। কারণ, রাষ্ট্রের কাজের সীমানার সম্প্রসারণ মানেই ব্যক্তিস্বাধীনতার সংকোচন। রাষ্ট্র একটি অশুভ কিন্তু প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান। একমাত্র নৈরাজ্যবাদী তাত্ত্বিকগণ ছাড়া সকলেই রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে কম-বেশী স্বীকার করেছেন। এমনকি মার্কসবাদী তাত্ত্বিকগণ বিশেষত ভি. আই. লেনিন (V. I. Lenin, 1870-1924) যিনি রাষ্ট্রকে গুঁড়িয়ে দেবার ডাক দেন, সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থায় উত্তরণে সর্বহারার একনায়কত্বে রাষ্ট্রের সাময়িক উপস্থিতিকে প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন। রাষ্ট্রের কার্যাবলী সম্পর্কিত তত্ত্বগুলিকে মূলত তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা—

(১) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী তত্ত্ব
(২) সমাজতন্ত্রবাদী তত্ত্ব
(৩) জনকল্যাণকারী রাষ্ট্রতন্ত্র

৩.২ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ শব্দটির মধ্যেই তত্ত্বটির মূল বক্তব্য পরিস্ফুট। এখানে ব্যক্তিই প্রধান। ব্যক্তির প্রয়োজনেই সমাজ ও রাষ্ট্র। সুতরাং ব্যক্তির চলার পথে সমাজ/রাষ্ট্র কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে না। রাষ্ট্র যত কম কাজ করে ততই ব্যক্তির পক্ষে মঙ্গল। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীর কাছে ব্যক্তিত্ব, স্বাধীনতা ও উদ্যোগই প্রধান বিবেচ্য বিষয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের দু'টি পর্যায় লক্ষ্য করা যায়। প্রথম পর্যায়ে অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকের ইংলণ্ডে জন লক, টক পেইন, বেন্থাম, জেমস মিল এবং আংশিকভাবে জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill, 1806-1874)-এর রচনায় এবং ফ্রান্সের ফিজিওক্রাট নামে পরিচিত অর্থনীতিবিদগোষ্ঠী, ইংলণ্ডে অ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith, 1723-1790) প্রমুখ অর্থনীতিবিদদের রচনায় বিধৃত। দ্বিতীয় পর্যায়টি সাম্প্রতিককালে বা বিংশ শতকের সত্তর-এর দশকে রবার্ট নজিক (Robert Nozick, 1938-), রথবার্ট (Rothbert), ওলসন (Olson, 1982) প্রমুখের রচনায় লক্ষ্য করা যায়।

৩.২.১ ধ্রুপদী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ

পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের উদ্ভবের পটভূমি। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ভাঙ্গন, পুঁজিপতিশ্রেণীর উদ্ভব, ধর্মীয় প্রাধান্যের পরিবর্তে চুক্তির প্রাধান্য ব্যক্তি-প্রাধান্যের যুগের সূচনা করে। রাজনীতি ও ধর্মের সম্পর্কের ক্ষেত্রে মার্টিন লুথার (Martin Luther, 1483-1546) ও শিল্পসাহিত্যে মিচেল এ্যাঞ্জেলো (Michel Angelo, 1475-1564), লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি (Leonardo da-Vinchi, 1452-1519) প্রমুখ নবজাগরণের পথিকৃৎগণ ব্যক্তির পুনর্জাগরণে সাহায্য করেন। লুথার বা ক্যালভিন (Calvin, 1509-1564)-এর মতে প্রতিটি ব্যক্তিই যেহেতু যুক্তির অধিকারী সেহেতু প্রতিটি ব্যক্তি ধর্মীয় ক্ষেত্রে নিজ মত দ্বারাই পরিচালিত হবে। ম্যাকিয়াভেলি (Machiavelli, 1469-1527) ব্যক্তির যে চরিত্রচিত্রণ করেন তা একান্তভাবেই স্বার্থবোধযুক্ত আত্মকেন্দ্রিক। টমাস হবস-এর মানুষ নবজাগ্রত, বিকাশোন্মুখ পুঁজিপতিশ্রেণীরই প্রতিচ্ছবি। চরম রাজতন্ত্রকে সমর্থন করলেও হবস-এর চুক্তিতত্ত্ব ব্যক্তির অধিগ্রাহী (Possessive-যাকে ম্যাকফারসান Possessive individualism বলে অভিহিত করেন) চরিত্রকে তুলে ধরে। জন লক (John Locke, 1632-1704)-এর তত্ত্বে ব্যক্তির অধিগ্রাহী ভূমিকা আরো স্পষ্ট। লকের মতে রাষ্ট্রের উদ্ভব শুধুমাত্র ব্যক্তির সম্পত্তি, স্বাধীনতা ও জীবনরক্ষার জন্য। বস্তুত, জন লকের তত্ত্বে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ধারাটি প্রথম সুশৃঙ্খলভাবে উপস্থাপিত হয়।

জীববিজ্ঞানী ডারউইন (Charles Darwin, 1809-1882)-এর যোগ্যতমের উদ্‌বর্তন (Survival of the fittest) তত্ত্বে প্রভাবিত হার্বার্ট স্পেনসার (Herbert Spencer, 1820-1903) মন্তব্য করেন, রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপকে সীমাবদ্ধ করা শুধু প্রয়োজনীয়ই নয় জীববিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে যুক্তিসংগতও। এই কারণে, রাষ্ট্র কর্তৃক কোনরকম সাহায্য, অনুদান প্রভৃতি ব্যবস্থারও তিনি ঘোর বিরোধী। 'Man versus State' গ্রন্থটির নামকরণই স্পেনসারের মনোভাবকে তুলে ধরে। বেন্থাম, জেমস মিল প্রমুখ উপযোগিতাবাদী তাত্ত্বিকগণ ব্যক্তির সুখলিপ্সাকেই প্রধানতম লক্ষ্য বলে মনে করেন। রাষ্ট্রের কাজ হবে ব্যক্তির এই সুখলিপ্সাকে বাধা না দেওয়া। জন স্টুয়ার্ট মিল-এর রচনায় ধ্রুপদী ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের ছাপ যেমন স্পষ্ট অপরদিকে আধুনিক উদারনীতিবাদের যা জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রের কথা বলে, সুরও শোনা যায়। জন স্টুয়ার্ট মিল ব্যক্তির আচরণকে একান্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক (self-regarding) এবং যা অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত (other-regarding)-এই দুই ভাগে ভাগ করেন এবং মনে করেন প্রথম ক্ষেত্রে কোনওরকম নিয়ন্ত্রণই কাম্য নয়।

অর্থনীতির ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ধ্রুপদী ধারাটি লক্ষ্য করা যায় অষ্টাদশ শতকের ফরাসী অর্থনীতিবিদ (যাদের নেতৃত্বে ছিলেন এফ. কোয়েসনে (F. Quesnay, 1694-1774) এবং যাঁরা ফিজিওক্রাট নামে পরিচিত) গোষ্ঠীর লেখায়। ফিজিওক্র্যাসি (Physiocracy) শব্দটির অর্থ—Rule of Nature। ফিজিওক্রাটদের বক্তব্য হ'ল অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কোন হস্তক্ষেপ করবে না। প্রাকৃতিক শৃঙ্খলাকেই রক্ষা করবে এবং সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করবে। মুক্ত-বাণিজ্য তথা Laisser faire অর্থনীতিই প্রধান। Laisser faire ধারণাটি সম্ভবত উদ্ভূত হয়েছে ফ্রান্সে চতুর্দশ লুই-এর আমলে। ফরাসী সম্রাট চতুর্দশ লুই-এর অর্থমন্ত্রী কোলবার্ট (Colbert) যখন 'কী ধরনের অর্থনৈতিক নীতি অনুসরণ করা উচিত' বলে প্রশ্ন তোলেন তখন এক বণিক উত্তর দেন—Laissez faire-Laisser passer. কৃষিক্ষেত্রেই সরকারের রাজস্ব সংগ্রহের একমাত্র উৎস হওয়া

উচিত এবং শিল্পবাণিজ্যকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত রাখা উচিত। ইংলণ্ডে অ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith, 1723-1790), ডেভিড রিকার্ডো (David Ricardo, 1772-1823), রবার্ট ম্যালথাস (Robert Malthus, 1766-1834) প্রমুখ অর্থনীতিবিদগণ *Laissez faire* তত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত হয়ে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণমুক্ত ব্যক্তি-পুঁজির বিকাশকেই সমর্থন করেন। এই সমস্ত তাত্ত্বিকদের চাহিদা ও যোগানের কঠোর নিয়ম (Iron Law of Demand and Supply), মজুরীর কঠোর নিয়ম প্রভৃতি মাধ্যমে মুক্তবাজারী বা খোলাঅর্থনীতির তত্ত্বই প্রচারিত হয়েছে।

৩.২.২ ধ্রুপদী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মূল বক্তব্য

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ধ্রুপদী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মূল বক্তব্য সংক্ষেপে উল্লেখ করতে পারি। ধ্রুপদী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী তত্ত্বে রাষ্ট্রের কার্যের সম্প্রসারণকে ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিপন্থী বলে মনে করা হয়। ব্যক্তি কতকগুলি অধিকার নিয়েই জন্মায়। রাষ্ট্র সেই অধিকারগুলির রক্ষকমাত্র ; স্রষ্টা নয়।

দ্বিতীয়ত, ব্যক্তির অর্থনৈতিক বিকাশে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ কাম্য নয়, কারণ তা ব্যক্তির উদ্যোগকেই ব্যাহত করে। তৃতীয়ত রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র যত কম হবে ততই মঙ্গল। জন লক-এর মতানুযায়ী রাষ্ট্র শুধুমাত্র নৈশপ্রহরীর কাজ করবে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীগণ এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের তিনটি কাজের উল্লেখ করেন—(১) সমাজে শৃঙ্খলা রক্ষা করা—কোনও ব্যক্তির অধিকার অপর ব্যক্তির অধিকারকে যেন খর্ব না করে তা দেখা ; (২) ব্যক্তিদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিগুলি প্রযুক্ত হচ্ছে কিনা তা দেখা এবং (৩) বাহ্যিক আক্রমণ থেকে নিরাপত্তাবিধান করা। রাষ্ট্রের পক্ষে পুলিশব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থা ও সামরিক বাহিনী থাকাই যথেষ্ট। অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক এবং অন্যান্য দায়দায়িত্বগুলি ব্যক্তির এবং এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়।

৩.২.৩ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সাম্প্রতিক রূপ

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সাম্প্রতিক ধারাটি লক্ষ্য করা যায় ১৯৭০-এর দশকে ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইটালি ও আমেরিকায় নব্য দক্ষিণপন্থীদের (New Rights), বিশেষত নব্য উদারনীতিবাদীদের বক্তব্যে। এই নব্য দক্ষিণপন্থীদের মতে দু'টি ধারা রয়েছে একটি নব্য উদারনীতিবাদী ধারা, অপরটি নব্য, রক্ষণশীল ধারা—অর্থনীতির ক্ষেত্রে হায়েক (Friedrich Hayek, 1899-1992) ও ফ্রিডম্যান (Milton Friedman, 1912) এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে ওলসন রথবার্ট (Rothbart) ও রবার্ট নজিক-এর রচনায়।

১৯৬০ ও ৭০-এর দশকে যে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয় তার অন্যতম কারণ হিসেবে পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থা ও জনকল্যাণ রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক চাপকেই দায়ী করা হয়। 'যা কিছু সরকারী তাই খারাপ', উদ্যোগহীনতা, সঞ্চয়ের তুলনায় ব্যায়াধিক্য, দলীয় নিয়ন্ত্রণ, আমলাতান্ত্রিক কাঠামো, নির্বাচনী রাজনীতি, কর্মে অদক্ষতা ও ফাঁকি—সবই সরকারী ব্যবস্থার নমুনা। অপরদিকে বেসরকারী ব্যবস্থায় বাজারই প্রধান বিবেচিত হওয়ায় ব্যক্তিগত উদ্যোগ, উৎপাদন বৃদ্ধি, উৎপাদনের গুণগত উৎকর্ষলাভ—সম্ভবপর হয়। এই সমস্ত তাত্ত্বিকগণ অর্থনীতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপকে প্রতিযোগিতা, দক্ষতা ও সৃজনশীলতা হ্রাসকারী 'মৃত হস্ত' (dead hand) বলে উল্লেখ করেন এবং মনে করেন রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ দু'টি ক্ষেত্রেই সীমিত থাকা উচিত। (১) বিনিময়-মাধ্যমের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা যাতে মুদ্রাস্ফীতি না ঘটে ; (২) মূল্য নির্ধারণ, একচেটিয়া অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ—ইত্যাদির মাধ্যমে প্রতিযোগিতার পরিবেশ তৈরী করা। এই সমস্ত তাত্ত্বিকদের কাছে তাইওয়ান, মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুর হ'ল আদর্শ

ব্যবস্থা। শুধুমাত্র তত্ত্বক্ষেত্রেই নয়, বাস্তবেও সত্তরের দশকে ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে জনকল্যাণকর কর্মসূচি ছাঁটাই করে সরকারী ব্যয় হ্রাস করা হয়। ইউরোপের যে সমস্ত দেশগুলিতে মিশ্র অর্থনীতিব্যবস্থা চালু ছিল সেখানে সরকারী উদ্যোগের পরিবর্তে বেসরকারী উদ্যোগকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। ব্রিটেনে থ্যাচার ও মেজর সরকার, ফ্রান্সের চিরাক সরকার গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় শিল্পগুলিকে যথা—টেলিকমিউনিকেশন, জল, গ্যাস, বিদ্যুৎ প্রভৃতি বিষয়গুলিকে বেসরকারীকরণ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মিশ্র অর্থব্যবস্থা গৃহীত না হ'লেও ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে শিল্পে যে সরকারী নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা চালু করা হয় তা এ সময় হ্রাস করা হয়। এ ব্যাপারে রেগন প্রশাসনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

রাজনীতির ক্ষেত্রে এই নব্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ধারাটি তুলে ধরেন রবার্ট নজিক, রথবার্ট এবং ওলসন। এই সমস্ত তাত্ত্বিকগণ গণতান্ত্রিক রাজনীতির চাপ সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন এবং মনে করেন গণতন্ত্রে বিভিন্ন গোষ্ঠীর উপস্থিতি, গোষ্ঠী-রাজনীতির নির্বাচনী চাপ যে কোনও রাজনৈতিক ব্যবস্থাকেই পঙ্গু করতে পারে। গণতন্ত্রের এই চাপ চাহিদাভিত্তিক অথবা যোগানভিত্তিক হ'তে পারে। চাহিদাভিত্তিক চাপ সমাজের মধ্য থেকেই বিশেষত নির্বাচনী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত হয়। নির্বাচনী প্রতিযোগিতায় রাজনীতিবিদগণ একে অপরকে অতিক্রম করে নির্বাচকমণ্ডলীকে প্রমুক্ত করার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রতিশ্রুতি, ব্যয়বহুল কর্মসূচীর কথা বলে। অথচ, এই প্রতিশ্রুতি পূরণে অতিরিক্ত অর্থ সঞ্চয়ের জন্য যে অতিরিক্ত করের বোঝা, মুদ্রাস্ফীতি, বিনিয়োগের অব্যবস্থা, অর্থনীতির উপর দীর্ঘমেয়াদি ক্ষয়ক্ষতির সৃষ্টি করে, সে বিষয়টি আদৌ গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয় না। সামুয়েল ব্রিটন (Samuel Britton, 1977) বিষয়টিকে গণতন্ত্রের অর্থনৈতিক ফলাফল বলে অভিহিত করেন। ব্রিটেনের মতে, গণতন্ত্রের এই লাগামহীন প্রকৃতির অর্থনৈতিক ফলাফল হ'ল মুদ্রাস্ফীতি, জাতীয় ঋণ, করের বোঝা এবং রাজনৈতিক ফলাফল হ'ল রাষ্ট্রীয় পরিধির সম্প্রসারণ যা ব্যক্তির অধিকার, উদ্যোগ ও বিকাশকে ব্যাহত করে।

যোগানভিত্তিক চাপ হ'ল রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীন চাপ যা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি এবং রাষ্ট্রকর্মচারীদের কাছে থেকে উদ্ভূত হয়। নব্য দক্ষিণপন্থীদের মতে বিংশ শতকে যে রাষ্ট্রীয় প্রাধান্য দেখা যায় তা অর্থনৈতিক বা সামাজিক নিরাপত্তার জন্য গণচাপ (popular pressure) বা শ্রেণীসংঘাত উপশমে পুঁজিবাদকে স্থায়িত্বদানের জন্য চাপ মাত্র নয়—রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ গতিরই ফলশ্রুতি। উইলিয়ম নিসকনেন (William Niskanen, 1971) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজেট তৈরীর বিষয়টি বিশ্লেষণ করে দেখান যে, সরকারী বাজেট মূলত বিভিন্ন সংস্থার উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের দ্বারাই তৈরী হয় এবং এই উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণ জানেন কিভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের চিন্তাভাবনাকে একটা কাঠামোয় দাঁড় করানো যায়। স্বাভাবিকভাবেই, সরকারী কর্মচারিগণ চাইবে রাষ্ট্রের ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ। রাষ্ট্রের ক্ষমতাবৃদ্ধি আসলে তাদেরই ক্ষমতাবৃদ্ধি, বেতনবৃদ্ধি, চাকুরির নিরাপত্তা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাবৃদ্ধি।

অর্থনীতির ক্ষেত্রের মতো রাজনীতির ক্ষেত্রেও কম ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রের তত্ত্ব প্রচার করেন রবার্ট নজিক, রথবার্ট প্রমুখ তাত্ত্বিকগণ। রাষ্ট্রকে গুটিয়ে ফেলার (rolling back the state) তত্ত্ব ঊনবিংশ শতকের laissez faire তত্ত্বেরই প্রতিরূপ। Anarchy,ssss State and Utopia (1974) গ্রন্থে রবার্ট নজিক ব্যক্তির সম্পত্তির অধিকারকে জন লকের ন্যায় চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণের পক্ষে মতপ্রকাশ করেন। এক্ষেত্রে, রবার্ট নজিকের মতে, দু'টি বিষয় দেখা প্রয়োজন এবং তাহল সম্পত্তি প্রাথমিক পর্বে সঠিকভাবে অর্জিত হয়েছে কিনা এবং এক

ব্যক্তির কাছ থেকে অপর ব্যক্তির কাছে তা সঠিকভাবে হস্তান্তরিত হয়েছে কিনা। বলাবাহুল্য জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের প্রবক্তা জন রলস-এর তত্ত্বের জবাবেই নজিকের এই স্বল্পক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রের ধারণার বিস্তার। জনকল্যাণকর কর্মসূচিগ্রহণ, সম্পদের পুনর্বণ্টন প্রভৃতির পরিবর্তে রাষ্ট্রের ন্যূনতম কার্যসম্পাদন, সর্বাপেক্ষা কম করবোঝা প্রভৃতি রবার্ট নজিক সুপারিশ করেন। রথবার্ট-এর মতে, রাষ্ট্র কর্তৃক শৃঙ্খলারক্ষা, নিরাপত্তাবিধান করা, চুক্তিগুলি রক্ষা করার দায়িত্ব সম্পাদনেরও কোনও প্রয়োজন নেই। রাষ্ট্রের এই কাজগুলিও বেসরকারী সংস্থাগুলির উপর অর্পণ করা উচিত। নিরাপত্তাবিধান ও শৃঙ্খলারক্ষার দায়িত্ব যদি বেসরকারী সংস্থাগুলির উপর অর্পণ করা হয় তাহলে বেসরকারী সংস্থাগুলি পরস্পর মুনাফালাভের প্রতিযোগিতায় আরও বেশী কার্যকরী হবে এবং জনগণও সস্তায় দায়িত্বপূর্ণ ও দক্ষ সেবা পাবে। একইভাবে বলা যায়, রাষ্ট্রীয় আদালতগুলির পরিবর্তে যদি বেসরকারী আদালত ব্যবস্থা থাকে, তাহলে এই আদালতগুলি ন্যায়বিচারের সুনামের তাগিদে ভালোভাবে এবং দ্রুত বিচারকার্য সম্পাদন করবে। এভাবে রাষ্ট্রের কাজকে যত ন্যূনতম স্তরে নিয়ে আসা যায় এবং ব্যক্তিস্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করা যায় তার সপক্ষে এই সমস্ত তাত্ত্বিকগণ বক্তব্য রাখেন। শুধুমাত্র তত্ত্বগত ক্ষেত্রেই নয় ; ব্রিটেনে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কিছু রাজ্যে ইতিমধ্যেই বেসরকারী নিরাপত্তাব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এমনকি, বেসরকারী সালিশীব্যবস্থাও পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়েছে।

সি. ই. এম. জোড (C. E. M. Joad) আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রবক্তা হিসেবে এই শতকেরই গোড়ার দিকে গোষ্ঠীস্বাতন্ত্রবাদের প্রবক্তাদের বিশেষ করে নরম্যান এ্যাঞ্জেল (Norman Angell), গ্রাহাম ওয়ালাস (Graham Walls) এবং হিলারি বেলক (Hilaire Belloc)-এর নাম উল্লেখ করেন। কারণ এই তাত্ত্বিকগণ মনে করেন, একমাত্র গোষ্ঠীভিত্তিক গণতন্ত্রে দলব্যবস্থা ও সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বৈরাচারকে নিয়ন্ত্রণ করে ব্যক্তিস্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করা যায়। কিন্তু গোষ্ঠীও যে রাষ্ট্রের ন্যায় একইভাবে ব্যক্তিস্বাধীনতাকে খর্ব করতে পারে সে সম্পর্কে জোড সচেতন ছিলেন না। জোড কথিত উপরোক্ত তাত্ত্বিকদের আদৌ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী বলা যায় কিনা সে সম্পর্কে তাই প্রশ্ন উঠতে পারে। নয়া দক্ষিণপন্থী তাত্ত্বিকগণ রাষ্ট্রের ন্যায় গোষ্ঠীরাজনীতিকে ও ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিপন্থী বলে মনে করেন। ওলসন তাঁর The Logic of Collective Action : Public goods and the theory of groups (1968) গ্রন্থে গোষ্ঠীর সঙ্গে সরকারী ব্যায়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বিষয়টি তুলে ধরেন। ওলসন-এর মতে জনগণ স্বার্থগোষ্ঠীতে যোগদান করে সর্বজনীন দ্রব্য (Public goods) অর্জনের জন্য। সর্বজনীন দ্রব্য বলতে বুঝিয়েছেন সেই সমস্ত দ্রব্য যা বিনা প্রতিদানেই পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, বেতনবৃদ্ধির বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। কোনও কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকসংগঠনের সদস্য না হয়েও, বেতনবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে আহূত ধর্মঘটে যোগ না দিয়েও কোনও ব্যক্তির বেতনবৃদ্ধি ঘটতে পারে ধর্মঘটে যোগদানকারী অন্যান্য ব্যক্তিদের বেতনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে। এক্ষেত্রে গোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্যদের ন্যায় কোনও ঝুঁকি না নিয়েই ব্যক্তির পক্ষে 'বিনা টিকিটের যাত্রী' (Free rider) হওয়ার সুযোগ থেকে যায়। গণতন্ত্রে এমনকি সামাজিক গোষ্ঠীগুলিতেও যেখানে সদস্যসংখ্যা বেশী সেখানে এই বিনা টিকিটে যাত্রীর সংখ্যাও বেশী। The Rise and Decline of Nations (1982) গ্রন্থে ওলসনের মতে, গোষ্ঠীরাজনীতি বিশেষ করে শ্রমিকসংগঠনগুলি, বাণিজ্যিক গোষ্ঠী এবং বৃত্তিগোষ্ঠীগুলির সংকীর্ণ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী একটা দেশের সমৃদ্ধির পথে বাধা হয়ে আর্থিক বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। ১৯৮০-র দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি রোনাল্ড রেগন এবং ব্রিটেনে মার্গারেট থ্যাচারকে এই গোষ্ঠীরাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে হয়।

৩.২.৪ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সমালোচনা

ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে বিশেষত পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে রাষ্ট্র সম্পর্কে আধুনিক ধারণা সম্প্রসারণের পরবর্তী পর্বে একদিকে যেমন ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ তত্ত্বের প্রসার ঘটে অপরদিকে এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে সমালোচনাও সোচ্চার হ'তে থাকে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের ধ্রুপদী ধারণা গড়ে ওঠে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার উদ্ভবের কালে ব্যক্তিপুঁজির অনিয়ন্ত্রিত বিকাশের স্বার্থে। বলাবাহুল্য, পুঁজির অনিয়ন্ত্রিত বিকাশ পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় এবং তৎসংশ্লিষ্ট উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক কাঠামোর সংকট ডেকে আনে। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদীদের কথিত অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা যে সমাজে সংকট সৃষ্টি করে তা অর্থনীতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে পরিস্ফুট হ'তে থাকে। জন স্টুয়ার্ট মিল এ কারণেই বেন্থাম বা জেমস মিল-এর বক্তব্য থেকে সরে আসেন এবং যা আপরকে স্পর্শ করে, এরূপ স্বাধীনতার নিয়ন্ত্রণের কথা বলেন। বাজারদখলের লড়াই-এর ফলশ্রুতিতে বিশ্বযুদ্ধগুলি, ১৯৩০-এর অর্থনৈতিক মন্দা এটাই প্রমাণ করে যে, অনিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক বিকাশ আসলে অর্থনৈতিক সংকটকেই ডেকে আনে।

দ্বিতীয়ত, ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ন্ত্রণমুক্ত পুঁজির বিকাশ হলেও জার্মানী এবং জাপানে অর্থনীতির বিকাশে রাষ্ট্র অত্যন্ত ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। রাশিয়া এবং চিনে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরবর্তী পর্বে আর্থ-সামাজিক পুনর্গঠনে রাষ্ট্রের ভূমিকা ছিল সন্দেহাতীত। সুতরাং, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী তাত্ত্বিকগণ রাষ্ট্রের যে নেতিবাচক ভূমিকার কথা বলেন তা একপেশে।

তৃতীয়ত, রাষ্ট্রকে ব্যক্তিস্বাধীনতার পথে অন্তরায় হিসেবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদীগণ যেভাবে ব্যাখ্যা করেন তাও সঠিক নয়। ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ কখনও কখনও অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়ে। তাছাড়া, অধিকাংশ লিখিত শাসনতন্ত্রে মৌলিক অধিকারগুলি লিখিত থাকে এবং আদালতের উপরে দায়িত্ব অর্পিত হয় ঐ অধিকারগুলি সংরক্ষণের। রাষ্ট্র অধিকারের রক্ষক এবং অনেকাংশে স্রষ্টার ভূমিকাও পালন করে।

চতুর্থত, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীগণ রাষ্ট্রকে অশুভ বলে বর্ণনা করলেও প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান বলে স্বীকার করেন এবং বিরোধ মীমাংসায়, সম্পাদিত চুক্তির সংরক্ষণে এবং বহিঃআক্রমণের মোকাবিলায় রাষ্ট্রের ভূমিকা স্বীকার করেন। বলাবাহুল্য, এ ধরনের কাজ করতে গিয়ে রাষ্ট্রকে স্বল্পক্ষমতাশালী হিসেবে রাখা যায় না। নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে শিক্ষার সম্প্রসারণে রাষ্ট্রের ভূমিকার উপর গুরুত্ব দেন। বিভিন্ন দেশের দুর্ভিক্ষের উপর অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি লক্ষ্য করেন খাদ্যের ঘাটতি দুর্ভিক্ষের কারণ নয় ; মূল কারণ হ'ল মানুষের ক্রয়-ক্ষমতার অভাব, গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে দুর্ভিক্ষের প্রবণতা কম কারণ গণতন্ত্রের নির্বাচনী চাপ শাসককে বাধ্য করে দুর্ভিক্ষের মোকাবিলায়। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ অত্যন্ত জরুরী বলে তিনি মন্তব্য করেন।

৩.২.৫ মূল্যায়ন

ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে উপরোক্ত যুক্তিগুলি উত্থাপিত হ'লেও একথা অনস্বীকার্য যে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সম্প্রসারণ ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিপন্থী হয়ে ওঠে। ব্যক্তির মধ্যে একদিকে যেমন নিরাপত্তার অভাব পরিলক্ষিত হয় অপরদিকে রাজনৈতিক কার্যে অংশগ্রহণে অনীহা ও বিচ্ছিন্নতাবোধ গড়ে ওঠে। রাষ্ট্র এক বিচ্ছিন্ন প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হ'তে থাকে। অপরদিকে, রাষ্ট্রের প্রতি নির্ভরশীলতা ব্যক্তিগত উদ্যোগকে যেমন খর্ব করে রাষ্ট্রের ক্ষমতাকেও প্রসারিত করে। ১৯৭০-এর পরবর্তী পর্যায়ে রাষ্ট্র নামক অতিদানব-এর নিয়ন্ত্রণ থেকে

ব্যক্তিস্বাধীনতাকে কীভাবে সংরক্ষণ করা যায় তা বর্তমান ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

৩.৩ সমাজতন্ত্রবাদ

রাষ্ট্রের কার্যাবলী সম্পর্কে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী তত্ত্বের বিপরীতধর্মী তত্ত্বটি হ'ল সমাজতন্ত্রবাদ, যেখানে ব্যক্তির পরিবর্তে সমাজকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক প্লেটো (Plato, BC 428-347 BC) বা ষোড়শ শতকে টমাস মোর (Thomas, More, 1428-1535), সপ্তদশ শতকের লেভেলার্স (Levellers) বা ডিগার্সদের (Diggers) বক্তব্যে ফরাসী বিপ্লব পর্বে বাবফ (Babeuf)-এর বক্তব্যে সমাজতন্ত্রের বিষয়টি ব্যক্ত হ'লেও রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসেবে সমাজতন্ত্রের উদ্ভব ঊনবিংশ শতকে পুঁজিবাদের তথা ব্যক্তিমুনাফাভিত্তিক শিল্পীয় উৎপাদনব্যবস্থার প্রতিবাদ হিসেবে। পুঁজিবাদের বিকাশের প্রথম দিকে পুঁজিপতিশ্রেণির দর্শন হিসেবে যেমন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের উদ্ভব, পুঁজিবিকাশের পরবর্তী স্তরে শ্রমিকশ্রেণির দর্শন হিসেবে গড়ে ওঠে সমাজতন্ত্রের দর্শন।

৩.৩.১ 'সমাজতন্ত্র' ধারণাটির ক্রমবিকাশ

সমাজতন্ত্র শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন রবার্ট ওয়েন (Robert Owen, 1771-1851) ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে Cooperation পত্রিকায় এবং সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাকল্পে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে Association of All Classes of All Nations প্রতিষ্ঠা করেন। ওয়েন-এর মতই ফ্রান্সে সাঁ সিমো (Saint Simon, 1760-1825), শার্ল ফুরিয়ে (Charles Fourier, 1772-1837) পুঁজিবাদী সমাজের শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের দর্শন গড়ে তোলেন। এই সমস্ত তাত্ত্বিকদের রচনায় যথেষ্ট মানবিক আবেদন থাকলেও পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার প্রকৃত বিশ্লেষণে এবং সমাজপরিবর্তনের চালিকাশক্তি হিসেবে শ্রমিকশ্রেণিকে চিহ্নিত করলে এই তত্ত্ব ব্যর্থ হয়। এ কারণে এই সমস্ত তাত্ত্বিকদের কার্ল মার্কস এবং ফ্রেডরিক এঙ্গেলস কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো (১৮৪৮)-তে সমালোচনামূলক ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রী বলে অভিহিত করেন।

সমাজতন্ত্রের সঙ্গে যে দার্শনিকের নাম বিশেষভাবে যুক্ত তিনি হলেন কার্ল মার্কস (Karl Marx, 1818-1883) এবং সহযোগী বন্ধু ফ্রেডরিক এঙ্গেলস (Friedrick Engels, 1820-1895)। কমিউনিস্ট লীগের কর্মসূচী হিসেবে ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত Communist Manifesto পুস্তিকায় মার্কস-এঙ্গেলস শ্রমিকশ্রেণীর দর্শন হিসেবে সমাজতন্ত্রের দর্শন গড়ে তোলেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত গোথা ঐক্য কংগ্রেস (Gotha Unity Congress-1875)-এ বিরুদ্ধ বক্তব্যের প্রত্যুত্তরে রচিত The Critique of the Gotha Programme-এ কার্ল মার্কস সমাজতন্ত্রকে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার ধ্বংস ঘটিয়ে সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থার উত্তরণে প্রথম স্তর বলে উল্লেখ করেন। গোথা কংগ্রেস-এ সমাজতন্ত্রের আরেকটি ছক উপস্থাপিত করেন মার্কস-এর বিপরীত শিবিরে অবস্থানকারী তাত্ত্বিক Lassalle যিনি আশা করেছিলেন সার্বজনীন ভোটাধিকার রাষ্ট্রের ভিত্তিকে সম্প্রসারিত করবে কারণ প্রত্যেকের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ মুক্ত জনগণেরকে মুক্ত রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলবে। পুঁজিবাদী সমাজের ক্রমরূপান্তরের মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার তথ্য হাজির

করেন আর এক তাত্ত্বিক এডওয়ার্ড বার্ণস্টাইন (Edward Bernstein, 1850-1932)। বিপ্লবের পরিবর্তে ক্রমপরিবর্তনের / বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার এই তত্ত্বটি বিবর্তনবাদী সমাজতন্ত্র নামে পরিচিত। ইউরোপের বেশ কিছু দেশে এবং সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে বিপ্লবের পরিবর্তে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার এই ধারাটি লক্ষ্য করা যায়।

বিংশ শতকের গোড়ার দিকে রাশিয়ায় লেনিনের নেতৃত্বে কমিউনিস্টদের ক্ষমতাদখল এবং সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা মার্কসীয় দর্শনের এক প্রায়োগিক দিক হিসেবে বিবেচিত হ'তে থাকে। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে চিনে একদিকে জাপান অপরদিকে চিনের জাতীয়তাবাদী কুয়োমিংতাং-এর বিরুদ্ধে বিপ্লব, পরবর্তীকালে ফ্রান্স এবং পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ভিয়েতনামের বিপ্লব, চে গুয়েভারার নেতৃত্বে কিউবায় এবং পরে ফিদেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকামদতপুষ্ট বা বাতিস্তাশাসনের বিরুদ্ধে বিপ্লব, ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে আলজেরিয়ার মুক্তিসংগ্রাম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আদর্শেই পরিচালিত।

অপরদিকে লেনিন এবং তৎপরবর্তীকালে স্তালিন সোভিয়েত রাশিয়ার সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যে কর্মসূচি গ্রহণ করেন এবং তার পিছনে যে পদ্ধতি অবলম্বন করেন তা কতদূর মার্কসবাদের অনুপন্থী সে নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিতে থাকে। রাষ্ট্রের অবলুপ্তির পরিবর্তে রাষ্ট্রের ক্ষমতার সম্প্রসারণ, কমিউনিস্ট পার্টির সর্বাত্মক প্রাধান্য, আন্তর্জাতিকতার পরিবর্তে জাতীয় সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, কর্মের মধ্যে ও সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে আমলাতন্ত্রের প্রসার, কায়িক ও বৌদ্ধিক শ্রমের মধ্যে ব্যাপক ব্যবধান প্রভৃতি বিষয়গুলির বিরুদ্ধে অসন্তোষ ধূমায়িত হ'তে থাকে। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৯১ খ্রীষ্টাব্দে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের ভাঙ্গনকে 'সমাজতন্ত্রেরই মৃত্যু' বলে সমালোচকগণ ঘোষণা করেন। ইতিমধ্যে ১৯৮৯-৯২ পর্বে পূর্ব-ইউরোপের সোভিয়েত আদলে প্রতিষ্ঠিত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতেও অনুরূপ পরিবর্তন ঘটে যায়। বিপ্লব উদ্ভূত সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসেবে চিন টিকে থাকলেও বিভিন্ন সংস্কারসাধনের মাধ্যমে যে বাজারী অর্থব্যবস্থার অনুপ্রবেশ ঘটতে শুরু করেছে তাতে চিনকেও কতদূর মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের ভাবধারাপুষ্ট সমাজতান্ত্রিক দেশ বলা যাবে—সে নিয়েও প্রশ্ন থেকে যায়।

বিংশ শতকে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের দ্বারা শুধুমাত্র ইউরোপই নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত এই আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হ'তে থাকে। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে নিজ দেশের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সমাজতন্ত্রকে খাপ খাইয়ে নেবার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে যেখানে পুঁজিবাদ অপরিণত, শ্রমিকশ্রেণি অসংগঠিত, এমনকি অর্থব্যবস্থাও মূলত কৃষিনির্ভর বা প্রাক্-শিল্পীয় সেই সমস্ত দেশে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের আদর্শকে মেশানোর প্রচেষ্ঠাও শুরু হয়। এর প্রকৃষ্ঠ উদাহরণ হ'ল ভারতে স্বাধীনতাসংগ্রামে মানবেন্দ্রনাথ রায়, নেহরু, সুভাষচন্দ্র বসু, গান্ধী প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সমাজতন্ত্রের প্রতি আকর্ষণ, যদিও সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে পৌঁছানোর ব্যাপারে কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে, কে শত্রু, কে মিত্র বলে বিবেচিত হবে সেই বিষয়ে নেতৃবৃন্দের মধ্যে দ্বন্দ্ব অত্যন্ত স্পষ্ট। এভাবে সমাজতন্ত্র কোন সুনির্দিষ্ট তত্ত্বের আকারে হাজির না হয়ে বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন ধাঁচের সমাজতন্ত্রের ধারণার সূচনা করে।

৩.৩.২ সমাজতন্ত্রের সংজ্ঞা

উদ্ভবগত দিক থেকে Socialism শব্দটি লাতিন 'Socius' থেকে এসেছে যার অর্থ হ'ল 'Companion'

(সহযোগী/সঙ্গী)। Socialism শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয় ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে Cooperation পত্রিকায়। এর পর থেকে এ পর্যন্ত এমন কোন রাজনীতিবিজ্ঞানী নেই যাঁর রচনায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত হয়নি। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে অধিকাংশ তাত্ত্বিকই সমাজতন্ত্রের সংজ্ঞা প্রদান থেকে বিরত থেকেছেন। যে কয়েকজন তাত্ত্বিক সমাজতন্ত্রের সংজ্ঞা প্রদানে প্রয়াসী হয়েছেন তাঁদের বক্তব্যের মধ্যে কোনও সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা খুঁজে পাওয়া মুশকিল। সমাজতন্ত্রের কোনও সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা গড়ে না ওঠার কারণ হল সমাজতন্ত্র মার্কসবাদ, সর্বহারার একনায়কত্ব, সকল জনগণের রাষ্ট্র, সাম্যবাদ, গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র, সামাজিক গণতন্ত্র প্রভৃতি শব্দগুলির যথেচ্ছ ব্যবহার অথচ প্রতিটি শব্দের এক সুনির্দিষ্ট ব্যঞ্জনা রয়েছে। দ্বিতীয় কারণটি হ'ল সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে বক্তব্যের ভিন্নতা যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক সংঘাতের সৃষ্টি করেছে। মার্কসবাদ বনাম নৈরাজ্যবাদ, কমিউনিস্ট বনাম সোসালিস্ট, যৌথবাদী বনাম সংঘবাদী, সংস্কারপন্থী বনাম বিপ্লবী, ট্রটস্কিপন্থী বনাম লেনিনপন্থী—সমাজতন্ত্রের শিবিরেই এই বিভাজন অত্যন্ত স্পষ্ট। এ কারণে রেমণ্ড উইলিয়মস মন্তব্য করেন, প্রত্যেকের নিজেদের সমাজতন্ত্রী হিসেবে আখ্যায়িত করা নিয়ে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও প্রবণতাগুলির মধ্যেকার বিরোধ দীর্ঘদিনের এবং তা জটিল ও তিক্ত। এন্থনি রাইট (Anthony Wright) অনুরূপ মন্তব্য করেন, সমাজতন্ত্রের ইতিহাস হ'ল সমাজতন্ত্রসমূহের ইতিহাস। তাছাড়া, এই ইতিহাস ভ্রাতৃত্বমূলক বন্ধুত্বের নয় ; পারস্পরিক প্রতিযোগিতা ও বৈরিতার।

সমাজতন্ত্রের সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা প্রদানের আরেকটি হ'ল সমাজতন্ত্র শুধুমাত্র রাষ্ট্র সম্পর্কে এক তাত্ত্বিক মতবাদ নয় ; সমাজ-রাষ্ট্র পরিবর্তনেরও এক মতবাদ। ঊনবিংশ শতককে যদি সমাজতন্ত্রের তত্ত্বেরও শতক বলে চিহ্নিত করা যায় তাহলে বিংশ শতক হ'ল সমাজতন্ত্রের প্রয়োগের এবং সংকটের শতক। ভিন্নতর পরিস্থিতিতে ভিন্ন সমাজ কাঠামোয় সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ভিন্ন ভিন্ন সমস্যা ও তজ্জনিত তত্ত্বের সৃজন ঘটিয়েছে ; যার ফলে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে কোনও সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা তথা মত গড়ে ওঠেনি। এ কারণে এন্থনি রাইট Socialisms : Theories and Practices গ্রন্থে মন্তব্য করেন—সমাজতন্ত্র বলতে কী বোঝায় সে সম্পর্কে সংজ্ঞার অভাব নেই কিন্তু যার অভাব রয়েছে তা হ'ল সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞার।

১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত Communist Manifesto পুস্তিকায় মার্কস এবং এঙ্গেলস সমাজতান্ত্রিক এবং কমিউনিস্ট সাহিত্য সম্পর্কিত আলোচনায় প্রতিক্রিয়াশীল সমাজতন্ত্র/সামন্ততান্ত্রিক সমাজতন্ত্র, পেটি বুর্জোয়া সমাজতন্ত্র, জার্মান প্রকৃত সমাজতন্ত্র, রক্ষণশীল বা বুর্জোয়া সমাজতন্ত্র এবং সমালোচনামূলক কাল্পনিক সমাজতন্ত্র—প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের সমাজতন্ত্রের উল্লেখ করলেও সমাজতন্ত্রের কোনও সংজ্ঞা দেননি। The Critique of the Gotha Programme (1875) গ্রন্থে কার্ল মার্কস সমাজতন্ত্রকে সাম্যবাদী সমাজে উত্তরণের প্রথম সোপান হিসেবে উল্লেখ করেন। ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত The State and Revolution গ্রন্থে লেনিন বলেন, 'আমরা যাকে সাধারণত সমাজতন্ত্র বলি কার্ল মার্কস তাকে কমিউনিস্ট সমাজের প্রথম বা নিম্নবর্তী স্তর হিসেবে উল্লেখ করেছেন'। The Critique of the Gotha Programme-এ কার্ল মার্কস সমাজতন্ত্রের সংজ্ঞা প্রদানের পরিবর্তে কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেন। যেমন—শ্রমের উপকরণকে জনগণের সম্পত্তিতে রূপান্তরিতকরণ, দ্রুত ব্যক্তিশ্রমের সঙ্গে গড় সামাজিক শ্রমের সমন্বয়সাধন এবং বাজারের কোনও এজেন্সি ছাড়া ব্যক্তিগত শ্রমের প্রত্যক্ষ স্বীকৃতিদান, সামাজিক উৎপাদনের যৌথ ভোগ, জনগণের সম্পত্তি সংরক্ষণ এবং উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনে কিছু ভারী মাল উৎপাদিত পণ্যকে বন্টন না করা, গুণগত এবং পরিমাণগত দিক বিবেচনা করে

শ্রমের পরিমাণ অনুযায়ী বন্টনের ব্যবস্থা করা।

Andrew Haywood সমাজতন্ত্র শব্দটির অন্তত তিন ধরণের অর্থ নির্দেশ করেছেন। এক, সমাজতন্ত্র হ'ল এক ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যা পুঁজিবাদীব্যবস্থার বিপরীত, সমাজতন্ত্র ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত উৎপাদন ও বন্টনব্যবস্থার পরিবর্তে যৌথ এবং পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থার উপর গুরুত্ব দেয়। দুই, সমাজতন্ত্র হ'ল শ্রমিক-আন্দোলনের এক হাতিয়ার ; তিন, সমাজতন্ত্র হ'ল কতকগুলি ধারণা, মূল্যবোধ এবং তত্ত্ব নিয়ে গড়ে ওঠা এক রাজনৈতিক মতাদর্শ। এই শেষোক্ত অর্থেই তিনি সমাজতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা করেন Politics (1997) গ্রন্থে।

৩.৩.৩ সমাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

সমাজতন্ত্রের সংজ্ঞা সম্পর্কিত আলোচনায় আমরা দেখেছি সমাজতন্ত্রের সংজ্ঞা নিয়ে রাজনীতিবিজ্ঞানীগণ একমত নন। তা সত্ত্বেও সমাজতন্ত্রের কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা যায়।

প্রথমত, সমাজতন্ত্র মানুষকে যেভাবে চিত্রিত করে তা সামাজিক মানুষ। এখানে ব্যক্তি-প্রতিযোগিতার পরিবর্তে ব্যক্তি-সহযোগিতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ওয়েন কথিত গোষ্ঠীভ্রাতৃত্ব থেকে শুরু করে মার্কস-এঙ্গেলস-এর 'সব দেশের শ্রমিক এক হও'-এর আহ্বান এই বিশ্বভ্রাতৃত্বেরই ইঙ্গিত।

দ্বিতীয়ত, সমাজতন্ত্র ব্যক্তিকেন্দ্রিক, প্রতিযোগী, পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার বিরোধী এবং উৎপাদন-উপকরণের ও উৎপাদনের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী। এই যৌথ মালিকানার প্রকৃতি নিয়ে অবশ্য সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে ; যেমন সামাজিক, কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রীয় অথবা বিকেন্দ্রীভূত শ্রমিক-সমবায়ভিত্তিক উৎপাদনব্যবস্থা পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি বিষয়ে সমাজতন্ত্রীগণ একমত নন।

তৃতীয়ত, উদারনৈতিক গণতন্ত্রে যেমন স্বাধীনতার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব করা হয়, সমাজতন্ত্রে সেখানে সমতার উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয় এবং মনে করা হয় সামাজিক নিরাপত্তা, সংহতি, উৎপাদনের প্রবাহমানতা প্রভৃতি বজায় রাখার জন্য শুধুমাত্র রাজনৈতিক এবং আইনগত ক্ষেত্রেই নয়, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও সমতার প্রয়োজন। অবশ্য সমতার প্রকৃতি ও ব্যাপ্তি, সমতার সঙ্গে স্বাধীনতার সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়ে সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

চতুর্থত, সমাজতন্ত্রে শ্রেণীর উদ্ভব, বিকাশ ও সংঘাত সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং মনে করা হয় রাষ্ট্রে উদ্ভব শ্রেণিশোষণব্যবস্থাকে কায়েম রাখার জন্য। একমাত্র সমাজতন্ত্রেই শ্রেণিশোষণের অবসান ঘটতে পারে।

পঞ্চমত, সমাজতন্ত্রের সমর্থকগণ সমাজপরিবর্তনের তত্ত্বে বিশ্বাসী এবং পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে সমাজবাদী সমাজব্যবস্থার উদ্ভব সম্পর্কে আশাবাদী। এই পরিবর্তনে শ্রমিকশ্রেণীই মুখ্য ভূমিকা নেবে। অবশ্য এই পরিবর্তন কীভাবে হবে—ক্রমপরিবর্তনের মধ্য দিয়ে শান্তিপূর্ণ উপায়ে অথবা বিপ্লবের মাধ্যমে—সে সম্পর্কে তাত্ত্বিকগণ একমত নন।

ষষ্ঠত, সমাজতন্ত্রের প্রবক্তাগণ ব্যাপক ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রব্যবস্থার পক্ষপাতী। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থাকে ধ্বংস করে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য সক্রিয় এবং ক্ষমতাসম্পন্ন এক রাষ্ট্রের প্রয়োজন। অবশ্য, এই চূড়ান্ত ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রের কার্যকালের মেয়াদ নিয়ে সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। মার্কসবাদীগণ মনে করেন, সমাজতন্ত্র হ'ল পুঁজিবাদীব্যবস্থা থেকে সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থায় উত্তরণে এক উৎক্রমণশীল পর্যায়। সুতরাং, পুঁজিবাদীব্যবস্থার অবশেষকে ধ্বংস করার দায়িত্ব শ্রমিকশ্রেণী তথা সর্বহারার একনায়কত্বে পরিচালিত রাষ্ট্রের।

ব্যক্তিগত পুঁজি-বিকাশের সহায়ক ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটিয়ে উৎপাদন-উপকরণের সামাজিক মালিকানা যেদিন প্রতিষ্ঠিত হবে সেদিন রাষ্ট্র নামক শোষণযন্ত্রেরও অবসান ঘটবে। পরবর্তী মার্কসবাদী তাত্ত্বিকগণ যেমন, পুনালৎযাস (Poulantzas) এবং মিলিব্যাণ্ড (Ralph Miliband) রাষ্ট্রের আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্যের বিষয়টি নিয়ে পরস্পরবিরোধী মতপোষণ করেন। সামাজিক গণতন্ত্রের, রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রের এবং বাজারধর্মী সমাজতন্ত্রের প্রবক্তাগণ সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশে রাষ্ট্রের ভূমিকাকে শুধু স্বীকারই করেন না—রাষ্ট্রব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার সপক্ষে মতপ্রকাশ করেন।

সপ্তমত, উদারনৈতিক গণতন্ত্রের প্রবক্তাগণ সমাজতন্ত্রকে গণতন্ত্র-বিরোধী ও গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক এক ব্যবস্থা বলে মনে করেন। সমাজতন্ত্রের সমর্থকগণ সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের মধ্যে বিরোধমূলক অবস্থানের পরিবর্তে সমাজতন্ত্রকেই প্রকৃত গণতন্ত্র বলে দাবী করেন। লেনিন বা আপতেকার (Aptheker) গণতন্ত্রকে পুঁজিবাদী / বুর্জোয়া গণতন্ত্র এবং সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র—এই দুই ভাগে ভাগ করেন এবং সমাজতন্ত্রের মধ্যে কোনও বিরোধ স্বীকার করেন না। Democratic Theory and Socialism (1989) গ্রন্থে ফ্রাঙ্ক কানিংহাম (Frank Cunningham) এই মতপোষণ করেন 'পুঁজিবাদ কাম্য নয় কারণ পুঁজিবাদ গণতন্ত্রকে সম্প্রসারিত হতে দেয় না। একমাত্র সমাজতন্ত্রই গণতন্ত্রের সম্প্রসারণে সহায়ক।' কানিংহামের কাছে গণতন্ত্রই মূল লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্যপূরণের জন্য সমাজতন্ত্রই শ্রেষ্ঠ উপায়।

৩.৩.৪ সমাজতন্ত্রের বিভিন্ন রূপ

সমাজতন্ত্রের সংজ্ঞা ও 'সমাজতন্ত্র' ধারণাটির ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনায় আমরা দেখেছি, সমাজতন্ত্র সম্পর্কে কোনও সর্বজনগ্রাহ্য সুনির্দিষ্ট তত্ত্ব গড়ে ওঠেনি। পরিবর্তে, যা রয়েছে তা হ'ল বিভিন্ন ধরনের সমাজতন্ত্র। সমাজতন্ত্রের এই বিভিন্ন ধরণগুলিকে আমরা সংক্ষেপে উল্লেখ করব।

ঊনবিংশ শতকে রবার্ট ওয়েন, চার্ল ফুরিয়ে বা সাঁসিমো বর্ণিত মানবিকতাবাদী সমাজতন্ত্রকে এঙ্গেলস কল্পবাদী সমাজতন্ত্র বলে অভিহিত করেন। Lassalle বর্ণিত সংস্কারবাদী বা এডওয়ার্ড বার্ণস্টাইন বর্ণিত বিবর্তনবাদী সমাজতন্ত্র ছাড়াও মূল ধারাটি ছিল কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস-এর সমাজতান্ত্রিক ধারা যা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র নামে পরিচিত। এছাড়া, মূলত ফ্রান্সে প্রুঁধো প্রভাবিত সোরেল (Sorel) এবং বার্গসন (Bergson)-এর শ্রমিক সংঘবাদ (Syndicalism) হবসন (S. G. Hobson), ওরেজ (A. R. Orage), পেন্ট্রি (A. J. Pentry), কোল (G. D. H. Cole)-এর সংঘ সমাজবাদ (Guied socialism) ব্রিটেনে সিডনি ওয়েব ও বিয়াট্রিস ওয়েব, বার্ণাডশ, এইচ. জি. ওয়েলস-এর নিম্নবর্গীয় সমাজবাদ সমাজতন্ত্রের অন্যান্য কয়েকটি ধারা। সোভিয়েত রাশিয়ার সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরবর্তী পর্বে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে যে তত্ত্বগত ও প্রায়োগিক বিকাশ লক্ষ্য করা যায় তার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজতন্ত্রকে কয়েকটিভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে—

(১) মার্কসীয় সমাজতন্ত্র।

(২) রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র।

হয় এবং দরিদ্র অধিকতর দরিদ্র হয়। এর কারণ দর্শাতে গিয়ে মার্ক্স বলেছেন যে, বুর্জোয়া শ্রেমী শ্রমিক শ্রেণীর উপাদিত সম্পদের একটি সিংহভাগ আত্মসা করে থাকে।

মার্ক্স যে কোনও দ্রব্যের একটি Use value এবং একটি Exchange value নির্দেশিত করেছেন। প্রথম মূল্যটি তার ব্যবহারকারীর কাছেই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু পরের মূল্যটি সকলের কাছেই নির্দিষ্ট এবং অপরিবর্তনীয়।

Exchange value আসলে বাজারের যোগান এবং চাহিদা শক্তির (demand and supply) ওপর নির্ভর করে থাকে। মার্ক্স অবশ্য মনে করেন যে, একটি বস্তুর Exchange value নির্ভর করে কতটা সময় এবং শ্রমের মাধ্যমে সেটি উৎপাদিক হয়েছে, তার ওপরে।

অতএব, উদ্ধৃত মূল্য হ'ল Exchange vlaue এবং সামাজিক শ্রম মূল্যের পার্থক্য, যা কি না বুর্জোয় মালিক অনৈতিকভাবে নিজে ভোগ করে।

দরিদ্র শ্রমিককে শুধুমাত্র তার দৈনিক গ্রাসাচ্ছদনের ব্যবস্থা করে দিয়ে অতএব বুর্জোয় মালিক এক বিপুল পরিমাণ সম্পদ ভোগ করে যা কি না তার সামাজিক উৎপাদনের চরিত্র অনুযায়ী ভোগ করবার কথা ছিল শ্রমিকের।

শ্রমিক তার উৎপাদিক বস্তুর মূল্যর চেয়ে সব সময়েই কম মূল্য পায় এবং শোষিত হয়।

৫.৫ শ্রেণী এবং শ্রেণী সংগ্রাম

শ্রেণীর ধারণাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেনিন লিখেছেন যে শ্রেণী বলতে বোঝায় সমাজের বৃহৎ গোষ্ঠীগুলিকে যাদের মধ্যে পার্থক্যের ভিত্তি ঐতিহাসিকভাবে নির্দিষ্ট ; সমাজের উপাদন ব্যবস্থায় এদের ভিন্ন অবস্থান, উপাদন উপকরণ-এর সঙ্গে তাদের ভিন্ন সম্বন্ধ, সামাজিক শ্রম সংগঠন তাদের ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা এবং সেই অনুযায়ী তাদের অংশগ্রহণ এবং অংশ আহ্বরণের পদ্ধতি। শোষক শ্রেণী বলতে বোঝায় সেই সামাজিক গোষ্ঠীগুলিকে, অর্থনীতিতে নিজ অবস্থানের শক্তিহেতু অন্য কোনও গোষ্ঠীর শ্রম আত্মসা করতে যারা সমর্থ হয়।

অত-এব শ্রেণীর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আমরা লক্ষ্য করি—

(১) শ্রেণী হ'ল ঐতিহাসিকভাবে নির্ধারিত একটি বর্গবিশেষ, যেটি উৎপাদন-ব্যবস্থা বিকাশের প্রক্রিয়ার একটি ফল।

(২) শ্রেণীর অবস্থান নির্দিষ্ট হয় উপাদনের শক্তিগুলির সঙ্গে তার সম্বন্ধ স্থাপনের মাধ্যমে।

(৩) উৎপাদনের শত্রি সাথে শ্রেণীর শ্রমের সামাজিক সংগঠনে শ্রেণীর ভূমিকাকে নির্দিষ্ট করে দেয়।

(৪) সামাজিক সম্পদ দখল করবার পরিমাণ এবং পদ্ধতি যে কোনও সমাজ ব্যবস্থায় শ্রেণীর চরিত্র নির্ধারণ করে দেয়।

৫.৫.১ সমালোচনা

(১) শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্বর বিরুদ্ধে সমালোচনা থাকা সত্ত্বেও এর বৈজ্ঞানিকতাকে কোনওভাবেই উপেক্ষা করা যায় না। পুঁজিবাদের উচ্ছেদ যেমন একটি দীর্ঘ সংগ্রামের ফল, সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাও তেমনি একটি নূতন আন্দোলন প্রক্রিয়ার সর্বপ্রথণ ধাপ।

সমালোচকেরা মানব ইতিহাসকে শুধুমাত্র শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস হিসেবে মেনে নিতে প্রস্তুত নন। তাঁরা মনে করেন এ ধরনের তত্ত্ব মানব সম্পর্কের নেতিবাচক দিকটিকেই বড় বেশী করে প্রতিফলিত করে। মানব সমাজের ইতিহাসে শ্রেণী সংগ্রাম ছাড়াও শ্রেণী সহযোগিতার ধারণাটি কিন্তু কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

(২) অর্থনৈতিক কারণ ছাড়াও মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব হওয়া সম্ভব এবং হয়েও থাকে।

(৩) সমালোচকেরা এই আশঙ্কাও করেন যে, সাম্যবাদী সমাজেও একটি নতুন সুবিধাভোগী শ্রেণীর

উদ্ভব ঘটা সম্ভব।

(৪) আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজে শুধুমাত্র পোষক এবং শোষিত ছাড়াও একটি গুরুত্বপূর্ণ মধ্যবিত্ত সমাজের অবস্থান রয়েছে।

(৫) সমাজতান্ত্রিক সমাজের সংগ্রামরত শ্রেণীগুলি কি কি— সে বিষয়ে মার্ক্সবাদে সম্পষ্টভাবে কিছু উল্লেখ করা হয়নি।

শ্রেণী সংগ্রাম তত্ত্বের বিরুদ্ধে নানা ধরনের সমালোচনা থাকলেও এই তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে কখনোই উপেক্ষা করা যায় না।

মানব ইতিহাসের বিচার করতে বসলে দেখাবে যে, প্রতিটি যুগেই সমাজ অর্থনৈতিক স্বার্থের ভিত্তিতে প্রধানত সুবিধাভোগী এবং সুবিধাহীন, এই দুই প্রকার শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে।

এ কথাও মানতে হবে যে, মার্ক্সবাদ অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দিলেও অন্যান্য দ্বন্দ্বকে উপেক্ষা করে। সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরেও যে অন্যতর সুবিধাভোগী শ্রেণীর জন্ম হতে পারে, মার্ক্সবাদে একথাও অস্বীকার করা হয় না।

সমাজবাদের প্রতিষ্ঠা— শ্রেণী সংগ্রামের মতন একটি নতুন সংগ্রাম। এর মাধ্যমে সাম্য এবং মুক্তির আদর্শ স্থাপিত হবে।'

মার্ক্স মনে করেন যে, উপাদন প্রক্রিয়ার একটি বিশেষ স্তরে ঐতিহাসিক কারণেই শ্রেণীর জন্ম হয়েছে। উপাদিকা শক্তির বিকাশের কারণে সমাজ খন আদিম সাম্যবাদী স্তর থেকে বর্তমান অবস্থার দিকে এগিয়ে চলেছে, তখনই উদ্বৃত্ত উৎপাদন সম্ভবপর হয়েছিল। এর থেকে দেখা দিল শ্রম বিভাজন ক্রিয়া। এর ফলে, উৎপাদন ব্যবস্থায় বিশেষীকরণের উন্মেষ ঘটে, যার থেকে শুরু হয় নানা ধরনের পেশা এবং বিভিন্ন ধরনের উৎপাদনী প্রক্রিয়ার এবং শ্রম বিভাজনের ফলে সৃষ্টি হয় ব্যক্তিগত মালিকানা এবং অসাম্য।

৫.৫.২ শ্রেণী সংগ্রাম

শ্রেণীর অস্তিত্ব এবং শ্রেণী সংগ্রম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শ্রেণী সংগ্রামের মূল কারণ হ'ল উপাদিকা শক্তি এবং উৎপাদন সম্পর্কের ভিতর প্রবল পার্থক্য। এছাড়াও, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে নানা শ্রেণী আছে ারা পরস্পর বিরোধী। ভিন্নমুখী স্বার্থ থেকেই সংঘাত-এর ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে থাকে।

মার্ক্স এবং এঙ্গেলস্ লিখেছেন যে, আজ অবধি ত সমাজ দেখা গেছে তাদের প্রত্যেকের ইতিহাসই হ'ল শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস।

শ্রেণীর মধ্যে শ্রেণী সচেতনতা না থাকলে শ্রেণী সংগ্রামকে তীব্র করে সমাজকে বিপ্লব-এর জন্য প্রস্তুতকরা সম্ভবপর হয় না।

৫.৬ সর্বহারার একনায়কতন্ত্র

সর্বহারার একনায়কন্ত্র বলতে সাধারণত, বোঝানো হয় এমন একটি শ্রেণীহীন রাষ্ট্রব্যবস্থাকে, যখন আগের পুর্জোয়া আধিপত্যের দিন শেষ হয়ে একটি নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছে।

মনে রাখা প্রয়োজন যে, সর্বহারার একনায়কতন্ত্র কিন্তু আসলে দু'টি স্থিত বাস্তবতার মাঝখানে একটি ব্যবস্থা। এটি কোনও চিরস্থায়ী প্রকরণ নয়। ধনতন্ত্র থেকে কম্যুনিজম্-এ পরিবর্তনের মাঝখানে যে ফাঁক, সেটিকে ভরাট করে দিতেই এধরনের রষ্ট্রব্যবস্থার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

এখানে যে 'একনায়কতন্ত্র' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, তা নিয়ে আলোচনা অবশ্য কিছুটা অবকাশ রয়ে গেছে। আমরা ধনতান্ত্রিক সমাজের নৈতিক অবক্ষয়ের সময়ে এবং সামরিক সমাজের মদগর্বী আস্ফালনের সময় হিংসা, নির্যাতন, নিবর্তন এবং নিপীড়নের যে যে অনুষঙ্গ সচরাচির লক্ষ্য করে থাকি, সর্বহারার একনায়কতন্ত্রে কিন্তু ঠিক তেমনটা ঘটবার কথা নয়।

তত্ত্বগতভাবে, সর্বহারার শাসিত সমাজে এক ধরনের একনায়কতন্ত্রে প্রয়োজন হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন এক প্রয়োজনে, যার সাথে ক্ষমতার আকর্ষণকে ঠিক যেন মেলানো যায় না।

সর্বহারার শ্রেণী-স্বার্থকে রক্ষা করতে এই নবীন রাষ্ট্র অগ্রসর হয়। পাতি বুর্জোয়া, প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিবিপ্লবী এবং সংশোধনবাদী শক্তিদের হাত থেকে সর্বহারা শ্রেণীকে রক্ষা করতে এই 'একনায়কতান্ত্রিক' রাষ্ট্র তৎপর হয়ে ওঠে।

অতএব এই ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থার সাথে কিন্তু অযথা হিংসা অথবা অনৈতিক ক্ষমতা প্রদর্শনের কোনও ধরনের সম্পর্ক নেই।

সর্বহারার একনায়কতন্ত্রের মাধ্যমে একটি সমাজবাদী রাষ্ট্র গড়ে ওঠবার কথা— সেখান থেকে আবার মানুষ এগিয়ে যাবে শ্রেণীহীন সমাজ গঠনের দিকে।

অতএব, প্রথমে রাষ্ট্রযন্ত্র এবং রাষ্ট্রব্যবস্থার বিলোপ সাধন এবং পরবর্তী সময়ে শ্রেণীর ধারণার অবসান, এভাবে অগ্রসর না হয়ে, সর্বহারার একনায়কতন্ত্রের ধারণাটি যেটি অর্জন করতে চায় তা হল শ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমে বুর্জোয়া শ্রেণীকে পরাস্ত করে (একটি সফল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাহায্যে) তারপরে রাষ্ট্রব্যবস্থার বিলোপ সাধন। অবশ্য হিংসা এবং শোষণ না থাকলে রাষ্ট্রযন্ত্র আপনা হতেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এখানেই সর্বহারার একনায়কতন্ত্রের ধারণার গুরুত্ব।

৫.৭ অনুশীলনী

(১) তরুণ এবং পরিণত মার্ক্সের চিন্তাভাবনা প্রসঙ্গে আলোচনা করুন।

(২) দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ-এর বিশ্লেষণ করুন।

(৩) ইতিহাসের বস্তুবাদী বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা করুন।

(৪) ভিত্তি এবং উপরিসৌধের সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

(৫) শ্রেণী এবং শ্রেণী সংগ্রাম সম্বন্ধে মার্ক্সীয় তত্ত্বের বিশ্লেষণ করুন।

(৬) মার্ক্সবাদ কিভাবে মানব সভ্যতার ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করেছে? এর কয়েকটি প্রধান ধারা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৫.৮ গ্রন্থপঞ্জী

1. Cole G.D.H. : What Marx Really Meant, (1934)
2. Colletti L. : From Rousseau to Lenin, (1972)
3. Cornforth M : Dialectical Materialism, (1976)
4. Hook S. : From Hegel to Marx, (1950).
5. Macuse H. : Reason and Revolution. (1969).
6. Mililand R. : Marxism and Palitics. (1977)

একক—৬ ❐ নৈরাজ্যবাদ

গঠন

৬.০ উদ্দেশ্য

৬.১ প্রস্তাবনা

৬.২ নৈরাজ্যবাদ

৬.৩ পুরসমাজের ধারনা

৬.৩.১ নৈরাজ্যবাদের ধরন

৬.৪ নৈরাজ্যবাদী প্রত্যয়ের যুক্তি

৬.৪.১ রাষ্ট্রকে অবিশ্বাস

৬.৪.২ 'প্রতিনিধিত্বমূলক' সরকারের ফাঁকি এবং অসারতা

৬.৪.৩ ক্ষমতার ফলাফল

৬.৪.৪ রাষ্ট্র কেন অপ্রয়োজনীয়

৬.৪.৫ মুক্ত সমাজ

৬.৫ গান্ধী কি নৈরাজ্যবাদী ছিলেন

৬.৬ অনুশীলনী

৬.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৬.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন ঃ

- নৈরাজ্যবাদ কাকে বলে
- নৈরাজ্যবাদের পক্ষে কি কি যুক্তি আছে
- রাষ্ট্রের অপ্রয়োজনীয়তা
- মুক্ত সমাজ কী রকম এবং
- নৈরাজ্যবাদ সম্পর্কে গান্ধীর ধারণা

৬.১ প্রস্তাবনা

মার্ক্সবাদ-এর অন্তিম লগ্নে উপস্থিত হয়ে আমরা যখন রাষ্ট্রের ক্ষয়ে যাওয়ার অনিবার্যতার কথা শুনি, সেই ধারণা থেকেই নৈরাজ্যবাদ নামক রাজনৈতিক তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে।

এই তত্ত্ব বিশ্বাস করে যে, মানুষের স্বাভাবিক এবং সাবলীল জীবন যাপন করবার জন্য কোনও ধরনের রাজনৈতিক রাষ্ট্রের প্রয়োজন নেই। কেন না, রাষ্ট্র মানেই সংঘটিতরূপে হিংসা এবং শক্তির প্রকাশ, প্রকৃত সভ্য মানুষের সমাজে যা কখনই কাম্য হ'তে পারে না।

৬.২ নৈরাজ্যবাদ

লেনিন এইরূপ মনে করতেন যে, সর্বহারার একনায়কতন্ত্র স্থাপিত হওয়ার পরবর্তী সময়ে—অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায়—রাষ্ট্রযন্ত্রের কোন প্রাসঙ্গিকতা থাকবে না ; কেন না সমাজে তখন অন্যায় শোষণ এবং উপর থেকে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া শাসনের কোনও প্রয়োজন হবে না। অতএব, রাষ্ট্র আপনা হতেই ক্ষীয়মান হতে হতে অবশেষে ধ্বংস হয়ে যাবে।

এই মতের সঙ্গে অধিকাংশ কম্যুনিস্ট বুদ্ধিজীবীই ঐকমত্য পোষণ করে থাকে। প্রথমে বুর্জোয়া রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ধ্বংস হবে সমাজবাদী বিপ্লবের মাধ্যমে এবং তারপরে সর্বহারার একনায়কতন্ত্র নামক রাষ্ট্র-ব্যবস্থাও স্বাভাবিক নিয়মেই ক্ষয়ে যাবে। (এই রাষ্ট্র-ব্যবস্থা অবশ্য সম্পূর্ণরূপে কোনো রাষ্ট্রযন্ত্রের আদলে গঠিত ছিল না।) এর পরে সমাজে এক ধরনের মুক্ত সংগঠন দেখা দেবে। এই ধরনের মুক্ত সংঘটন অথবা free organisation of society-কে নৈরাজ্যবাদীরা সমর্থন করেন।

নৈরাজ্যবাদীদের একজন মূল প্রবক্তা হলেন ক্রোপট্‌কিন। তিনি এই মতবাদকে ব্যাখ্যা করেছেন এই বলে যে, এটি হল জীবন এবং আচরণের এমন একটি নীতি অথবা তত্ত্ব যেখানে সমাজ জীবনকে কল্পনা করে নেওয়া হয়েছে কোনও প্রকারের রাষ্ট্র অথবা সরকার ছাড়াই ; এই ধরনের সমাজ জীবনে মৈত্রী এবং ঐক্য স্থাপিত হয় কোনও প্রকার আইন অথবা কর্তৃত্বের কাছে বশ্যতা স্বীকার না করেও। বিভিন্ন প্রয়োজনে গঠিত বিভিন্ন গোষ্ঠী নিজেদের মধ্যে শান্তিপূর্ণ উপায়ে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে সমাজ জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে।

নৈরাজ্যবাদ অবশ্য এই ধরনের 'আদর্শ' জীবনে পৌঁছনোর উপায় সম্বন্ধে নীরব থেকেছে। ক্রোপট্‌কিন অবশ্য এ সত্ত্বেও মনে করেন যে, নৈরাজ্যবাদ শুধুমাত্র কোনও ধরনের আকাশকুসুম কল্পনা নয়। তিনি তাঁর সমসাময়িক সমাজ জীবনের ঝোঁক এবং গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেই এ ধরনের সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন।

মার্ক্সবাদে যেমন 'গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার' অভিমুখে একটি নির্দিষ্ট প্রত্যয় লক্ষ্য করা যায়, নৈরাজ্যবাদে ঠিক সেই রকমটি ঘটেনা। নৈরাজ্যবাদ localism-এর ওপরে বেশি জোর দেয়। নৈরাজ্যবাদ এই ধরনের কোনও বিশ্বাস-এর ওপরে দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে সভ্যতাকে বিচার করা হচ্ছে ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং পুরসমাজের দিকে অগ্রসর একটি প্রক্রিয়া হিসেবে।

৬.৩ পুরসমাজের ধারণা

পুরসমাজ অথবা civil society সংক্রান্ত আন্তেনিও গ্রামশির মতামত এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে, পুরসমাজে প্রতিফলিত এমন সব কিছুই যা রাষ্ট্রের আওতার বাইরে অবস্থান করে, যথা জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়াস, ব্যক্তিগত সম্পর্কের ঠাসবুনটই এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহ ইত্যাদি।

গ্রামশির মতে, সমাজতন্ত্রের অগ্রগতি নির্ভর করে পুরসমাজের বিবর্তন-এর উপর। এই ঐতিহাসিক পরিবর্তন রাষ্ট্র-ব্যবস্থার বদলের ক্ষেত্রে একটি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে।

পুরসমাজ রাষ্ট্রর বিরোধিতা করে এবং এই সক্রিয় বাধাদানের ফলে সে আপন শক্তিতে বলীয়ান হয়ে ওঠে। পুরসমাজের বিকাশ ও অগ্রগতির সাথে যে গুরুত্বপূর্ণ পরিণতিটি যুক্ত থাকে, তা হ'ল মানুষের স্বশাসনের পদ্ধতি এবং প্রক্রিয়ার উন্নতি।

স্যামুন লিখেছেন যে, এই পুরসমাজ সংক্রান্ত তত্ত্বটি অত্যন্ত দরকারী কেননা এর দ্বারা একটি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের রাজনৈতিক বাস্তবতা আমাদের সামনে উন্মোচিত হয় যা কি না ব্যক্তি এবং সমাজকে একই সূত্রে গ্রন্থনা করতে প্রয়াসী। এটি এক নতুন ধরনের রাজনৈতিক ধারণাকে প্রতিষ্ঠা দিতে পেরেছে।

নৈরাজ্যবাদীরা এইরূপ মনে করেন যে, একমাত্র একটি নৈরাজ্যবাদী সমাজেই একজন ব্যক্তি মানুষের প্রতিভা এবং গুণাবলীর সঠিক বিকাশ হওয়া সম্ভব। তাঁদের এই ধারণাকে সমর্থন জানায় সকল ধরনের বাহ্যিক বাধানিষেধ এবং প্রতিবন্ধকতার অনুপস্থিতির এক আদর্শ পরিস্থিতি। ব্যক্তি মানুষ এই প্রথম সমাজ জীবনে সম্পূর্ণভাবেই 'স্বাধীন' হতে পারবেন।

৬.৩.১ নৈরাজ্যবাদের ধরন

নৈরাজ্যবাদীরা কয়েকটি নির্দিষ্ট ধরনের উৎস এবং অবসান নির্দিষ্ট করেছেন, যেমন—

(১) বুর্জোয়া মালিকের আওতা থেকে মুক্তি,

(২) রাষ্ট্রের আওতা থেকে মুক্তি এবং

(৩) ধর্মীয় অনুশাসনের আওতা থেকে মুক্তি।

অর্থাৎ নৈরাজ্যবাদীরা ব্যক্তি মানুষকে তার উৎপাদক, নাগরিক ও নীতিনিষ্ঠ ভক্তের সত্ত্বা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে চেয়েছেন।

নৈরাজ্যবাদীরা সরকারের কোনও প্রয়োজন অনুভব করেন না। ক্রোপট্‌কিনের ভাষায় 'সব কিছুই সকলের জন্য। যদি প্রত্যেকে সামাজিক উৎপাদনের কর্মকাণ্ডে যোগদান করে, তাহলে প্রত্যেকের সমাজে উৎপাদিত প্রতিটি বস্তুর উপর অধিকার থাকবে"।

এঁরা মনে করেন যে, এতদিন প্রতিটি সরকারের কাজ ছিল' মানুষের ন্যায্য পাওনা থেকে তা'কে বঞ্চিত করা ; অতএব, এঁদের মতে সরকারের কোনো প্রয়োজন নেই।

গান্ধীর ভাষায়, "শেষ পর্যন্ত আমরা কী অবস্থায় পৌঁছাইতে চাহিতেছি, তাহার একটি সুনির্দিষ্ট এবং স্পষ্ট বর্ণনার উপর তোমরা জোর দিয়াছ। গন্তব্যস্থল একবার নিরূপণ করিয়া বারংবার তাহার পুনরাবৃত্তির বেশী প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া আমি মনে করি না। লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাইবার উপায়গুলি যদি আমরা না জানি এবং সেই উপায়কে যদি আমরা কার্যে সার্থক করিতে চেষ্টা না করি, তাহা হইলে কেবল লক্ষ্যের সংজ্ঞা হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমরা কিছুতেই তলায় পৌঁছাইতে পারিব না। আমি সেইজন্য উপায়ের উপরই অধিকতর জোর দিয়েছি এবং ঐ উপায়গুলি যাহাতে অধিকতর সার্থকভাবে ব্যবহৃত হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছি। আমার বিশ্বাস, উপায়গুলি সম্বন্ধে যদি আমরা সম্যকভাবে সচেতন হইতে পারি, তাহা হইলে আমরা অবশ্যই লক্ষ্যে পৌঁছাইতে সক্ষম

হইব। আমি মনে করি যে, উপায়ের নিষ্কলুষতার মাত্রা অনুযায়ী আমাদের লক্ষ্যাভিমুখী অগ্রগতি নির্ধারিত হইবে।

আপাতদৃষ্টিকে এই পথ অতি দীর্ঘ। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, এই পথই সর্বাপেক্ষা কম।

এমনকি সংখ্যাগরিষ্ঠের রায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারকেও নৈরাজ্যবাদীরা বিশ্বাস করেন না। তাঁরা মনে করেন যে কোনও রাষ্ট্রব্যবস্থা ক্ষতিকর এবং অপ্রয়োজনীয়—তা বর্তমান কালের কিংবা ভবিষ্যতের, তাতে বিশেষ কিছুই এসে যায় না।

৬.৪ নৈরাজ্যবাদী প্রত্যয়ের যুক্তি

এই ধরনের নৈরাজ্যবাদী প্রত্যয়-এর কারণ হিসেবে আমরা কিছু যুক্তি খাড়া করতে পারি, যেমন—

৬.৪.১ রাষ্ট্রকে অবিশ্বাস

সকলের অধিকারে যা থাকা উচিত হল, তাকে অন্যায়ভাবে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের সম্পত্তির করে রাখবার পেছনে যার সব চাইতে বড় অবদান সে হল রাষ্ট্র। এইজন্যই কায়েমী স্বার্থের 'ঘুঘুর বাসা' ভাঙ্গাতে রাষ্ট্রকে নিয়োগ করা চলবে না, কারণ রাষ্ট্র-ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রযন্ত্র কোনও অর্থেই নিরপেক্ষ কোনও বাস্তবতা নয়। ধনতন্ত্র এবং ব্যক্তিগত মালিকানার আওতায় থাকা সম্পদ—এদের ধ্বংস করবার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন রাষ্ট্রের বিনাশ সাধন। রাষ্ট্রের মাধ্যমে সমাজ পুনর্গঠনের কিছু কিছু সমাজবাদী প্রয়াসকে এঁরা অসম্ভব বলে মনে করেন।

এজন্যই নৈরাজ্যবাদীরা সরকারের কর্মকাণ্ডের আর কোনও ধরনের প্রসারণ সমর্থন করেন না, তা সে যতই আপাতদৃষ্টিতে জনস্বার্থের জন্য হোক না কেন। এঁরা খেটে খাওয়া মানুষের রাজনৈতিক দলে যোগদান অথবা জাতীয় আইনসভায় নির্বাচন—কোনটারই পক্ষে ন'ন।

৬.৪.২ 'প্রতিনিধিত্বমূলক' সরকারের ফাঁকি ও অসারতা

নৈরাজ্যবাদীরা কোনও ধরনের রাষ্ট্রিক পুনর্গঠনেরও বিপক্ষে। রাষ্ট্র যদি প্রকাশ্যভাবেই স্বৈরাচারী না হয়ে ওঠে, তা হলে তাকে শাসন চালাতে হবে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের মাধ্যমে। কিন্তু, কোনও মানুষ একটি গোষ্ঠী দূরের কথা, অন্য একটি মানুষের সঠিকভাবে প্রতিনিধিত্ব করতে অক্ষম।

মনুষ্য চরিত্র ও প্রয়োজন সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাবই এই ধরনের অবস্থার জন্য মূলত দায়ী। প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার থেকে অতএব জন্ম নেয় রাজনীতির পেশাদার কারবারীরা। এরা কিন্তু সবাই অযোগ্য। নৈরাজ্যবাদ তাই এখানে কিছুটা বিস্ময়করভাবেই সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের প্রয়োজনীয়তার কথা বলে।

সকলের ইচ্ছা বা common will-এর ধারণাটিকে নৈরাজ্যবাদীরা সমর্থন করেন না। তাঁরা মনে করেন, প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার অপ্রয়োজনীয় এবং প্রকৃত অর্থে 'অপ্রতিনিধিত্বমূলক'।

ক্রোপট্‌কিন লিখেছেন যে, 'রাষ্ট্র যদি সকল প্রকার সামাজিক ক্রিয়াকলাপ গ্রাস করিতে আরম্ভ করে তাহা হইলে অসংযত শাসনে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের উৎপত্তির পথ সুগম হইবে। রাষ্ট্রের নিকট বাধ্যবাধকতার সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের পারস্পরিক সহানুভূতিবোধ অবশ্যই কমিয়া যাইবে।'

লেনিন আমাদের বারবার মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, 'সর্বহারার একনায়কত্ব' কোনোও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

নয়। সমাজ বিকাশের ঐতিহাসিক নিয়ম মেনেই পুঁজিবাদী সমাজের ধ্বংসের পরবর্তী সময়ে এই ধরনের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় এবং আবার সমাজতন্ত্র থেকে সাম্যবাদে মানব ইতিহাসের উত্তরণ ঘটে গেলে এই ধাঁচের একনায়কত্ব সম্পূর্ণভাবেই লোপ পাবে। অর্থাৎ. সমাজ বিকাশের একটি সুনির্দিষ্ট এবং সংক্ষিপ্ত পর্যায়েই এই ধরনের একনায়কত্ব দেখা যায়।

৬.৪.৩ ক্ষমতার ফলাফল

অন্য মানুষের ওপর ক্ষমতা প্রয়োগ সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষকেও দুর্নীতিগ্রস্ত করে তোলে। অতএব power corrupts, and absolute power corrupts absolutely এই নীতিতে বিশ্বাসী নৈরাজ্যবাদী তাত্ত্বিকেরা এই ধরনের ক্ষমতার অপব্যবহার আদৌ সমর্থন করেন না।

অন্যের ওপর ক্ষমতা প্রয়োগ করলে মানুষ স্বার্থপর, দাম্ভিক, শোষক, একগুঁয়ে এবং আত্মকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। একজন রাজনীতিবিদ তাঁর স্বভাবের জন্য মন্দ হন না—তিনি মন্দ হন তাঁর রাজনৈতিক অবস্থানের জন্য। কোনও মানুষ এবং গোষ্ঠীর হাতেই অতএব অন্য মানুষের ওপর কর্তৃত্ব ফলানোর জন্য সরকারী ক্ষমতা ন্যস্ত করা সমীচিন হবে না।

নৈরাজ্যবাদীরা ব্যক্তি মানুষকে অত্যন্ত অবিশ্বাস করেন। তাঁদের মতে, সরকারের অর্থ হ'ল বাধ্য করা, বিচ্ছিন্ন করা, নিপীড়ন, নির্যাতন ইত্যাদি এবং নৈরাজ্যের অর্থ দাঁড়ায় স্বাধীনতা, সংযুক্তি এবং ভালোবাসা। সরকার স্বার্থপরতা এবং ভীতির উপর স্থিত ; নৈরাজ্য ভ্রাতৃত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা রাষ্ট্র হিসেবে আলাদা, সেইজন্যই আমাদের অস্ত্র দরকার হয় ; আমরা আমাদের একে অপর হতে বিচ্ছিন্ন করেছি, সে জন্য আমাদের আইনের কাছে আশ্রয় নিতে হয়। গিন্সবার্গ তাঁর 'সাইকলজি অফ সোসাইটি' নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে, 'কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থায় মুষ্টিমেয় লোকের হাতে ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা সব সময়েই বর্তমান। কথিত হইয়াছে যে ক্রমশ রাষ্ট্রের বিলোপ ঘটিবে। কিন্তু সে অবস্থায় এক নূতন শক্তিশালী ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের সৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী। পুনর্গঠনের সকল প্রচেষ্টা প্রকৃত ফলপ্রসূ করিতে হইলে বিকেন্দ্রীকরণের পথেই তাহা করিতে হইবে।'

৬.৪.৪ রাষ্ট্র কেন অপ্রয়োজনীয়

নৈরাজ্যবাদী তাত্ত্বিকেরা এ প্রসঙ্গে কিছু উদাহরণ দিয়েছেন। যথা ঃ শিক্ষা প্রসারের জন্য রাষ্ট্রের প্রয়োজন হয় না। বৈদেশিক আগ্রাসন ঠেকানোর জন্যও রাষ্ট্রের প্রয়োজন অনুভূত হয় না। ক্রোপট্‌কিন বলেছেন যে, স্থায়ী সৈন্যবাহিনী নয়, এই ধরনের আক্রমণ ঠেকিয়েছে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ ; ইতিহাস এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

ব্যক্তিমানুষকে সুরক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রেও রাষ্ট্র ব্যর্থ হয়েছে ; রাষ্ট্র বরঞ্চ অপরাধী সৃষ্টি করে থাকে, রাষ্ট্র নিজের অর্থনৈতিক শোষণের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে বাধ্য করে অপরাধ করতে। তারপর, রাষ্ট্র সেই অপরাধীকে শাস্তি দেয়, এবং তার পক্ষে ভবিষ্যতে সুস্থ, স্বাভাবিক এবং সৎজীবনের প্রত্যাবর্তনের যাবতীয় পথ বন্ধ করে দেয়।

যে সকল ক্ষেত্রে মানুষ আপন উৎকর্ষের সাধনার শীর্ষে পৌঁছেছে সে সব জায়গায় সহযোগিতা এবং স্বেচ্ছা কর্মকাণ্ডের সুযোগ ছিল গোষ্ঠী জীবনের দ্বারা।

এইসব সৃজনশীল ক্ষেত্রে কিন্তু রাষ্ট্রকে দরকার পড়েনি মানুষের।

৬.৪.৫ মুক্ত সমাজ

উল্লিখিত কারণসমূহের জন্যই মানুষের দরকার এমন একটি মুক্ত সমাজ যা রাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে যাবে। এই সমাজ জীবনের নিয়ন্ত্রক হিসেবে মানুষকে গোষ্ঠী জীবনের উপযোগিতার মূল্যের ওপরে নির্ভর করে থাকতে হবে।

জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রের জন্য কিছু গোষ্ঠী থাকবে যা সহযোগিতার ভিত্তিতে গঠিত হবে। এরা স্বায়ত্তশাসিত হবে, নিজেদের নীতি এবং কর্মসূচী নিজেরাই নির্ধারণ করবে এবং সদস্যরা নিজেরাই নির্বাচন করবে অথবা সরিয়ে দেবে। জীবনের প্রতিটি এলাকায় শান্তি এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে, কিন্তু কোথাও এবং কখনই জোর-জবরদস্তি, নিপীড়ন অথবা নিবর্তনমূলক অত্যাচার অথবা ভীতি প্রদর্শন করা চলবে না। ডিকিন্‌সন্‌-এর মতে, নৈরাজ্য শৃঙ্খলার অবসান নয় ; ক্ষমতা প্রদর্শনের অবসান। গান্ধীর 'স্বরাজ' সম্বন্ধে ধারণা এই প্রসঙ্গে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

অম্লান দত্ত লিখেছেন, 'গোষ্ঠী এবং শ্রেণীর স্বার্থের দ্বন্দ্বকে অবলম্বন করে গঠিত হয়েছে সংসদীয় গণতন্ত্রের ব্যবহার ও বিধান। তারই ফলশ্রুতি দলীয় রাজনীতি। কিন্তু, পরিবার যেমন রাজনীতি দিয়ে চালিত হয় না. আদর্শ গ্রামেরও ভিত্তিভূমি হতে পারে না দলীয়তা। অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চাই—সত্যাগ্রহের পথে। বহুদলীয় ব্যবস্থা নয়, একদলীয় রাজনীতিও নয়, গান্ধীর মতাদর্শের সঙ্গে মেলে নির্দলীয় 'লোকনীতি'। গ্রামসমাজের যেটা আদর্শরূপ—জাতিভেদ ও শ্রেণীবিরোধ থেকে মুক্ত, আত্মীয়-ও-বান্ধব সমাজ—তাকে সৃষ্টি করা যাবে না ; বৃহত্তর মানব সমাজের ভিত্তিতে তাকে সংস্থাপন করা সম্ভব হবে না দলীয়তার পথে। সত্যাগ্রহীর শেষ অবলম্বন নয় কোনও বিশেষ দল। তাঁর অন্তিম আনুগত্য নিবদ্ধ নিজস্ব বিবেকে এবং মানুষের প্রতি বিশ্বাসে।

এইখানে গান্ধী সংসদীয় গণতন্ত্রকে অতিক্রম করে গেলেন। রেখে গেলেন ভবিষ্যতের সমাজের অন্য এক চিত্র। ভবিষ্যতের মানুষকে ডাক দিয়ে গেলেন, অন্য এক পথে। এটাই গান্ধীমার্গ। আজকের রাজনীতিবিদ্ বলবেন অসম্ভব, এ অসম্ভব। গান্ধী বলবেন, এ ছাড়া সমাজের মুক্তি অসম্ভব।'

একটি নৈরাজ্যবাদী সমাজ ব্যবস্থায় মৈত্রী এবং শান্তি-সহযোগিতা স্থাপিত হবে। 'সকলের জন্য সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।'

এই সমাজ কিন্তু গতিশীল, কোন বদ্ধ জলাশয়ের মতন নয়। সমাজের স্থিতির প্রত্যেক মুহূর্তে পরিবর্তন-এর প্রয়োজন দেখা দেবে। এই স্থিতি বজায় রাখা কোনও স্বার্থবাহী রাষ্ট্রের অবর্তমানে একটি সহজ কাজ হবে। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসমূহ এবং তাঁদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেবে।

৬.৫ গান্ধী কী নৈরাজ্যবাদী ছিলেন?

গান্ধীর নৈরাজ্যবাদ-এর ধারণা সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মতামত আছে। গোপীনাথ ধাওয়ান, বিনয়কুমার সরকার, নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য, অতীন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ গান্ধীকে দার্শনিক নৈরাজ্যবাদী বা Philosophical anarchist রূপে অভিহিত করেছেন।

ধাওয়ান মনে করেন যে, গান্ধী সকলের সর্বাধিক কল্যাণ সাধন অথবা the greatest good of all কামনা করেছিলেন। শুধুমাত্র অহিংস স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রাম-জীবনের ভিত্তিতে শ্রেণীহীন-রাষ্ট্রহীন গণতন্ত্রের নির্মাণ সম্ভবপর বলে তিনি বিশ্বাস করতেন।

বিনয় সরকার লিখেছেন যে, গান্ধীর সাথে টলস্টয়-এর বক্তব্যের প্রভূত মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁরা দুজনেই রাষ্ট্রযন্ত্রের সমালোচনা করেছেন এবং অহিংসার নীতিকে সমর্থন জানিয়েছেন।

কিন্তু জর্জ উডকক্-এর সিদ্ধান্ত হ'ল এই যে, গান্ধী ছিলেন একজন ধর্মীয় নৈরাজ্যবাদী বা religious anarchist ; আবার ফিলিপ স্প্র্যাট, বিমানবাহিনী মজুমদার, পল পাওয়ার ইত্যাদি গান্ধীকে নৈরাজ্যবাদী হিসেবে দেখেন না।

বিমানবিহারী মজুমদার-এর মতে, গান্ধি রাষ্ট্রের কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার সমালোচক হওয়া সত্ত্বেও কখনই তিনি রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ধ্বংস করার কথা বলেননি।

পাওয়ার-ও এই রকমই মনে করেছেন। বুদ্ধদেব ভট্টচার্যের মতে, গান্ধীর একটি আদর্শবাদী দার্শনিক সত্তা ছিল। এবং অন্য সত্তাটি ছিল একজন দায়িত্বশীল রাজনৈতিক তাত্ত্বিকের। তিনি এজন্য জ্ঞানদীপ্ত নৈরাজ্যবাদের পাশাপাশি চিন্তা করতেন এবং স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা।

নৈরাজ্যবাদ চেয়েছিল এমন একটি সমাজ ব্যবস্থা গঠন করতে, যেখানে মানুষ তার সমস্ত সৃজনশীলতা সহকারে এক নতুন সভ্যতা গড়বার কাজে নিজেকে নিয়োগ করবে।

ক্রোপট্‌কিন কিংবা গান্ধী এঁদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল তাঁদের সমসাময়িক সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক সমস্যা এবং জটিলতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একটি বিকল্প সমাজ-ব্যবস্থার সন্ধান দেওয়া।

তাত্ত্বিক স্তরে এঁরা যে সফল হয়েছিলেন তা বলবার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু theory এবং praxis এর যে নিরন্তর dialectic, তার টানাপোড়েনের আবর্তের মাঝখানে আজ আমাদের এঁদের চিন্তাভাবনা আবার নতুন বিশ্লেষণের আলোকে যাচাই করে দেখতে হবে।

হয়তো রাষ্ট্রের প্রকৃত অর্থে কোনও বিকল্প নেই, কিন্তু নৈরাজ্যবাদী যে রাষ্ট্র-ব্যবস্থার চরিত্র সম্বন্ধে আমাদের আবার নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছিল, এখানেই তার সার্থকতা।

৬.৬ অনুশীলনী

(১) একটি তাৎপর্যপূর্ণ রাজনৈতিক মতবাদ হিসেবে নৈরাজ্যবাদ-এর বিশ্লেষণ করুন।

(২) রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নৈরাজ্যবাদীদের কি কি প্রধান যুক্তি আছে?

(৩) গান্ধী কি নৈরাজ্যবাদী ছিলেন? যুক্তি সহকারে আলোচনা করুন।

৬.৭ গ্রন্থপঞ্জী

1. Woodcock G. : Anarchism.
2. Wilson Charlotte : Anarchism.
3. Joad C. E. M. : Introduction to Modern Political Theory (1924).
4. Basu Atindranath : Anarchism.
5. বসু অতীন্দ্রনাথ ঃ নৈরাজ্যবাদ

নির্বাচন সংক্রান্ত বিচার বিবেচনা, ব্যবসায়ী গোষ্ঠী, শ্রমিক সংগঠন, ধর্মীয় সংগঠন প্রভৃতি ক্ষমতাসম্পন্ন চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলির সহযোগিতা। কোন কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সামরিক বাহিনীর আনুগত্যও এ ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। কোন শাসক প্রধানই বাঁধাধরা ছক অনুযায়ী সমগ্র প্রশাসন কাঠামোর উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারেন না। রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সাথে তাঁকে প্রয়োজন মত সামঞ্জস্য বিধান করে চলতে হয়।

১০.৩.৪ শাসন বিভাগের শ্রেণী বিভাজন

রাজনৈতিক শাসন কর্তৃপক্ষকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায় : (১) সর্বস্ব শাসক ও প্রকৃত শাসক; (২) একক-পরিচালক ও বহু পরিচালক শাসন বিভাগ এবং (৩) উত্তরাধিকার সূত্রে মনোনীত শাসক ও নির্বাচিত শাসক।

সংবিধান অনুযায়ী দেশের সকল প্রশাসনিক ক্ষমতা একজন শাসক প্রধানের হাতে থাকে। তত্ত্বগতভাবে তিনি সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় তাঁর নামে শাসন কার্য পরিচালিত হয়। তাঁর ক্ষমতা কিছু আনুষ্ঠানিক কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এই ধরনের শাসক প্রধানকে নামসর্বস্ব শাসক বলা হয় (Nominal or Titular Executive)। বাস্তবে যিনি বা যাঁরা প্রকৃত ক্ষমতা ভোগ করেন তাঁদের প্রকৃত শাসন (Real Executive) বলা হয়। প্রকৃত পক্ষে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় এই ধরনের পার্থক্য দেখা যায়।

একক-পরিচালিত শাসন ব্যবস্থায় ক্ষমতা বিশেষ কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে এবং তাঁর নির্দেশ ও নেতৃত্বে সমস্ত কাজ সম্পাদিত হয়। ইতিহাসে চরম রাজতন্ত্র একক-পরিচালক শাসন ব্যবস্থার দৃষ্টান্ত হিসেবে গণ্য হয়। জার্মানীতে নাৎসী দলের হিট্‌লার, ইতালী ফ্যাসিস্ট দলের মুসোলিনীর শাসন একক-পরিচালিত শাসন ব্যবস্থার (Single Executive) জনপ্রিয় উদাহরণ।

বহু-পরিচালক শাসন ব্যবস্থায় শাসন বিভাগী ক্ষমতার প্রয়োগ যখন একাধিক ব্যক্তি নিয়ে গঠিত কোন সংস্থার হাতে অর্পিত থাকে তখন তাকে বহু পরিচালিত শাসন বিভাগ (Plural Executive) বা সমষ্টিগত শাসন বিভাগ (Collective Executive) বলা হয়। বর্তমানে সুইজারল্যান্ডে এই ধরনের বহু পরিচালিত শাসন ব্যবস্থা দেখা যায়।

আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভবের আগে শাসকগণ উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতা লাভ করতেন। ব্রিটেনের রাজা বা রাণী উত্তরাধিকার সূত্রে মনোনীত হন। কিন্তু, রাজা বা রাণীর ভূমিকা নামসর্বস্ব শাসক প্রধানের। প্রকৃত ক্ষমতা ভোগ করেন প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রী পরিষদ। জাপানেও উত্তরাধিকার সূত্রে মনোনীত শাসকের দৃষ্টান্ত আছে।

বর্তমানে পৃথিবীর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে শাসক প্রধান, হয় প্রত্যক্ষভাবে নয় পরোক্ষভাবে জনগণ দ্বারা নির্বাচিত হন। এই ভাবে ক্ষমতাশীন শাসককে নির্বাচিত শাসক বলা হয়।

১০.৩.৫ শাসন বিভাগের কার্যাবলী

জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে সরকারের কার্যাবলীর পরিমাণ অভূতপূর্বভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন মানুষের জীবনের ক্ষুদ্রতম চাহিদাও রাষ্ট্র পূরণ করতে সক্ষম। তার ফলে, শাসন বিভাগের কার্যাবলী অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ইতিপূর্বে আমরা শাসন বিভাগের কাজের মধ্যে আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, পররাষ্ট্র সংক্রান্ত কাজ, প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত কাজ ও আইন সংক্রান্ত কাজের কথা উল্লেখ করেছি। শাসন বিভাগের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিচার সংক্রান্ত

একক—১১ ❐ বিচার বিভাগ

গঠন

১১.০ উদ্দেশ্য

১১.১ প্রস্তাবনা

১১.২ আদালত ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়া

১১.৩ আইনের প্রকৃতি ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়া

১১.৪ আইনের কাঠামো ও বিচারপতিদের নিয়োগ

১১.৪.১ বিচার বিভাগের কার্যাবলী

১১.৫ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা

১১.৬ বিচার বিভাগের নিয়ন্ত্রণ

১১.৭ সারাংশ

১১.৮ উত্তরসংকেত

১১.০ উদ্দেশ্য

মানুষের অধিকার সুনিশ্চিত ও সংরক্ষিত করতে, অপরাধীর শাস্তি বিধান করতে, অন্যায়ের হাত থেকে নিরীহ মানুষকে রক্ষা করতে রাষ্ট্রকে একটি পৃথক বিভাগ গড়তে হয়েছিল। সৃষ্টি হয়েছিল বিচারব্যবস্থার। এই এককটি পড়লে আপনারা জানতে পারবেন—

- আদালত রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার একটি অংশ কিভাবে হয়
- আইনের প্রকৃতি ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়া কিভাবে পরস্পর সম্পৃক্ত
- আইনের কাঠামো কিভাবে তৈরী হয়
- বিচারপতিদের নিয়োগ, কার্যাবলী, ও নিয়ন্ত্রণ কিভাবে সম্পাদিত হয়
- বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা কিভাবে রক্ষিত হয়

১১.১ প্রস্তাবনা

ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের জন্য মানুষের কতগুলি অধিকার প্রয়োজন। এই অধিকারগুলি রাষ্ট্র আইনের মাধ্যমে স্বীকার ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। নাগরিক অধিকার সংরক্ষণের দায়িত্ব মূলত বিচার বিভাগই সম্পাদন করে। আইনের ব্যাখ্যা, বিরোধের মীমাংসা, অধিকারগুলি বাস্তবে কার্যকর করা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ বিচার বিভাগকেই করতে হয়। প্রকৃত পক্ষে বিচার বিভাগ ছাড়া রাষ্ট্রের অস্তিত্বের কথা কল্পনাও করা যায় না।

বিচার বিভাগ আধুনিক শাসনব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। সরকারের সঙ্গে ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির কিংবা অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সাথে ব্যক্তির যে সমস্ত বিরোধের উৎপত্তি হয় তার ন্যায়-সঙ্গত মীমাংসার জন্য বিচারবিভাগের প্রয়োজন অনিবার্য। স্বাধীনতা, সাম্য ও নাগরিক অধিকার প্রভৃতি রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজন একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা। প্রকৃতপক্ষে, আধুনিক রাষ্ট্রের ঔৎকর্ষ অনেকখানি নির্ভর করে নির্ভীক ও নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থার উপর। তাই রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে বিচার ব্যবস্থা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। রাজনৈতিক দিক বিচার বিভাগ নিরপেক্ষ হ'তে পারে না, কেননা, বিচার ব্যবস্থার কাঠামো, পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য ও রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারিত হয়ে থাকে। সেই কারণে, বিচার ব্যবস্থা নির্দিষ্ট ধরনের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতীক হিসেবে কাজ করে। অধ্যাপক বলের মতে, বিচারপতি ও আদালত হ'ল সামগ্রিকভাবে প্রচলিত রাজনৈতিক পদ্ধতির একটি অংশ-বিশেষ। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতার উপর আদৌ গুরুত্ব আরোপ করা হয় না।

অনুশীলনী—১

বিচার বিভাগ কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে বিরোধের মীমাংসা করে?

১১.২ আদালত ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়া

রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সাথে বিচার বিভাগের সম্পর্কের বিষয়টিকে ঘিরে পরস্পরবিরোধী মতামত লক্ষ্য করা যায়। এ প্রসঙ্গে একটি দৃষ্টিভঙ্গী হ'ল ঃ বিচার বিভাগের সাথে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার কোন সম্পর্ক নেই। রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও বিচার বিভাগের মধ্যে পরিপূর্ণ স্বাতন্ত্র্য থাকে। এই সাবেকি ধারণা সাধারণত উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় চালু থাকে। কিন্তু, এ সম্পর্কে বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গী হ'ল বিচারব্যবস্থা ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়া পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। উভয়ের মধ্যে নিরন্তর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া (Interaction) চলে। প্রচলিত রাজনৈতিক প্রক্রিয়া থেকে বিচার বিভাগ বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না।

অধ্যাপক অ্যালান বলের মতে, আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রশাসনিক আদালত ও প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল (Administrative courts and administrative tribunals)-এর সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় কাঠামোর মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখা অস্পষ্ট হচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের উল্লেখ করা যেতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সুপ্রীম কোর্ট নিছক একটি আইনী প্রতিষ্ঠান নয় ; কার্যক্ষেত্রে এটি একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানও বটে। জাতীয় নীতির বিভিন্ন বিতর্কিত প্রশ্নে মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। নাগরিক অধিকার, রাষ্ট্রপতি, কংগ্রেস প্রভৃতি সম্পর্কিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রশ্নে মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তবে অধ্যাপক বল একথাও বলেছেন যে, মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের মত রাজনৈতিক স্বাধীনতা অন্য সমস্ত আদালতের নেই।

বিচার ব্যবস্থা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ারই অংশ বিশেষ। অধ্যাপক বল এ ক্ষেত্রে দু'টি মূল বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। (১) সাধারণত, উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অসীম শক্তিশালী রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ থেকে নাগরিকদের নিরাপত্তা রক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। অধ্যাপক বল অবশ্য এ ধরনের

ধারণাকে আধা-অলীক (Semi fiction) বলে উল্লেখ করেছেন। এই ধারণা বহু রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থায়িত্বের প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করেছেন। সেই কারণে উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রশাসনিক আদালত ও আধা-বিচার বিভাগীয় প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের প্রসারে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়। (২) আবার, এই কারণে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির উপর জোর দেওয়া হয় ; কেননা সরকারের হাতে মাত্রাতিরিক্ত রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং অতি গণতন্ত্র বা সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় না।

অনুশীলনী—২

বর্তমানে প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় কাঠামোর মধ্যে সীমারেখা কেন অস্পষ্ট হচ্ছে?

১১.৩ আইনের প্রকৃতি ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়া

রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আইন নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। একই রকমভাবে আইনের প্রকৃতিগত পরিবর্তন রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং স্বৈরতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় আইনের প্রকৃতি এবং আইনের কাঠামো এক ধরনের হয় না।

অ্যালান বল উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আইনের পরিকাঠামোর কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন, যেমন, নিরপেক্ষতা, সামঞ্জস্যতা, খোলামেলা প্রকৃতি, অনুমান যোগ্যতা ও স্থায়িত্ব। এই ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিচারকার্য সর্বসমক্ষে সম্পাদিত হয়। এখানে আইনের পদ্ধতি হ'ল অবাধ, উন্মুক্ত, সকলের কাছে অবহিত এবং আইনের পদ্ধতি একটি নির্দিষ্ট ধারায় পরিচালিত হয়। একেই অনেক সময় আইনের অনুশাসন বলে।

উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আইন ও বিচার ব্যবস্থায় যে সমস্ত উপাদানের কথা বলা হয়েছে, সেগুলি সব সময় কার্যকর হয় না। যুদ্ধ বা আভ্যন্তরীণ গোলযোগজনিত কারণে জরুরী অবস্থায় সরকারকে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়। তার ফলে, জরুরী অবস্থায় সরকার স্বাভাবিক বিচার বিভাগীয় পদ্ধতিকে স্থগিত রাখে। আবার, অনেক সময় স্বাভাবিক অবস্থাতেও আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার কারণে পুলিশকে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়। সুতরাং সমাজতান্ত্রিক, উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ও স্বৈরতান্ত্রিক প্রভৃতি সকল রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেই আইন ব্যবস্থা রাজনৈতিক মূল্যবোধ নিরপেক্ষ নয়। সেই কারণে অধ্যাপক বল বলেছেন যে, কেবলমাত্র মতাদর্শগত ভিত্তিতে বিভিন্ন আইনের ব্যবস্থার মধ্যে শ্রেণী বিভাজন করা কষ্টকর।

১১.৪ আইনের কাঠামো ও বিচারপতিদের নিয়োগ

অ্যালান বল আইনের কাঠামো ও বিচারপতিদের নিয়োগের বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, বিভিন্ন কারণে আইনের কাঠামোর মধ্যে ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রীয় ও প্রাদেশিক স্তরে যথাক্রমে যুক্তরাষ্ট্রীয় ও প্রাদেশিক আইন নিষ্পত্তির জন্য দু'টি পৃথক আদালত ব্যবস্থার প্রয়োজন নির্দেশ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলিতে রাজ্য আদালতের সাথে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের শাখাও আছে। মার্কিন বিচার ব্যবস্থার শীর্ষে রয়েছে সুপ্রীম কোর্ট।

আইনের কাঠামোর ভিন্নতার অন্য একটি কারণ হল বিশেষীকরণ (Specialisation) নীতির প্রয়োগ। জার্মানীতে দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচারের জন্য রয়েছে পৃথক আদালত ; রয়েছে বিশেষ প্রশাসনিক ও সাংবিধানিক আদালত। ব্রিটেনে পৃথক সাংবিধানিক ও প্রশাসনিক আদালত নেই, কিন্তু ফ্রান্সের মতে নীচের স্তরে পৃথক ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালত আছে। এখানে লর্ডসভা সর্বোচ্চ আপীল আদালত হিসেবে কাজ করে। প্রিভি কাউন্সিলের বিচার বিষয় কমিটি (The Judicial Committee of the Privy Council) কমনওয়েলথভুক্ত কোন কোন দেশের আপীল আদালত হিসেবে ভূমিকা পালন করে থাকে।

আদালতের দায়িত্ব বা কার্যাবলীর সাথে আইনী ব্যবস্থার কাঠামো সম্পর্কিত। যেমন, কোথাও কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজনে, আবার কোথাও প্রশাসনিক বা পৌর অধিকার সংরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে আদালতের ব্যবহার করা হয়।

আদালতের ব্যাপক কাজের সঙ্গে যে বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্য বহন করে তা হ'ল বিচারকদের নিয়োগের পদ্ধতি। বিচারকদের বিচক্ষণতা, দৃষ্টিভঙ্গী, দক্ষতা প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করে তাঁদের নিয়োগ করা হয়। সরকার বিচারপতিদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিযুক্ত করে। কোন কোন ক্ষেত্রে বিচারকদের সহযোজন (Cooption)-এর নিয়ম চালু আছে।

বিচারকদের আইনগত প্রশিক্ষণ এবং যোগ্যতার মধ্যেও তারতম্য আছে। পশ্চিম জার্মানী ও ফ্রান্সে বিচারকদের একটি ক্রমোচ্চ পেশাগত কাঠামো আছে। দুই দেশেই বিচারকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের ডিগ্রীলাভ করার পর সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ব্রিটেনে যেমন ব্যারিষ্টারদের মধ্য থেকে বিচারক নিয়োগের প্রথা আছে এ সব দেশে তেমন নিয়ম নেই। জীবনের শুরুতেই বিচারকার্যকে পেশা হিসেবে পছন্দ করাই এদেশের রীতি। বিচারকদের কাজের স্থায়িত্বের নিরাপত্তাও এখানে আছে। এখানে বিচারকরা প্রধানত উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকেই আসেন। দু'টি দেশেই বিচারকরা প্রশাসনিক কর্মচারীদের মতই একটি ঐতিহ্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং রাষ্ট্রের কাজে নিজেদের উৎসর্গ করার মানসিকতার দ্বারা এঁরা পরিচালিত হন।

ব্রিটেনের বিচারকরা রক্ষণশীল এবং এঁদের স্থায়িত্বের নিরাপত্তাও লক্ষ্য করা যায়। উচ্চ আদালতের বিচারকরা এখানে অসৎ আচরণের কারণে পার্লামেন্টের উভয়কক্ষের মাধ্যমে পদচ্যুত হন। প্রশিক্ষণ, নিয়োগের পদ্ধতি, বিচারকদের পদের প্রতি শ্রদ্ধা ও মর্যাদা—সব কিছু মিলে ব্রিটেনে বিচারকেরা রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থায়িত্বের এক শক্তি হিসেবেই চিহ্নিত হন বলে অধ্যাপক অ্যালান বল মনে করেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সেনেটের সম্মতিক্রমে রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের মনোনীত করেন এবং এক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনাই অধিক গুরুত্ব লাভ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিরা বিশেষ নীতির প্রশ্নে বিতর্ক বা বিরোধিতা করেন, রাষ্ট্রব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করেন না। এই দেশে বিচারপতি নিয়োগের শ্রেণীগত অবস্থান গুরুত্ব পায়। প্রায় ৮৮ শতাংশ বিচারপতি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ইউরোপীয় জাতিগোষ্ঠীগুলি থেকে আসেন। এঁরা প্রধানত উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত। শ্রেণীগত বা রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব থাকা সত্ত্বেও তাঁরা যথেষ্ট উদারভাবাপন্ন।

অ্যালান বল-এঁর মতে, বিচারকদের পদের নিরাপত্তা সরকার বা নির্বাচকমণ্ডলীর চাপের হাত থেকে তাঁদের মুক্ত রাখবে বা তাঁদের স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখবে—একথা সব সময়ে ঠিক নয় ; তবে, বিষয়টি রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার পক্ষে প্রয়োজনীয়। রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ক্ষমতাশালী শ্রেণীর কর্তৃত্বকে শক্তিশালী করতে বিষয়টি

বিচার বিভাগকে সাহায্য করতে পারে। সমস্ত স্থিতিশীল রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এই প্রবণতা দেখা যায়। বিচার ব্যবস্থার উপর হস্তক্ষেপ করার কারণেই বিভিন্ন বিকাশশীল রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অস্থায়িত্ব দেখা গেছে।

১১.৪.১ বিচার বিভাগের কার্যাবলী

যে কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিচার বিভাগের কাজকর্মের পরিধি বিশেষীকরণের মাত্রার (degree of specialisation) উপর নির্ভর করে। বস্তুত, বিচার বিভাগের কার্যাবলী রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। অধ্যাপক বল বিচার বিভাগের চারটি নির্দিষ্ট কাজের কথা বলেছেন—(১) বিচার বিভাগীয় সমীক্ষা ও সংবিধানের ব্যাখ্যা ; (২) রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মধ্যস্থতা ; (৩) প্রচলিত ব্যবস্থাকে সমর্থন যোগানো এবং (৪) ব্যক্তির অধিকার সংরক্ষণ।

বিচার বিভাগীয় সমীক্ষা (Judicial Review) আদালতের একটি বড় দায়িত্ব। এই ক্ষমতার ফলে বিচার বিভাগ যে কোন আইন ও সরকারী সিদ্ধান্তকে বাতিল করে দিতে পারে। আইন বিভাগ যদি এমন আইন তৈরী বা শাসন বিভাগ এমন কোন আদেশ জারী করে সংবিধান বিরোধী, তা হলে সেই আইনকে বাতিল করার যে ক্ষমতা বিচার বিভাগের হাতে আছে তাকে বিচার বিভাগীয় সমীক্ষার অধিকার (Power of Judicial Review) বলে। এই বিশেষ ক্ষমতার বলেই বিচার বিভাগ সংবিধানের রক্ষক ও ব্যাখ্যাকর্তা হিসেবে কাজ করে। সংবিধান ব্যাখ্যার মাধ্যমে বিচার বিভাগ কোন আইনের বৈধতাও বিচার করতে পারে। কোন মামলার সাথে আইনের ব্যাখ্যা যুক্ত থাকলে আইনের প্রকৃতি প্রসঙ্গে আদালত তার অভিমত ব্যক্ত করতে পারে। আইনের বৈধতা বিষয়ে প্রশ্ন উঠলে আদালত আইনের বৈধতা বিচার করে থাকে। আদালত আইনের বৈধতা বিচারের মাধ্যমে বিচার্য আইনকে অ-সাংবিধানিক বলে ঘোষণা করতে পারে। আদালতের এই সংবিধান ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। কেননা ব্যাখ্যার মাধ্যমে সংবিধানের অনমনীয়তাকে দূর করে আদালত এবং এইভাবেই পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির সাথে সংবিধানের সামঞ্জস্য বিধান করে।

বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিচার বিভাগ বিভিন্ন রকম বিরোধের মীমাংসা করে থাকে। সাংবিধানিক উপায়ে বা সংবিধান ব্যাখ্যার মাধ্যমে বিচার বিভাগই এই সমস্ত বিরোধের মীমাংসা করে। সরকারের অন্য দুটি বিভাগ শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের মধ্যে সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। আবার যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের মধ্যেও বিরোধের সৃষ্টি হতে পারে। সাংবিধানিক আদালত এই বিরোধের মীমাংসা করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্ট কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। তবে, মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের এই ভূমিকা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে, এ প্রসঙ্গে মাককুলক বনাম ম্যারিল্যাণ্ড [McCulloch Vs. Maryland (1821)] মামলায় সুপ্রীম কোর্টের রায়ের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। অ্যালান বল বলেন যে, এ কথা সত্যি নয় যে, সাংবিধানিক আদালতের সিদ্ধান্ত সব সময় কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতাকে সম্প্রসারিত করেছে। আবার এই ধারণাও ঠিক নয় যে, শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের মধ্যে দ্বন্দ্বে সাংবিধানিক আদালত শাসন বিভাগের অনুকূলে রায় দেয়। অধ্যাপক বলের মতে, বিংশ শতাব্দীতে শক্তিশালী ও জটিল ক্ষমতা জাতীয় সরকারের হাতে তুলে দেবার যে আন্দোলন হয়েছে, সাংবিধানিক আদালত রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অঙ্গ হিসেবে সেই আন্দোলনে নিজেকে যুক্ত করেছে। এই ভাবেই একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে সাংবিধানিক আদালত নিজের ভূমিকাকে প্রতিষ্ঠিত করতে

পেরেছে। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি হল প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা রক্ষা ও সমর্থনের কাজ। প্রচলিত ব্যবস্থার সমর্থন যোগানোর বিষয়টি নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থার রাজনৈতিক সংস্কৃতির উপর। রাজনৈতিক ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিচার বিভাগের অন্যতম কর্তব্য হল প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সংরক্ষণ করা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী ও ভারতবর্ষের বিচার বিভাগ সংবিধানের ব্যাখ্যার মাধ্যমে সাধারণত, কেন্দ্রীয় সরকারের হাত শক্তিশালী করেছে। অনেক সময় সরকারী নীতি ও কার্যাবলীর উপর বৈধতার চিহ্ন দিয়ে বিচার বিভাগ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করে।

সমস্ত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিচার বিভাগ নাগরিক অধিকারের রক্ষাকর্তা হিসেবে কাজ করে। আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের অনাবশ্যক হস্তক্ষেপ থেকে বিচার বিভাগ জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। যে দেশে লিখিত সংবিধান আছে সেখানে আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগকে সংবিধানের গণ্ডীর মধ্যে থেকে কাজ করতে হয়। সরকার যদি সংবিধানে লিপিবদ্ধ নাগরিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করে তাহলে বিচার বিভাগ সেই অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠার কাজে সাহায্য করতে পারে। উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাংবিধানিক আদালত শক্তিশালী সরকারের স্বৈরাচারী হস্তক্ষেপ থেকে নাগরিক অধিকারকে সংরক্ষণ করতে পারে। ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের আদালত এই উদ্দেশ্যে আদেশ-নির্দেশ বা লেখ (Writ) জারী করতে পারে।

উপরোক্ত চারটি মূল ক্ষেত্রের বাইরেও সাংবিধানিক আদালতের অন্যান্য কার্যাবলী আছে। এ প্রসঙ্গে উদাহরণ হিসেবে বিতর্কিত নির্বাচনী এলাকা ও নির্বাচন সম্পর্কিত বিরোধের ক্ষেত্রে রায় দান। জরুরী অবস্থা সম্পর্কিত ক্ষমতা প্রয়োগ বা অন্যান্য বিষয়ে রাষ্ট্রপ্রধানকে পরামর্শ প্রদান, রাজনৈতিক বিরোধ নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

অনুশীলনী—৩

আধুনিক রাষ্ট্রের বিচার বিভাগের কার্যাবলী সংক্ষেপে বিবৃত করুন।

১১.৫ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা

নির্ভীক ও নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য বিচার বিভাগের স্বাধীনতা অত্যন্ত জরুরী। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে বোঝায় যে, বিচারপতিগণ সমস্ত রকম রাজনৈতিক, শাসনবিভাগীয় ও আইনবিভাগীয় হস্তক্ষেপ ছাড়াই নির্ভয়ে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন। তাঁরা নিজেদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে বিরোধের মীমাংসা করবেন। প্রকৃতপক্ষে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা পরস্পরের পরিপূরক, বিচার বিভাগের উপর সরকারের অন্য দুটি বিভাগের হস্তক্ষেপ ঘটলে ন্যায় বিচার ব্যহত হয়। তাই ন্যায়সঙ্গত ও নিরপেক্ষ বিচারের জন্য বিচার বিভাগের স্বাধীনতা জরুরী। লর্ড ব্রাইসের মতে, সরকারের ঔৎকর্ষ নির্ভর করে বিচার বিভাগের কর্মকুশলতার উপর। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নির্ভর করে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর।

সৎ, সাহসী এবং প্রকৃত আইনজ্ঞ ব্যক্তিগণ দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে বিচারপতির পদে নিযুক্ত হলে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা থাকে। বিচারপতি নিয়োগের বিষয়ে প্রার্থীদের গুণগত যোগ্যতাই প্রাধান্য পাওয়া উচিত।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বিচারকদের নিয়োগ পদ্ধতির উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। বিচারপতিদের সাধারণত তিনটি পদ্ধতির মাধ্যমে নিযুক্ত করা হয় ঃ (১) জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচন, (২) আইনসভার দ্বারা মনোনয়ন এবং (৩) শাসনবিভাগ দ্বারা নিয়োগ।

বিচারকদের কার্যকালের মেয়াদের উপরও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নির্ভরশীল। কার্যকালের স্থায়িত্ব না থাকলে নিষ্ঠার সাথে বিচার কার্যের দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয় না। বিচার বিভাগের স্বাধীনতার জন্য বিচারপতিদের নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করা উচিত।

বিচারকদের অপসারণ পদ্ধতির উপরও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নির্ভর করে। অকারণ বা সামান্য কারণে পদচ্যুত হওয়ার আশংকা থাকলে বিচারকদের পক্ষে ন্যায়বিচার করা সম্ভব হয় না।

বিচারকদের বেতন ও ভাতার উপরও নির্ভর করে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা। স্বল্প বেতনভোগী বিচারপতিদের দুর্নীতিগ্রস্ত হওয়ার প্রবণতা থাকে। সেই কারণে শ্রেষ্ঠ, যোগ্যতাসম্পন্ন আইনজ্ঞকে বিচারক পদে আকৃষ্ট করার জন্য বিচারপতিদের বেতন ও ভাতা যথেষ্ট হওয়া দরকার।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতার জন্য আইন ও শাসনবিভাগ থেকে তার পৃথকীকরণ অপরিহার্য। বর্তমানে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির আংশিক প্রয়োগ বলতে এই বিচার বিভাগের পৃথকীকরণকে বোঝায়। ল্যাস্কির মতে, শাসকের হাতে বিচারের দায়িত্ব থাকলে ন্যায়বিচার বিঘ্নিত হয় এবং শাসনবিভাগ সহজেই স্বৈরাচারী হয়ে উঠতে পারে। বিচারবিভাগের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য অধিকাংশ দেশে বিচার ব্যবস্থাকে শাসনবিভাগীয় হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত করার চেষ্টা হচ্ছে।

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উপরোক্ত ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়। ল্যাস্কি প্রমুখ লেখকদের মতে, বিচার বিভাগ প্রচলিত রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ। সুতরাং, বিচার বিভাগের পক্ষে রাজনীতি নিরপেক্ষ হওয়া কঠিন কাজ। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার কাঠামো ও চরিত্রের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল।

অনুশীলনী—৪

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

১১.৬ বিচার বিভাগের নিয়ন্ত্রণ :

বিচার বিভাগের স্বাধীনতার উপর আনুষঙ্গিক কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতা হল বিচারপতিদের বাছাই করার পদ্ধতি, পদ্ধতিগত নিয়মকানুন বিশেষত, বিচারবিভাগীয় নজিরের প্রতি বিচারপতিদের একনিষ্ঠতা, সামাজিক ও রাজনৈতিক চাপের বিষয়ে বিচারপতিদের সংবেদনশীলতা প্রভৃতি। তাছাড়াও রয়েছে আইনগত বৃত্তির কতকগুলি প্রতিষ্ঠিত আচরণবিধি। এই সমস্ত বিধিব্যবস্থা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে বিচার বিভাগের সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাবিত করে।

এই সমস্ত সীমাবদ্ধতা ছাড়াও বিচার বিভাগের উপর কিছু প্রতিষ্ঠানগত (Institutional) নিয়ন্ত্রণ আছে। প্রথমত, নতুন আইনের মাধ্যমে আইন বিভাগ বিচার বিভাগকে অসুবিধায় ফেলতে পারে। বিচারকদের অপসারণের ক্ষেত্রেও আইন বিভাগের ভূমিকা থাকতে পারে। দ্বিতীয়ত, সংবিধান সংশোধন করে বা নতুন ভাবে আইন রচনা করে বিচার বিভাগের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা যায়। তৃতীয়ত, আদালতের দায়িত্বের ক্ষেত্রে বিশেষীকরণ এনে রাজনৈতিক চাপ বা দাবীর প্রতি আদালতকে স্পর্শকাতর করে তুলতে পারে। সন্দেহ নেই, সাংবিধানিক আদালত এবং প্রশাসনিক আদালতের মধ্যে পার্থক্য এইভাবেই সৃষ্টি। আধা-বিচার বিভাগীয় সংস্থার ধারণা এইভাবে এসেছে। বিচার বিভাগকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকরী মাধ্যম হল শাসন বিভাগ। শাসন বিভাগের উপর বিচার বিভাগ অত্যন্ত নির্ভরশীল। বিচার বিভাগের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য শাসন বিভাগের সাহায্য প্রয়োজন। সমস্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যেই বিচারবিভাগীয় বিষয়ের জন্য আলাদা মন্ত্রক ও মন্ত্রীর অস্তিত্ব দেখা যায়। সুতরাং, রাজনৈতিক ব্যবস্থার অংশসমূহের সঙ্গে বিচার বিভাগের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার

সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। অধ্যাপক বলের মতে, বিচার বিভাগের ক্ষমতা রাজনৈতিক জোট বা বিন্যাসের উপর দাঁড়িয়ে আছে। তিনি সুনিশ্চিত যে, বিচার বিভাগ এই জোটেরই এক বৈধ অংশ।

১১.৭ সারাংশ

বিচার বিভাগ আধুনিক শাসনব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অংশ। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক রাষ্ট্রের উৎকর্ষ নির্ভর করে নির্ভীক ও নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থার উপর। তবে বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতার বিষয়টি যথেষ্ট বিতর্কিত। অনেকের মতে বিচার ব্যবস্থা নির্দিষ্ট ধরনের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতীক হিসেবে কাজ করে। তাই বিচার বিভাগ নিরপেক্ষ হতে পারে না। অধ্যাপক বল বিচার বিভাগের নির্দিষ্ট কয়েকটি কাজের কথা বলেছেন। এই সমস্ত কার্যাবলীর দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, সরকারের আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের সাথে বিচার বিভাগের সম্পর্ক হ'ল, সহযোগিতার। তবে প্রয়োজনে কোন কোন ক্ষেত্রে বিচার বিভাগ সরকারের জন্য দুই বিভাগকে নিয়ন্ত্রণও করে। সাম্প্রতিককালে দেখা যায় যে, বিচার বিভাগ অত্যন্ত কার্যকরীভাবে সরকারের বিভিন্ন কাজে সাহায্য করছে। ফলে, বিচার বিভাগের ক্ষমতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। বিচার বিভাগের এই ক্ষমতা বৃদ্ধিতে অনেকে বিভিন্ন আশঙ্কাও প্রকাশ করেছেন। সেই প্রসঙ্গে বিচার বিভাগের নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নটিও উত্থাপিত হয়েছে।

১১.৮ উত্তরসংকেত

অনুশীলনী—১

১১.১ অংশ দেখুন

অনুশীলনী—২

১১.২ অংশ দেখুন

অনুশীলনী—৩

১১.৪.১ অংশ দেখুন

অনুশীলনী—৪

১১.৫ অংশ দেখুন

একক—১২ ❐ ক্ষমতা পৃথকীকরণের তত্ত্ব

গঠন

১২.০ উদ্দেশ্য
১২.১ প্রস্তাবনা
১২.২ ক্ষমতা পৃথকীকরণের অর্থ
১২.৩ এই নীতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
১২.৪ ১২.৩.১ মন্টেস্কুর অবদান
১২.৩.২ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির প্রয়োগ
১২.৫ মূল্যায়ন
১২.৬ সারাংশ
১২.৭ উত্তরমালা
১২.০ গ্রন্থপঞ্জী

১২.০ উদ্দেশ্য

সরকারের তিনটি বিভাগের ক্রিয়াকলাপের বিভাগীয় পৃথকীকরণের পরামর্শ দিয়েছিলেন ইংরেজ রাষ্ট্রদার্শনিক জন লক সপ্তদশ শতাব্দীতে। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী লেখক মন্টেস্কুর নামের সাথেই জড়িয়ে আছে ক্ষমতা পৃথকীকরণের তত্ত্ব। এই এককটির মাধ্যমে আপনারা জানতে পারবেন—

- ক্ষমতা পৃথকীকরণের অর্থ
- এই তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
- এই তত্ত্বে মন্টেস্কুর অবদান
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির প্রয়োগ
- এই নীতির মূল্যায়ন

১২.১ প্রস্তাবনা

পূর্ববর্তী আলোচনায় আমরা লক্ষ্য করেছি আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সমস্ত ইচ্ছা প্রকাশিত হয় সরকারের মাধ্যমে এবং আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ সরকারের কার্যাবলীকে পরিচালিত করে। এখন প্রশ্ন হল সরকারী ক্ষমতা বন্টনের বিষয়ে এই তিনটি বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক কি রকম হবে? সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তি স্বাধীনতাকে রাষ্ট্রীয় স্বৈরাচার থেকে মুক্ত করার বিষয়ে ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির উদ্ভব।

১২.২ ক্ষমতা পৃথকীকরণের অর্থ

বহু প্রাচীনকাল থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা সরকারী ক্ষমতার শ্রেণীবিভাগ ও সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে বহু মতবাদ প্রচার করেছেন। এই সমস্ত মতবাদের মধ্যে ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতিটি সুপরিচিত। এই নীতি অনুসারে সরকারের সমস্ত ক্ষমতা আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের মধ্যে বন্টিত করা উচিত। কারণ, সরকারের তিনটি বিভাগের ক্ষমতা এক ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের হাতে ন্যস্ত থাকলে নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতা বিপন্ন হতে বাধ্য। সুতরাং, এই নীতি অনুসারে সরকারের এক বিভাগ অন্য বিভাগের কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না এবং এক ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের উপর একাধিক বিভাগের ক্ষমতা ন্যস্ত করা যাবে না। অর্থাৎ, সরকারের প্রত্যেক বিভাগের ক্ষমতার একটা নির্দিষ্ট সীমারেখা বা গণ্ডী থাকবে। ক্ষমতা পৃথকীকরণের এই ধারণাকে সাবেকি ধারণা বলা হয়। আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এই নীতির ব্যাখ্যা ভিন্ন ভাবে করা হয় এবং উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই নীতির আংশিক প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা হয় না।

অনুশীলনী—১

ক্ষমতা পৃথকীকরণের অর্থ কী?

১২.৩ এই নীতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল সর্বপ্রথম সরকারী ক্ষমতাকে আইন (deliberative), শাসন (magisterial) এবং বিচার (judicial) এই তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন এবং এই তিনটির বিভাগকে পৃথক রাখার সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন। শ্রম বিভাগের নীতিকে অনুসরণ করে তিনি বলেন যে, একাধিক বিভাগের কার্যভার এক ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের উপর ন্যস্ত থাকলে শাসনকার্য সুচারুভাবে সম্পন্ন হতে পারে না। অ্যারিস্টটলের এই বক্তব্যকে সমর্থন করে রোমান রাষ্ট্রদার্শনিকদ্বয় পলিবিয়াস (Polybius) এবং সিসেরো (Cicero) মন্তব্য করেন যে, সরকারী ক্ষমতা বন্টনের দ্বারাই বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা যায়। মধ্যযুগেও এই নীতি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। ষোড়শ শতাব্দীর ফরাসী রাষ্ট্রদার্শনিক বোদাঁ (Bodin) ক্ষমতাকে পৃথিকীকরণ নীতির একজন সমর্থক ছিলেন। সপ্তদশ শতকে ইংলন্ডে জন লব (John Locke) এই নীতিকে অবলম্বন করেই গৌরবময় বিপ্লবকে (১৬৮৮) সমর্থন করেন।

উপরোক্ত রাষ্ট্র দার্শনিকরা ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির কথা উল্লেখ করলেও অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মন্টেস্কু (Montesquieu)-র নামের সাথেই যুক্ত হয়ে আছে এই নীতি। ১৭৪৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি Spirit of Laws নামক গ্রন্থটি রচনা করেন এবং তখন থেকেই তাঁকে ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির জনক বলে উল্লেখ করা হয়। তদানীন্তন ফরাসী রাজতন্ত্রের চরম স্বৈরাচারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি ইংলন্ডে যান ; সেখানে দ্বিতীয় জর্জের রাজত্বকালে জনগণের স্বাধীনতা ও অধিকারের একমাত্র রক্ষাকবচ। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের

শাসনতন্ত্র পর্যালোচনা করে তিনি মন্তব্য করেন যে, সরকারের কার্যভার পৃথক ব্যক্তিবর্গের দ্বারা পরিচালিত না হলে জনগণের স্বাধীনতা লাভের কোন আশা নেই।

মন্টেস্কুর এই মতবাদ বিশ্লেষণ করলে ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির চারটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়—(১) রাষ্ট্রের সামগ্রিক ক্ষমতা যথা—আইন, শাসন ও বিচার সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে বন্টিত করতে হবে ; (২) সরকারের তিনটি বিভাগ সম্পূর্ণরূপে পৃথক ব্যক্তিবর্গের দ্বারা পরিচালিত হবে ; (৩) কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টির হাতে একাধিক বিভাগের ক্ষমতা অর্পণ করা হবে না ; (৪) রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র এমনভাবে রচিত হবে যাতে এক বিভাগ অপর বিভাগের উপর কখনই প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইংলন্ডের শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতার পৃথকীকরণ সম্পর্কে মন্টেস্কুর ধারণা নির্ভুল ছিল না। বস্তুত, ইংলন্ডের শাসন ব্যবস্থায় সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে পৃথক নয়। মন্টেস্কু ইংলন্ডের শাসনব্যবস্থার একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করতে পারেন নি একথা অবিশ্বাস্য। আসলে তদানীন্তন ফরাসী রাজতন্ত্রের চরম স্বৈরাচার ও জনগণের দুর্গতির প্রতি বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই তিনি এই মতবাদ প্রচার করেন। সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ যে অবাঞ্ছনীয় ও অবাস্তব সে সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। ফাইনার (Finer) মন্তব্য করেছেন যে, মন্টেস্কুর প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল ক্ষমতার পৃথিকীকরণের দ্বারা স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের অবাধ ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং এমন একটি নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার গুণকীর্তন করা যেখানে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ক্ষমতা হবে পরিমিত এবং নিয়ন্ত্রিত। চরম গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না।

১২.৩.১ মন্টেস্কুর অবদান

মন্টেস্কু তাঁর ক্ষমতা পৃথিকীকরণের নীতির মাধ্যমে এ কথাই বোঝাতে চেয়েছিলেন যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অনিয়ন্ত্রিত হলেই ক্ষমতার অপপ্রয়োগের প্রবণতা স্বাভাবিক ভাবেই দেখা দেবে। সরকারের যে কোন দু'টি বিভাগ কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যুক্ত হলেই ব্যক্তি স্বাধীনতা বিপন্ন হয়। মন্টেস্কু ইংলন্ডের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত করলেও তাঁর প্রচলিত ক্ষমতার পৃথিকীকরণ নীতি তৎকালে বিশ্বের বহু দেশের শাসনতন্ত্রের উপর এতই গভীর প্রভাব বিস্তার করে যে প্রায় সমস্ত ইউরোপীয় ভাষাতেই তাঁর Spirit of Laws গ্রন্থটি অনুবাদ করা হয়। এ প্রসঙ্গে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মন্টেস্কু তাঁর পূর্বসূরি জন লক-এর Second Treatise দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। লক বলেছিলেন যে আইন রচনা করা এবং আইন প্রয়োগ, এ দুটি বিষয় এমনই ভিন্ন ধরনের দায়িত্ব যা এক ব্যক্তি বা সংস্থার হাতে সমর্পণ করা যায় না। তেমনি, federative function-টির দায়িত্বও ভিন্ন বিভাগের হাতে থাকা উচিত। সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার পৃথকীরণের এই বিষয়টি মন্টেস্কু তাঁর উল্লেখিত গ্রন্থে আরো বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করেছিলেন। সমকালীন রাজনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় এই নীতির প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। ফরাসী বিপ্লব (১৭৮৯)-এর পর বিপ্লবী নায়কগণ রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করে যে নতুন শাসনতন্ত্র প্রবর্তন করেছিলেন সেটা এই নীতির উপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছিল। ১৭৮৭-৮৯ খ্রিস্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ সংবিধান রচনায় উদ্যোগী হলে এই নীতিকে ব্যক্তি স্বাধীনতার মূল মন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করা হয়। সেইজন্য মার্কিন সংবিধানে এই নীতির স্পষ্ট প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতালীয় সংবিধানেও এই নীতি যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। বিভিন্ন শাসনতন্ত্রের উপর এই নীতির প্রভাব থেকে এটা সহজেই অনুমান করা যায় যে, রাষ্ট্রনীতির ইতিহাসে এই নীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ।

অনুশীলনী—২

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে মন্টেস্কুর অবদান কী?

১২.৩.২ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির প্রয়োগ

মন্টেস্কুর ক্ষমতা পৃথকীকরণের নীতি মার্কিন সংবিধান রচয়িতাদের উপর সুস্পষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। তাই এই দেশের সংবিধানে আমরা সতর্কতামূলক নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতির প্রেক্ষিতে ক্ষমতা পৃথকীকরণ তত্ত্বের প্রচলন দেখতে পাই। মার্কিন সংবিধানে রচয়িতারা নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের বিষয়টি যুক্ত করেন ক্ষমতা পৃথিকীকরণ তত্ত্বের সাথে যাতে তত্ত্বটি বাস্তবে আরো ভালো ভাবে কাজ করতে পারে। স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার বিষয়ে যে কাজ লক ও মন্টেস্কু শুরু করেন তা সুপ্রতিষ্ঠিত হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দের ফিলাডেলফিয়া কনভেনশনের মাধ্যমে। মার্কিন সংবিধান রচয়িতারাও মন্টেস্কুর মত প্রেরণা পেয়েছিলেন প্রকৃতির রাজ্যের সূর্য, চন্দ্র ও পৃথিবীর কাজের নিয়মশৃঙ্খলা পরস্পর নির্ভরশীলতা বিষয় থেকে। মার্কিন সংবিধান রচয়িতাদের হাতেই ক্ষমতা পৃথকীকরণের তত্ত্বটি বাস্তব রূপ লাভ করে। এই নীতির পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের তিনটি বিভাগের কাজের যেমন স্বাতন্ত্র্য আছে, তেমনি এই বিভাগ তিনটির মধ্যে সহযোগিতাও লক্ষ্য করা যায় ক্ষমতা ও ভারসাম্যের নীতির অস্তিত্বের ফলে। এখানে রাষ্ট্রপতির হাতে সমস্ত ক্ষমতা অর্পিত হলেও তাঁর নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়গুলিকে সেনেটের অনুমোদন অর্জন করতে হয়। যদি রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে সংবিধান ভঙ্গের অভিযোগ বা কোন প্রমাণিত গুরুতর অন্যায় থাকে, তবে প্রতিনিধি সভা রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ পত্র তৈরী করে এবং সেনেটে দু-তৃতীয়াংশের ভোটে সেটি গ্রহণ করলে রাষ্ট্রপতি পদচ্যুত হতে পারেন। রাষ্ট্রপতির দ্বারা ঘোষিত শাসনবিভাগীয় নির্দেশ আইনগত পর্যালোচনা (Judicial review)-র মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হতে পারে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ক্ষমতাসীন হওয়ার সময়ে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির উপস্থিতিতে এই মর্মে শপথ গ্রহণ করেন যে, তিনি সংবিধানকে রক্ষা করবেন। এইভাবে তিনি কংগ্রেস ও সুপ্রীম কোর্ট দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন। আবার রাষ্ট্রপতি ও সুপ্রীম কোর্ট মার্কিন কংগ্রেসকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। কংগ্রেস কর্তৃক পাস হওয়া বিলে রাষ্ট্রপতি ভেটো প্রদান করতে পারেন। সুপ্রীম কোর্ট সংবিধান-বিরুদ্ধ কোন আইনকে আংশিকভাবে অথবা সম্পূর্ণভাবে বাতিল করতে পারে। সুপ্রীম কোর্টকেও রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেস নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সেনেটের অনুমোদনক্রমে রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগ করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতির সমক্ষে শপথ গ্রহণ করেন। বিচার বিভাগের শক্তিবৃদ্ধির জন্য কংগ্রেস আইন প্রণয়ন করতে পারে। আবার সংবিধান ভঙ্গের অভিযোগে বিচারকদের পদচ্যুত করাও যেতে পারে।

ইতিমধ্যে মার্কিন সাংবিধানিক ব্যবস্থার মধ্যেও বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। আইন বিভাগ দ্বারা রাষ্ট্রপতিকে নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি এখন সাংবিধানিক গল্পের মত শোনায়। রাষ্ট্রপতি বৈদেশিক চুক্তির বা নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়গুলি আজকাল সহজেই সেনেটের অনুমোদন লাভ করে। ইম্পীচমেন্টের পদ্ধতিটি এত দীর্ঘ এবং জটিল যে বর্তমানে মার্কিন রাষ্ট্রপতি এই বিষয়টির অস্তিত্বের জন্য আদৌ উদ্বিগ্ন নন। আবার, বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার নাম সুপ্রীম কোর্টে তাদের ক্ষমতাকে আরো সম্প্রসারিত করেছে।

১২.৪ মূল্যায়ন

আধুনিককালে অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মন্টেস্কু প্রচারিত ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির বাস্তব মূল্য ও কার্যকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন। বিভিন্ন দেশের শাসনব্যবস্থা পর্যালোচনা করলে স্পষ্টই উপলব্ধি করা যায় যে, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক এতই ঘনিষ্ঠ যে এদের পৃথক করা শুধু অযৌক্তিক নয়, অবাস্তবও বটে। অধ্যাপক ফাইনার মন্তব্য করেছেন যে, এই নীতির বাস্তব প্রয়োগের ফলে শাসন ব্যবস্থায় চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা ও অচলাবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। ক্ষমতার পৃথকীকরণের ফলে সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ঈর্ষাপ্রসূত ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতে পারে। মিল (Mill) এজন্যই মন্তব্য করেছেন যে, সরকারের বিভিন্ন বিভাগ বিচ্ছিন্ন হ'লে তাদের মধ্যে ঈর্ষা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে শাসন ব্যবস্থায় কর্মকুশলতা ব্যাহত হতে বাধ্য। সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এই নীতির আদৌ কোন গুরুত্ব লক্ষ্য করা যায় না।

ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির স্বপক্ষে বলা হয় যে, এই তত্ত্বের মূল উদ্দেশ্য হল ব্যক্তি স্বাধীনতাকে রাষ্ট্রের স্বৈরাচার থেকে রক্ষা করা। কিন্তু দেখা যায় যে, ব্রিটেনে ক্ষমতার পৃথকীকরণের নীতি চালু না থাকা সত্ত্বেও সেখানে ব্যক্তি স্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবে সুরক্ষিত। আবার কোন কোন দেশে দেখা যায় যে, ক্ষমতার পৃথিকীকরণের নীতি চালু থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষিত হয় না। এই কারণে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, নাগরিক স্বাধীনতা ও অধিকার ক্ষমতাকে পৃথকীকরণের উপর নির্ভর করে না ; নির্ভর করে জনগণের শিক্ষা ও রাজনৈতিক চেতনার উপর। জনগণ তাদের ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষায় বদ্ধপরিকর হলে কোন শক্তিই তাদের স্বাধীনতা ও অধিকার হরণ করতে পারে না। নির্ভীক ও শর্ত জনমতকে এই কারণেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা নাগরিক স্বাধীনতা অধিকারের মূলমন্ত্র রূপে বর্ণনা করেছেন।

আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলসমূহের ব্যাপক প্রভাবের ফলেও ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতির গুরুত্ব বহুলাংশে কমেছে। কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতে সরকারের আইন বিভাগই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আইন সভার অনুমোদনক্রমেই শাসকবর্গ শাসন কার্য ও বিচারকগণ বিচার কার্য সম্পাদন করেন। বার্কার (Barker)-এর মতে, আধুনিক শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র বিপুলভাবে প্রসাসিত হবার ফলে শাসন বিভাগের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আবার কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতে বিচার বিভাগই সরকারের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ, কারণ এই বিভাগ আইন ও শাসন বিভাগকে সংযত রাখে। সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ক্ষমতা ও গুরুত্ব সম্পর্কে মতভেদ থেকে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, সরকারের কোন বিভাগই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় এবং প্রত্যেক বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার দ্বারাই শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধন সম্ভব। সুতরাং, ক্ষমতার পৃথকীকরণের নীতিটির পূর্ণ প্রয়োগ আধুনিক রাষ্ট্রে সম্ভব নয় ; কেননা, সরকারের তিনটি বিভাগই প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই কারণে, প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার মূল্যবোধ ও মতাদর্শগতভিত্তি সরকারের বিভিন্ন বিভাগের উপর গভীরভাবে রেখাপাত করে। বিশাল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে তাই সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা, সামঞ্জস্য ও সংহতি না থাকলে রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা ক্ষুণ্ণ হতে পারে। উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ক্ষমতার পৃথিকীকরণের নীতিটির আংশিক প্রয়োগ, অর্থাৎ বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার কথা বলা হয়। আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগকে প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বিচার বিভাগ রাজনৈতিক ব্যবস্থার উদ্দেশ্য সাধনে সাহায্য করে। সুতরাং সরকারের প্রতিটি বিভাগ একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করেই অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে চেষ্টা করে।

অনুশীলনী—৩

ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির মূল্যায়ণ করো।

১২.৫ সারাংশ

বহু প্রাচীনকাল থেকেই ক্ষমতা পৃথকীকরণের নীতির প্রচলন থাকলেও ফরাসীদেশের মন্টেস্কুই এই তত্ত্বের প্রধান প্রবক্তা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছেন। তাঁর মতে, সরকারের তিনটি বিভাগ নিজ নিজ গণ্ডীর মধ্যে থেকে কাজ করলে এবং এক বিভাগ অন্য বিভাগের কাজে হস্তক্ষেপ না করলে নাগরিক স্বাধীনতা পরিপূর্ণভাবে রক্ষিত হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থার কার্যাবলী পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, মন্টেস্কুর নীতি বাস্তব ক্ষেত্রে অকার্যকর। তবে, যে উদ্দেশ্যে তিনি ক্ষমতা পৃথকীকরণের তত্ত্বের প্রচার করেছিলেন তা সার্থক হয়েছিল। ফরাসী রাজতন্ত্রের চরম স্বৈরাচার ও জনগণের দুর্দশার বিরুদ্ধে বিশ্বজনমতকে তিনি জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন। ফরাসী বিপ্লব রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ করে নাগরিক স্বাধীনতাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এর পিছনে মন্টেস্কুর অবদান ছিল যথেষ্ট। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান রচয়িতারাও যে এই নীতির দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিলেন সে কথা আমাদের অজানা নয়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে, বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা গেছে যে, এই নীতির পূর্ণ প্রয়োগ সম্ভব নয়, কাম্যও নয়। তবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা হল ক্ষমতার অপপ্রয়োগ। সুতরাং সরকারী ক্ষমতার অপব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যদি বিচার বিভাগকে সরকারের অন্য দুই বিভাগের প্রভাব ও প্রতিপত্তি থেকে মুক্ত রাখা যায় তবে ব্যক্তি স্বাধীনতা সংরক্ষণের সাথে রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্যও বাস্তবায়িত হ'তে পারে।

১২.৬ উত্তরমালা

অনুশীলনী—১

১২.১ অংশ দেখুন

অনুশীলনী—২

১২.৩.১ অংশ দেখুন

অনুশীলনী—৩

১২.৪ অংশ দেখুন

১২.৭ গ্রন্থপঞ্জী

(1) Alan R. Ball : Modern Politics and Government

(2) J. C. Johari : Comparative Politics

(3) ডাঃ অনাদিকুমার মহাপাত্র ঃ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা।

(4) দেবাশীষ চক্রবর্তী ঃ রাষ্ট্রতত্ত্ব।

একক—১৩ ❐ সংবিধান ও সংবিধানবাদ

গঠন

১৩.০ উদ্দেশ্য ও প্রস্তাবনা
১৩.১ সংবিধান ও সংবিধানবাদ
১৩.২ রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনায় সংবিধানের গুরুত্ব
১৩.৩ সংবিধান ও সাংবিধানিক আইন
১৩.৪ রাষ্ট্রীয় সংবিধানের মূল নীতি ও উপাদান
১৩.৫ সংবিধানের সংজ্ঞা ও চরিত্র
১৩.৬ সংবিধানের প্রকারভেদ
১৩.৬.১ লিখিত ও অলিখিত সংবিধানের গুণাগুণ
১৩.৭ শ্রেষ্ঠ সংবিধানের লক্ষণ ও উপাদান
১৩.৮ সংবিধানের বিকাশ ও বিবর্তন
১৩.৯ অনুশীলনী
১৩.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১৩.০ উদ্দেশ্য ও প্রস্তাবনা

চতুর্থ পর্যায়ে চারটি এককের মাধ্যমে রাষ্ট্রপরিচালনায় সংবিধানের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব আলোচনা করা হয়েছে। রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশকরূপে সংবিধানের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব, রাষ্ট্রনায়কদের এবং রাজনীতিবিদ্ ও রাষ্ট্রতাত্ত্বিকদের সংবিধানের প্রতি আস্থা ও নির্ভরতার প্রবণতাকে আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া, এই এককের প্রতিটি পর্বে ক্রমানুসারে সরকারের সংজ্ঞা, শ্রেণিবিভাগ, বিভিন্ন শাসনব্যবস্থার গুণাগুণ আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের ভূমিকা, গুরুত্ব ও কার্যাবলী, রাষ্ট্রতত্ত্বে গোষ্ঠীবাদ, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সংজ্ঞা ও প্রকৃতি এবং উদারনৈতিক গণতন্ত্রে তাদের ভূমিকা ও কার্যাবলী আলোচনা করা হয়েছে। চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলির কার্যপদ্ধতির নির্ধারকসমূহ এবং চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে রাজনৈতিক দলসমূহের সম্পর্কের বিষয়টিও সংশ্লিষ্ট এককগুলির আলোচনায় বিশেষ গুরুত্বলাভ করেছে।

১৩.১ সংবিধান ও সংবিধানবাদ

রাষ্ট্রপরিচালনায় সংবিধানের ভূমিকা ও গুরুত্ব ক্রমবর্ধমান। সংবিধানের এই প্রয়োজনীয়তার কারণ বহুবিধ। প্রথম উদ্দেশ্য হ'ল—কতকগুলি মৌলিক নীতি ও নির্দেশের সহায়তায় সরকারের ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করে রাখা। দ্বিতীয়ত, একটি সংবিধান প্রত্যেক ব্যক্তি-নাগরিকের পক্ষ থেকে সরকারকে সংযত রাখে এবং এই সংযতকরণ প্রক্রিয়ার সহায়তায় বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা করে। বিখ্যাত

সংবিধান বিশেষজ্ঞ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী শূল্‌জ (Schulze) বলেছেন যে, প্রতিটি রাষ্ট্রের একটি সংবিধান থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয়। এই সংবিধান হবে নীতি ও নির্দেশের সমষ্টি—যার সাহায্যে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের সরকার ও নাগরিকদের মধ্যে আইনগত সম্পর্ক নির্ধারিত হবে এবং রাষ্ট্রের ক্ষমতা প্রযুক্ত হবে। সংবিধানবিহীন রাষ্ট্র (শূল্‌জের মতানুসারে) একটি অচিন্ত্যনীয় বিষয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জেলিনেকও (Jellinek) ঐ একই দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করেন। তিনিও মনে করেন যে, প্রতিটি রাষ্ট্রের জন্য একটি সংবিধান অতি অবশ্য প্রয়োজনীয়। বস্তুত প্রতিটি রাষ্ট্রই একটি করে সুলিখিত ও সুসংবদ্ধ সংবিধানের অধিকারী হয়। এমনকি স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থারও সংবিধান প্রয়োজনীয়। সংবিধানবিহীন রাষ্ট্র বস্তুত নৈরাজ্যেরই নামান্তর।

সংবিধানের গুরুত্ব নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গেই সংবিধানের সংজ্ঞা নির্দেশকরণ অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়ে। তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা সংবিধানের সংজ্ঞা নির্দেশকরণের প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষা করতে পারেন না। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে সংবিধান কী? উলসীর (Woolsey) মতে সংবিধান হচ্ছে সেই সমস্ত নীতিসমূহের সমষ্টি—যাদের সাহায্যে শাসকের ক্ষমতা শাসিতের অধিকার এবং দুইয়ের মধ্যেকার সম্পর্ক নির্ধারিত হয়। বোভার (Bouvier)-এর মতে সংবিধান হ'ল রাষ্ট্রপরিচালনার মৌল নীতি। জে. মিলার (J. Miller)-এর মতো মার্কিন রাষ্ট্রবৈজ্ঞানিক মন করেন যে, সংবিধান হ'ল একটি লিখিত দলিল—যেখানে সরকারের ক্ষমতাকে লিখিত সীমিত ও সুনির্দিষ্ট করা হয়। এইভাবে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠবার সূচনাপর্ব থেকে সংবিধানের সংজ্ঞা, চরিত্র, কার্যকারিতা ও ভূমিকা নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা আলোচনা ও বিতর্ক করেছেন। এই বিতর্ক থেকেই রাষ্ট্রবৈজ্ঞানিক তত্ত্বে ও চিন্তায় সংবিধানবাদের উদ্ভব হয়েছে।

১৩.২ রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনায় সংবিধানের গুরুত্ব

ফলিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অপরিহার্য অনুষঙ্গ একটি সুলিখিত সংবিধান। সুলিখিত সংবিধান সুনির্দিষ্ট হয়। এই সংবিধান কাগজে কলমে লিখিত ও দলিলবদ্ধ হয়। এর ফলে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের নাগরিকরা এবং আইনবিদ্, সংবিধান বিশেষজ্ঞ ও রাষ্ট্রতাত্ত্বিকেরা (Political theorists) দেশের সাংবিধানিক আইন ও পরিকাঠামোর স্বরূপ বুঝতে সক্ষম হন। তবে ভাষাও অধস্তরের নাগরিকদের পক্ষে সহজবোধ্য হয়। সাধারণত সংবিধান অতি-সংক্ষিপ্ত ও অতি বিস্তৃত—কোনটাই হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। অতি বিস্তৃত সংবিধান সাধারণ নাগরিকদের বোধগম্য হয় না। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পক্ষেও পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজন করা সম্ভব হয় না। বর্তমান বিশ্বে ক্ষুদ্রতম সংবিধানের দৃষ্টান্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান ও বৃহত্তম সংবিধানের নজীর ভারতীয় সংবিধান রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের আলোচনা ও গবেষণার ক্ষেত্রে কোনও সমস্যার সৃষ্টি করে না। গত দুই শত বৎসরে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্ভব ও বিকাশের ফলে সংবিধান একটি সুশৃঙ্খল পাঠ (Disciplined Study) রূপে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের আগ্রহের বিষয় হয়েছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের সংবিধানের তুলনামূলক আলোচনা (Comparative Government) এই সুশৃঙ্খল পাঠের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। একটি সুচিন্তিত ও সুলিখিত সংবিধান সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের জনগণের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রয়োজনের পরিপূরক হয়।

১৩.৩ সংবিধান ও সাংবিধানিক আইন

সংবিধানের ব্যাপক প্রসার ও সাংবিধানিক সমস্যাকে উপজীব্য করে রাষ্ট্রবৈজ্ঞানিক তত্ত্বে ও ধারণায়

সাংবিধানিক আইনের উদ্ভব ঘটেছে। সাংবিধানিক আইনের সংজ্ঞা কি? বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদ্বয় ওয়েড এবং ফিলিপ-এর (Wade & Philip)-মতে, সাংবিধানিক আইনের কোন ধরাবাঁধা সংজ্ঞা নির্দেশ করা যায় না।

আইনের সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা যদি বুঝতে হয় তবে সাংবিধানিক আইন বলতে বুঝায় শাসন পরিচালনার জন্য প্রণীত আইন। এর সঙ্গে বহুকাল প্রচলিত প্রথাগুলিও অঙ্গীভূত, যে প্রথাগুলির সাহায্যে সরকারী পরিকাঠামোর বিভিন্ন অংশগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। বিশিষ্ট সংবিধান বিশেষজ্ঞ ডাইসী (Dicey)-র মতে, ইংলন্ডবাসীর ধারণায় সাংবিধানিক আইন বলতে সেই সমস্ত আইনকেই বোঝায় যেগুলি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রে প্রযুক্ত সার্বভৌম ক্ষমতার বন্টন ও প্রয়োগকে প্রভাবিত করে। বোভার (Bovier)-এর মতে, সাংবিধানিক আইন হ'ল রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক আইন। যে সমস্ত রাষ্ট্রের লিখিত সংবিধান আছে সে সমস্ত রাষ্ট্রে সাংবিধানিক আইন ও সাধারণ আইনের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভব এবং সেখানে সেই পার্থক্য নির্ণয় করতে হয়। সাধারণ আইন সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের ভোটে পাস করা হয়। সাংবিধানিকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। ঐ সংবিধান ১৯৪৬ সালে বিশেষভাবে গঠিত গণপরিষদ কর্তৃক রচিত হয় এবং ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী থেকে প্রচলিত হয়। এই সাংবিধানিক আইন অনুসারেই ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রথম সারা ভারতে প্রাপ্তবয়স্কদের সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতেই গণতান্ত্রিক ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের মত পৃথিবীর অনেক দেশই এখন সংবিধান-নির্ভর এবং এর ফলে সে সমস্ত দেশে সাংবিধানিক আইনের গুরুত্ব ক্রমবর্ধমান।

১৩.৪ রাষ্ট্রীয় সংবিধানের মূলনীতি ও উপাদান

পৃথিবীর সব দেশের সংবিধানই কিছু মূলনীতির দ্বারা নির্ধারিত ও পরিচালিত হয়। এই অপরিহার্য মূলনীতিগুলিই একটি সংবিধানকে আদর্শ সংবিধানে রূপান্তরিত করে। সংবিধান সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট হওয়া প্রয়োজন। সংবিধানের ভাষা প্রাঞ্জল ও জনসাধারণের নিকট সহজবোধ্য হওয়া প্রয়োজন। সংবিধান শুধুমাত্র বিশেষজ্ঞ ও আইনজ্ঞ সুপণ্ডিতদের নিকট বোধগম্য হ'লে চলবে না। পৃথিবীর অনেকেই দেশেই সংবিধানকে অভিজাত সমাজের জন্য নির্দিষ্ট সাহিত্য বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু জনগণের সংবিধানকে সেটা হলে চলবে না। সোভিয়েত ইউনিয়নে ১৯৩৬ সালে যে সংবিধান প্রবর্তিত হয় সেই Stalin Constitution রচনার কাজ সম্পূর্ণ করতে বিশ বৎসর সময় লেগেছিল। সংবিধানের মূল খসড়াটি সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় ছাপিয়ে জনগণের মধ্যে ব্যাপক প্রচার করা হয়। জনগণের কাছ থেকে সংশোধনী প্রস্তাব আহ্বান করা হয়। কয়েক লক্ষ সংশোধনী প্রস্তাব আসে। তার থেকে প্রায় লক্ষ্য

াধিক প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং তার মূলনীতিগুলি সংবিধানের অঙ্গীভূত হয়। সেইজন্যই সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানকে যথার্থই জনগণের সংবিধান বলে দাবী করা হয়। সংবিধান প্রণয়নে বৃহৎ জনগণের ব্যাপক অংশীদারিত্ব সুনিশ্চিত করলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পক্ষে সেই সংবিধানের সংশোধন ও সংযোজনের জন্য অধিক বেগ পেতে হয় না। তা ছাড়া সংশোধন ও সংযোজনের খুব বেশী প্রয়োজনও হয় না। সংবিধানের ব্যাপকতা, গভীরতা, সুস্পষ্টতা ও সহজবোধ্যতা সুনিশ্চিত করাই সংবিধান রচনার মূলনীতি ও উপাদান বলে গণ্য হয়।

১৩.৫ সংবিধানের সংজ্ঞা ও চরিত্র

আগেই বলা হয়েছে, নানা রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সংবিধানের নানা সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন। স্যার জেম্‌স ম্যাকিনটস (Sir James Macintosh) বলেছেন একটি রাষ্ট্রের সংবিধান বলতে সেই সমস্ত লিখিত ও অলিখিত মৌলিক অনুষ্ঠানকে বোঝায় যা শাসন ক্ষমতায় উচ্চপদাধিকারীদের অধিকারকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং জনসাধারণের অত্যাবশ্যকীয় অধিকার ও সুযোগ সুবিধাকে স্বীকৃতি ও সুরক্ষা প্রদান করে। ডঃ ফাইনার (Dr. Finer)-এর মতে, রাষ্ট্র এক মানবিক সংহতি (Human grouping)-র ফলশ্রুতি যেখানে ব্যক্তি মানুষের সঙ্গে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠান ও পরিকাঠামোর এক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই ক্ষমতাকেন্দ্রিক পারস্পরিক সম্পর্ক রাষ্ট্রের সংবিধানে অভিব্যক্তি লাভ করে। লর্ড ব্রাইস (Lord Bryce) রাষ্ট্রের সংবিধানকে আইন ও প্রথার সমষ্টি বলে অভিহিত করেছেন এবং রাষ্ট্র এই আইন ও প্রথার সমষ্টির দ্বারা পরিচালিত বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। ডঃ হোয়্যার (Dr. Wheare) বলেছেন যে, সংবিধান হচ্ছে সেই আইনের সমষ্টি যার সাহায্যে ও যার মাধ্যমে সরকারী ক্ষমতা প্রযুক্ত ও কার্যকরী হয়।

ভারতের সংবিধানের সংজ্ঞা ও চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে গণপরিষদে পণ্ডিত নেহেরু বলেছিলেন যে, যদিও ভারতের সংবিধানকে আমরা একটি স্থায়ী ও দৃঢ়সংবদ্ধ দলিলরূপে দেখতে চাই তবুও মনে রাখা প্রয়োজন যে, সংবিধানের স্থায়িত্ববিধান সম্ভব নয়। কারণ সংবিধান জনগণের নিরবচ্ছিন্ন ও গতিশীল আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন।

১৯৪৬ সালের ৯ই ডিসেম্বর নতুন দিল্লীতে গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। মুসলীম লীগের সদস্যদের বাদ দিলে ২০৭ জন প্রতিনিধি ঐ অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। ৯ই ডিসেম্বর থেকে ২৩শে ডিসেম্বর পর্যন্ত গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন চলে। দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে জওহরলাল নেহরু একটি প্রস্তাব উত্থাপন করে বলেন যে, যতদিন পর্যন্ত গণপরিষদের স্থায়ী নিয়মাবলী (Permanent rules) তৈরী না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় আইনসভার (Central Legislative Assembly) নিয়মপদ্ধতি ইত্যাদি গণপরিষদের পরিচালনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। সামান্য আলোচনার পর নেহরুর প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। ১২ই ডিসেম্বর সভার কার্যবিবরণী সংক্রান্ত কমিটি (The Committee on Rules and Procedures) নির্বাচিত হয়। ১৩ই ডিসেম্বর নেহরু ভারতীয় সংবিধানের উদ্দেশ্য সংক্রান্ত প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন। ঐ প্রস্তাবে ভারতবর্ষকে সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র বলে ঘোষণা করা হয়। ঐ ঘোষণাই পরে সংবিধানের প্রস্তাবনার (Preamble) অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ভারতের সংবিধানের বুনিয়াদ রচিত হয়।

১৩.৬ সংবিধানের প্রকারভেদ ঃ লিখিত ও অলিখিত

সংবিধানকে সাধারণত সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় এবং লিখিত ও অলিখিত এই চার ভাগে ভাগ করা হয়। লিখিত সংবিধানে সংবিধানের ব্যবস্থাবলী ও বিধি বিধান একটা লিখিত দলিলে সন্নিবন্ধ করা হয়। জেমসন (Jameson)-এর মতে, লিখিত সংবিধান একটি সচেতন ও সক্রিয় প্রয়াসের ফলশ্রুতি। সরকারকে সংগঠিত ও পরিচালিত করার জন্য প্রয়োজনীয় নিয়মাবলী ও বিধি-বিধানকে সুসংহত ও সুবিন্যস্ত করার প্রয়াসের ফলশ্রুতি

এই লিখিত সংবিধান। লিখিত সংবিধান একটি নির্দিষ্ট তারিখে ও নির্দিষ্ট দলিলে নথিবদ্ধ করা যায়। ভারতবর্ষ ব্রহ্মদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানকে এর নজীর হিসেবে ধরা যেতে পারে। লিখিত সংবিধান একাধিক দলিলে একাধিক তারিখে লিপিবদ্ধ করা যায়। ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়ার সংবিধান এর উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। যখনই কোনও দেশে লিখিত সংবিধান চালু হয় তখনই সংশ্লিষ্ট দেশের সাধারণ আইন (Ordinary Laws) ও সাংবিধানিক আইন (Constitutional Law)-এর মধ্যে পার্থক্যটি সুস্পষ্টরূপে দেখা দেয়। লিখিত সংবিধান সংশোধনের জন্য বিশেষ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয়।

অলিখিত সংবিধানের চরিত্র বিশ্লেষণ করে জেমসন (Jameson) বলেছেন যে অলিখিত সংবিধান প্রধানত বহুকাল প্রচলিত প্রথা ও বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত (Judicial Decisions)-কে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে। অলিখিত সংবিধানও আইন ও সংবিধান বিশারদদের অভিজ্ঞতার ফল। অলিখিত সংবিধান কোনও সুনির্দিষ্ট দলিলে সন্নিবদ্ধ হয় না বটে ; কিন্তু কার্যকারিতাও বিশ্বাসযোগ্যতার দিক থেকে লিখিত সংবিধানের চেয়ে কোনও অংশে কম মূল্যবান নয়।

বৃটিশ সংবিধান অলিখিত এবং কার্যকারিতার বিচারে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবিধান। বৃটিশ সংবিধান বিবর্তনের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ৫০০ বছরে বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে। বৃটিশ সংবিধান সম্পর্কে ডঃ আইভর জেনিংস (Dr. Ivor Jenuings) বলেছেন যে, তাৎক্ষণিক প্রয়োজনের তাগিদে উদ্ভূত এই সংবিধান পরবর্তীকালে পরিবর্তিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতিরক্ষা করে আরও ব্যাপক ও প্রয়োজনে ভিন্নতর উদ্দেশ্যসাধনের কাজে লেগেছে। নিত্য নতুন উদ্ভাবনের এক নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এই সংবিধান বিবর্তিত হয়েছে। অলিখিত সংবিধানকে সংবিধান বিশেষজ্ঞরা জ্ঞান, চিন্তা ও অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি বলে উল্লেখ করেছেন। স্যার জেমস্ ম্যাকিনটস (Sir James Mcintosh) বলেছেন যে, সংবিধান গড়ে ওঠে, সংবিধান তৈরী করা হয় না।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে লিখিত ও অলিখিত সংবিধানের মধ্যে পার্থক্য আকৃতিগত ; প্রকৃতিগত নয়। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, প্রতিটি লিখিত সংবিধানেই কিছু অলিখিত বক্তব্য থাকে। মূলত, প্রথাগত আইন ও নজীরগুলিই এই অলিখিত অংশের উপাদানরূপে গণ্য হয়। সেইজন্য ডঃ গার্ণার (Dr. Garner) সংবিধানের এই লিখিত ও অলিখিতের বিভাগীকরণকে (Classification) বিভ্রান্তিকর ও অবৈজ্ঞানিক বলে মন্তব্য করেছেন।

১৩.৬.১ লিখিত ও অলিখিত সংবিধানের গুণাগুণ

লিখিত সংবিধানের সবচেয়ে বড় গুণ এই যে এই সংবিধান অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট (very definite) ও সুস্পষ্ট। সাধারণ মানুষ লিখিত সংবিধানের মারফৎ কোনও রাষ্ট্রব্যবস্থায় পরিচালিত সরকারের মৌলনীতি, সাংগঠনিক পরিকাঠামো, ক্ষমতা ও পরিচালন ব্যবস্থার সঙ্গে সম্যক পরিচিতি লাভ করে। লিখিত দলিলকে বোঝা জনগণের পক্ষে তুলনামূলকভাবে সহজ। তাছাড়া, লিখিত সংবিধানে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ক্ষমতা ও কার্যাবলী সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট ও ব্যাখ্যাত থাকে। লিখিত সংবিধানের মারফৎ জনসাধারণ আগাম জানতে পারেন তাঁরা কিভাবে শাসিত হতে চলেছেন।

লিখিত সংবিধানের সবচেয়ে বড় ত্রুটি হ'ল এই যে, এই সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় হ'তে বাধ্য। লিখিত

সংবিধানকে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সংশোধন করা (Amendment) সব সময়ে সম্ভব না-ও হ'তে পারে। সংশ্লিষ্ট দেশের রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত এমন হ'তে পারে যে, সেখানে কোনও প্রথা বা নজীর সৃষ্টি হওয়া কঠিন। এই অবস্থায় লিখিত সংবিধান দেশের পরিবর্তিত প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করতে ব্যর্থ হ'তে পারে।

অলিখিত সংবিধানের সবচেয়ে বড় গুণ এই যে, এই সংবিধান সাধারণভাবে নমনীয় হ'বার সম্ভাবনা থাকে। সংবিধানকে বাতিল করার প্রয়োজন হয় না, যেহেতু এই সংবিধান সংশ্লিষ্ট দেশের জনগণের পরিবর্তিত চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে চলতে পারে। যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থায় এটা সবচেয়ে বেশী প্রমাণিত হয়। তাছাড়া, সমাজ নিয়ত পরিবর্তনশীল এবং সেই পরিবর্তনশীলতার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে সংবিধানেরও বিকাশ ও বিবর্তন ঘটে। অলিখিত সংবিধানের ক্ষেত্রে এটা খুবই সহজ কাজ। কারণ, অলিখিত সংবিধানের পক্ষে সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে পরিবর্তিত হওয়া তুলনামূলকভাবে সহজ।

অলিখিত সংবিধানের সবচেয়ে গুরুতর ত্রুটি হ'ল এই যে সংবিধান অনিশ্চিত ও অস্পষ্ট। সাধারণ মানুষ দেশের সাংবিধানিক ব্যবস্থাকে সব সময় বুঝতে সক্ষম না-ও হতে পারে। সেক্ষেত্রে একজন নাগরিকের পক্ষে এমন কোনও দলিলের নজীর সামনে হাজির করা সম্ভব নয়—যার সাহায্যে দেশের প্রশাসন ব্যবস্থা ও তার পরিকাঠামোকে বুঝতে সক্ষম হয়। অলিখিত সংবিধানকে অনুধাবন করতে যে উচ্চমানের রাজনৈতিক জ্ঞান ও চেতনা থাকা প্রয়োজন সেটা সব সময় সব দেশের নাগরিকের পক্ষে সম্ভব না-ও হতে পারে। লর্ড ব্রাইস (Lord Bryce) যথার্থই বলেছেন যে, অলিখিত সংবিধান স্বভাবতই অস্থিতিশীল (unstable) এবং এই সংবিধানে সুসংহতি ও স্থায়িত্বের (Solidarity and permanence) কোনও নিশ্চয়তা নেই।

১৩.৭ শ্রেষ্ঠ সংবিধানের লক্ষণ ও উপাদান

একটি আদর্শ সংবিধানের কিছু সুনির্দিষ্ট গুণাবলী আছে। সংবিধানকে সুস্পষ্ট ও বোধগম্য হ'তে হবে। একটি সুনির্দিষ্ট দলিলে এই সংবিধান লিপিবদ্ধ থাকবে ; যাতে করে দেশের প্রতিটি মানুষ তার দেশের সাংবিধানিক ব্যবস্থা ও পরিকাঠামোকে সহজে বুঝতে পারে। সংশ্লিষ্ট দলিলের ভাষা দুর্বোধ্য হ'লে চলবে না। সংবিধান অতি সংক্ষিপ্ত বা অতি বিস্তারিত কোনটাই হ'লে চলবে না। যদি সংবিধান আকারে ও বিষয়বস্তুতে অতি বৃহৎ হয়, তবে সাধারণ মানুষের পক্ষে সেটাকে অনুধাবন করা কঠিন হবে। সেক্ষেত্রে অনাগত প্রজন্মের পক্ষে সুবৃহৎ সংবিধানে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজন ঘটিয়ে তাকে তাদের পরিবর্তিত প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে গড়ে তোলা সম্ভব হয় না। একই সঙ্গে সংবিধান অতি সংক্ষিপ্ত হ'লে চলবে না। অতি সংক্ষিপ্ত সংবিধান অতি বৃহৎ সংবিধানের মতই সমানভাবে ক্ষতিকর। আদর্শ সংবিধানকে অত্যন্ত দুষ্পরিবর্তনীয় হ'লে চলবে না—তাহলে তাকে পরিবর্তন করা দুঃসাধ্য হবে। আবার সংবিধান ততটা সুপরিবর্তনীয় হওয়াও বাঞ্ছনীয় নয় যাতে শাসক শ্রেণীর অকারণ হস্তক্ষেপে তার মূলনীতি থেকে বিচ্যুত হ'তে পারে। লর্ড ব্রাউহাম (Lord Broughum)-এর মতে সংবিধান বিকশিত ও বিবর্তিত হবে (grow and evolve); সংবিধান হবে মৌল চরিত্রসম্পন্ন পরিপক্ক এবং সহনশীল।

ভারতের সংবিধান প্রবর্তিত হওয়ার সময় গণপরিষদে পণ্ডিত নেহরু বলেছিলেন যে, যদিও আমরা আমাদের

সংবিধানে স্থায়ী ও দৃঢ় সংবদ্ধ করে তুলতে চাই, তবুও আমাদের মনে রাখতে হবে যে সংবিধানে স্থায়িত্ব বলে কোনও উপাদান নেই।

১৩.৮ সংবিধানের বিকাশ ও বিবর্তন

পৃথিবীর যে কোনও রাষ্ট্রের সংবিধানে নিরবিচ্ছিন্ন বিকাশ ও বিবর্তনের প্রক্রিয়া চলে। সংবিধান যে উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক তা হ'ল সংশ্লিষ্ট দেশের জনসাধারণের স্থায়ী কল্যাণসাধন। সংবিধানের বিকাশ ও বিবর্তন আপনা-আপনি ঘটে না। এই প্রক্রিয়ার পিছনে রাষ্ট্রের রাজনীতিবিদ্ শাসক ও জনগণের সক্রিয় প্রয়াস ক্রিয়াশীল থাকে।

অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, প্রত্যেক দেশেই কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কিছু প্রথার সৃষ্টি হয়। এই প্রথাগুলি সংবিধানের বিশুষ্ক আইনী কাঠামোতে প্রাণসঞ্চার করতে খুবই সাহায্য করে। যদিও প্রথাগুলি (Conventions) লিখিত নয়, তবুও সেগুলি সংবিধানের অপরিহার্য অঙ্গ বলে বিবেচিত হয় এবং এইগুলি যাতে সংবিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে যথাযোগ্য মর্যাদালাভ করতে পারে তার জন্য সব রকম প্রয়াস নেওয়া হয়।

সংবিধানের বিকাশ ও বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় সংশোধনের (amendment) ভূমিকা অসাধারণ। বিচার বিভাগের সিদ্ধান্ত ও ব্যাখ্যাও সংবিধানের বিকাশ ও বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে। অনেক রাষ্ট্রেই সংবিধান সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের বিচার ব্যবস্থার ব্যাখ্যার ভিতর দিয়ে বিকশিত হয়। সংবিধানের বিভিন্ন ধারাকে দেশের সর্বোচ্চ বিচারালয় যেভাবে ব্যাখ্যা করে সেইভাবেই সেটা সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রীয় সমাজে আইনী প্রতিষ্ঠা ও স্বীকৃতিলাভ করে। এটা সর্বজনবিদিত যে, ভারতের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত মৌলিক অধিকারের চরিত্র নির্ধারিত হয়েছে অনেকটাই ভারতের সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্ত ও ব্যাখ্যার দ্বারা। সংবিধানের ব্যাখ্যা উদারনৈতিক না কঠোর হবে—সেটা নির্ভর করবে প্রধানত সুপ্রীম কোর্টের ব্যাখ্যার উপরই। বিচার বিভাগের ব্যাখ্যা বা রায়দানের ফলশ্রুতিতে একটা দেশের সংবিধানের মূল চরিত্রটাই পাল্টে যেতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি মিঃ হিউজেস (Mr. Huges) বলেন যে, বিচারপতিরা যেমন সংবিধানের আজ্ঞাবাহক তেমনি সংবিধান কেমন হবে তা বলার অধিকারীও বিচারপতিরাই ''('We are under the Constitution but the Constitution is what the Judges say it is')''। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের অন্যতম বিচারপতি মিঃ ফ্রাঙ্ক ফুর্টার বলেছেন যে, দেশের সর্বোচ্চ আদালতই দেশের সংবিধান (Supreme Court is the Constitution)।

সংবিধানকে বিকশিত করতে সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হ'ল তার সংশোধন প্রক্রিয়া। কোনও সংবিধানই চিরস্থায়ী হয় না। সংবিধান সুদূর অনাগত দিনের প্রজন্মের জন্য সব ব্যবস্থা করে যেতে পারে না। এটা আশা করা অন্যায় হবে যে, কোনও দেশের সংবিধান রচয়িতারা সকলেই হবেন ত্রিকালদর্শী এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের প্রয়োজনের পরিপূরক সব ব্যবস্থাই সংবিধানে রেখে যাবেন।

১৩.৯ অনুশীলনী

ক। (১) নিম্নলিখিত কোন্ দেশের সংবিধান সুপরিবর্তনীয় ঃ
ব্রিটেন, ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

(২) নিম্নলিখিত কোন্ দেশের সংবিধান বিশ্বের ক্ষুদ্রতম সংবিধান ঃ
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ভারতবর্ষ।

খ। (১) আধুনিক রাষ্ট্রে সংবিধানের প্রয়োজনীয়তা সংক্ষেপে বিবৃত করুন।

(২) সুপরিবর্তনীয় সংবিধানের অত্যাবশ্যকীয় লক্ষণ কি?

(৩) সুপরিবর্তনীয় সংবিধানের উল্লেখযোগ্য গুণ কি?

গ। (১) উদাহরণসহ সাধারণ আইন ও সাংবিধানিক আইনের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করুন।

(২) একটি রাষ্ট্রের সংবিধানের মৌল উপাদানগুলি কি কি?

(৩) একটি আদর্শ সংবিধানের অপরিহার্য লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

(৪) সংবিধান সংশোধনের একটি সর্বজনগ্রাহ্য পদ্ধতি নির্দেশ করুন।

১৩.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১। ভারতের সংবিধান পরিচয়—ড় দুর্গাদাস বসু
[বঙ্গানুবাদ ঃ ড. রমেন মজুমদার (১৯৯৪)]

২। Political Theory-V.D. Mahajan (4th Edn. 1988)

একক—১৪ ❐ সরকার ও তার বিভিন্ন রূপ

গঠন

১৪.০ উদ্দেশ্য
১৪.১ প্রস্তাবনা
১৪.২ সরকারের শ্রেণীবিভাগ
১৪.৩ সরকার বা শাসনব্যবস্থার শ্রেণী বিভাজনের সমস্যা
১৪.৪ এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা শ্রেণী বিভাজনের সমস্যা
১৪.৪.১ এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার গুণাগুণ
১৪.৫ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা
১৪.৫.১ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার গুণাগুণ
১৪.৬ আধুনিক যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রিকরণের প্রবণতা
১৪.৭ অনুশীলনী
১৪.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১৪.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি বুঝতে পারবেন ঃ

- সরকার কাকে বলে ও তার শ্রেণীবিভাগ
- এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার পার্থক্য
- আধুনিক যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রিকরণের প্রবণতার ধরণ।

১৪.১ প্রস্তাবনা

সরকার হ'ল একটি প্রতিষ্ঠান বা যন্ত্র যার মাধ্যমে বিমূর্ত রাষ্ট্র তার ইচ্ছাকে গঠন ও কার্যকর করে। বাস্তবিক সরকারই রাষ্ট্রের ইচ্ছাকে আইনে রূপান্তরিত করে এবং আইনের সাহায্যে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করে। যাদের ওপর রাষ্ট্র পরিচালনার ভার ন্যস্ত থাকে তাদের সমষ্টিগতভাবে সরকার বা শাসনব্যবস্থা বলা হয়। সংক্ষেপে সরকার বলতে সাধারণত আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগকেই বোঝায়। এক কথায়, সরকার হ'ল রাষ্ট্রের একটি সংস্থা বা যন্ত্র। রাষ্ট্রবিদ্ গার্ণার মনে করেন, সরকার হ'ল একটি কার্যনির্বাহী মাধ্যম বা যন্ত্র যার মাধ্যমে সরকারের সাধারণ নীতি নির্ধারিত হয় এবং যার দ্বারা সাধারণ কাজকর্ম নিয়ন্ত্রিত হয় ও সাধারণ স্বার্থ সাধিত হয় (Government is the agency or machinery through which common policies are determined and by which common affairs are regulated and common interests promoted.)।

১৪.২ সরকারের শ্রেণীবিভাগ

সরকার বা শাসনব্যবস্থা কাঠামো, প্রকৃতি কার্যপদ্ধতি এবং পারস্পরিক সম্পর্ক সকল রাষ্ট্রে এক রকম নয়। আর এই কারণে সরকার বা শাসনব্যবস্থার শ্রেণীবিভাগ করা অত্যন্ত জরুরী। বস্তুত, এই শ্রেণীবিভাগের কাজটি অতি প্রাচীনকাল থেকেই রাষ্ট্র-দার্শনিকরা করে আসছেন। তাঁরা মূলত দু'টি মানদণ্ডের ভিত্তিতে সরকার বা শাসনব্যবস্থাগুলিকে শ্রেণীবিন্যস্ত করেছেন। এর একটি হ'ল শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তির সংখ্যা অনুযায়ী, যার সেরা উদাহরণ অ্যারিস্টটলের শ্রেণীভাগ। অন্যটি হ'ল, রাষ্ট্র বা সরকারের সংগঠনের ধরন বা রূপের ভিত্তিতে, যার অন্যতম নিদর্শন হ'ল রাষ্ট্রবিদ ম্যারিয়ট (Marriot) বা লীকক (Leacock) অনুসৃত পদ্ধতি।

সরকার বা শাসনব্যবস্থার প্রাচীনতম শ্রেণীবিভাগের উদাহরণ প্লেটো ও অ্যারিস্টটল-এর শ্রেণীবিভাগ। প্লেটো তাঁর 'স্টেটসম্যান' এ তিন ধরনের সরকারের কথা বলেছেন এবং জ্ঞান বা আইনের প্রতি আনুগত্যকে এই শ্রেণীবিভাগের ভিত্তি হিসেবে ধরেছেন। তাঁর কথামত, সরকারের প্রথমটি হ'ল রাজতন্ত্র যা হ'ল একটি আদর্শ শাসনব্যবস্থা, কারণ এখানে জ্ঞানই সার্বভৌম ও শাসন পরিচালিত হয় যুক্তির দ্বারা। দ্বিতীয়টি হ'ল অভিজাততন্ত্র যেখানে আইনের প্রয়োজন হয় এবং সে আইন মান্যও হয়, কিন্তু যুক্তি-বুদ্ধির সার্বভৌমত্ব থাকে না। আর তৃতীয় ধরনটি হ'ল গণতন্ত্র বা তাঁর বিচারে অজ্ঞানের রাজত্ব, কারণ সেখানে আইনের অস্তিত্ব থাকে কিন্তু মান্য করা হয় না।

অন্যদিকে অ্যারিস্টটল তাঁর 'পলিটিক্স' গ্রন্থে শাসনব্যবস্থার যে শ্রেণীবিভাগ করেছেন তার অনেকটাই প্লেটো অনুসৃত পদ্ধতি। অ্যারিস্টটলের শ্রেণীবিভাগ দু'টি বিষয় নির্ভরশীল ; তার একটি শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তির সংখ্যা এবং অন্যটি রাষ্ট্রের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বলেন, অ্যারিস্টটলের শ্রেণীবিভাগের দ্বিতীয়টি হ'ল মূল মানদণ্ড প্রথমটি অর্থাৎ শাসকের সংখ্যার ভিত্তিটি ছিল অপেক্ষাকৃত গৌণ। এই দুটি মানদণ্ডের সাহায্যে সমসাময়িক সব শাসনব্যবস্থাকে শ্রেণীবিভক্ত করে অ্যারিস্টটল দেখিয়েছিলেন সরকার বা শাসনব্যবস্থা ছয় ধরনের—(১) রাজতন্ত্র (Monarchy) ঃ যেখানে শাসনকর্তৃত্ব একজনের হাতে ন্যস্ত থাকে, কিন্তু তা পরিচালিত হয় সবার কল্যাণে আর তার জন্য এটি হ'ল, অ্যারিস্টটলের ধারণায়, সর্বশ্রেষ্ঠ শাসনব্যবস্থা ; (২) স্বৈরতন্ত্র (Tyranny) ঃ যা আসলে রাজতন্ত্রের বিকৃত রূপ, যেখানে শাসনকর্তৃত্ব একজনের হ'লেও তা পরিচালিত হয় তার নিজের স্বার্থেই ; (৩) অভিজাততন্ত্র (Aristocracy) ঃ এই শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয় কতিপয় ব্যক্তির দ্বারা কিন্তু তার লক্ষ্য সবার কল্যাণ, তাই অ্যারিস্টটলের কথায় এটি একটি উত্তম শাসনব্যবস্থা ; (৪) ধনিকতন্ত্র (Oligarchy) ঃ যা অভিজাততন্ত্রের বিকৃত রূপ, যেখানে কতিপয় ব্যক্তি শাসনক্ষমতা দখল করে এবং তাকে তাদের গোষ্ঠীস্বার্থ সিদ্ধ করার জন্য ব্যবহার করে ; (৫) গণতন্ত্র (Polity) ঃ যেখানে ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে সমগ্র রাজনৈতিক সমাজের হাতে এবং তা সবার স্বার্থে পরিচালিত হয় ; এবং (৬) জনতাতন্ত্র (Democracy) ঃ যা আসলে গণতন্ত্রের বিকৃত রূপ। এই ব্যবস্থায় ক্ষমতা বহুজনের হাতে ন্যস্ত থাকলেও তা কেবল শাসক সম্প্রদায়ের স্বার্থে পরিচালিত হয়।

অ্যারিস্টটল অনুসৃত শ্রেণীবিভাগটি দীর্ঘদিন ধরে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের কাছে নির্দেশিকার কাজ করেছে। পরবর্তীকালে ম্যাকিয়াভেলি (Machiavelli), বোঁদা (Bodin), হবস (Hobbes) প্রমুখ অ্যারিস্টটলের 'সংখ্যার ভিত্তিতে সরকারের শ্রেণীবিভাগের মূল নীতিটিকে গ্রহণ করে শাসনব্যবস্থার শ্রেণীবিভাগ করেছিলেন। অবশ্য

অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী লেখক মঁতেস্কু (Moutesqaiu) একই ধরনের এক শ্রেণীবিভাগ করেছিলেন। তাঁর কথায়, সরকার মূলত তিন ধরনের—(১) প্রজাতন্ত্র (Republic) ঃ যার দুটি মুখ্য রূপ—গণতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্র ; (২) রাজতন্ত্র (Monarchices) ঃ যা মূলত ইউরোপীয় দেশগুলির রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং (৩) স্বৈরতন্ত্র (Despotism) ঃ যে ব্যবস্থা প্রধানত প্রাচ্যের দেশগুলির বৈশিষ্ট্য।

তবে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিক থেকেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা নতুন করে সরকারের শ্রেণীবিভাগের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। সম্ভবত, নতুন ধরনের শাসনব্যবস্থার উদ্ভব ছিল এর কারণ। রাষ্ট্রবিদ বার্জিস (J. W. Burgess) তাঁর Political Science and Constitutional Law গ্রন্থে একটি নতুন শ্রেণীবিভাগের কথা বলেন। আধুনিক শাসনব্যবস্থার শ্রেণীবিভাগ করতে গিয়ে বার্জিস চারটি মানদণ্ড ব্যবহার করেন ; সেগুলি হ'ল—(১) রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে একাত্মতা, (২) শাসক পদের প্রকৃতি, (৩) আইন ও শাসনবিভাগের সম্পর্ক এবং (৪) ক্ষমতার বন্টন। প্রথম মানদণ্ডের সাহায্যে তিনি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দ্বিতীয়টির সাহায্যে প্রজাতান্ত্রিক ও বংশগত শাসনক্ষমতার মধ্যে, তৃতীয়টির দ্বারা সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতি চালিত শাসনব্যবস্থার মধ্যে এবং শেষেরটিকে ব্যবহার করে এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্যগুলি উপস্থাপনের চেষ্টা করেন।

তবে সরকারের আধুনিক শ্রেণীবিভাগ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রবিদ ম্যারিয়ট (Sir John A. R. Marriot)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর শ্রেণীবিভাগ আধুনিক ও বিস্তৃত। মূলত তিনটি মাপকাঠির সাহায্যে তিনি সরকারের শ্রেণীবিভাগ করেন। প্রথমটি হ'ল ক্ষমতা বন্টনের অনুসৃত নীতির ভিত্তিতে শাসনব্যবস্থার দ্বৈত বিভাজন—এককেন্দ্রিক যুক্তরাষ্ট্র। দ্বিতীয়টি সংবিধান সংশোধনের পদ্ধতি মোতাবেক সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনব্যবস্থা। আর তৃতীয়টির ভিত্তি আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক—যার ফলশ্রুতি সরকারের তিনটি বিভাজন ঃ স্বৈরতন্ত্র, যেখানে শাসন বিভাগের নিরঙ্কুশ আধিপত্য সংসদীয় বা মন্ত্রীপরিষদ চালিত যেখানে আইনগত সন্দেহাতীত প্রাধান্য এবং রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার যেখানে আইনসভা ও শাসনবিভাগ পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে।

ম্যারিয়টকে অনুসরণ করে রাষ্ট্রবিদ লীকক (Dr. Stephen Leacock) সরকারের যে শ্রেণীবিভাগ করেছেন তা আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের স্বীকৃতি লাভ করেছে। লীকক প্রথমেই সব ধরনের শাসনব্যবস্থাকে দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন—স্বৈরতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক। এরপর গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে তিনি দু'ভাগে ভাগ করেছেন—সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র। আবার এর প্রত্যেকটিকে ক্ষমতা বন্টনের প্রকৃতির ভিত্তিতে দু'ভাগে ভাগ করেছেন—এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয়। লীককের মতে, এই দু'টি ব্যবস্থারও আবার দু'টি রূপ—সংসদীয় বা মন্ত্রীসভা চালিত ও রাষ্ট্রপতি চালিত সরকার।

তবে, লীকক কর্তৃক উত্থাপিত ছকটি ইদানিংকালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা আর গ্রহণযোগ্য মনে করেন না। এর অনেকগুলি কারণ আছে। কারণগুলির একটি হ'ল, সাম্প্রতিককালে আরও নানা ধরনের শাসনব্যবস্থা দেখা দিয়েছে, যেগুলি লীককের ছকের মধ্যে ছিল না। একটি উদাহরণ বিষয়টিকে স্পষ্ট করতে পারে। লীকক প্রথমেই সরকারকে স্বৈরতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক—এই দু'ভাগে ভাগ করেছেন এবং তারপর গণতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ করেছেন ; কিন্তু স্বৈরতন্ত্র বা আধুনিক পরিভাষায় নায়কতন্ত্রের বিভিন্ন ধরনকে উল্লেখ করেন নি। আর একটি উদাহরণ হ'ল লীককের আলোচনায় সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বা তার কোনও ধরনই স্থান পায়নি।

যাই হোক, লীককের ছককে ভিত্তি করে বিভিন্ন শাসনব্যবস্থার শ্রেণীবিভাগের জন্য একটি বিস্তৃত ছক নির্মাণ করা যায়। প্রথমত, প্রকৃতির দিক থেকে সরকার তিন ধরনের হ'তে পারে—এক, নায়কতান্ত্রিক বা

স্বৈরতান্ত্রিক ; দুই উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ; এবং তিন সমাজতান্ত্রিক। দ্বিতীয়ত, এইসব সরকারের আবার বিভিন্ন রূপ থাকতে পারে এবং দায়বদ্ধতা, ক্ষমতার বন্টন ক্ষমতার স্বাতন্ত্রীকরণ ইত্যাদির ভিত্তিতে উল্লিখিত রূপগুলিকে শ্রেণীবিন্যস্ত করা যায়। যেমন, নায়কতন্ত্র দু'ধরনের হয়—(১) সামরিক নায়কতন্ত্র এবং (২) সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী নায়কতন্ত্র। আবার গণতন্ত্র ও এককেন্দ্রিক, যুক্তরাষ্ট্রীক, সংসদীয় বা মন্ত্রীসভাচালিত ও রাষ্ট্রপতি পরিচালিত হ'তে পারে। সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার ধরন দুটি হ'তে পারে—(১) সর্বহারার একনায়কতন্ত্র এবং (২) জনগণতন্ত্র।

সরকারের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কিত আলোচনায় প্রসঙ্গত আরও একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। রাষ্ট্রবিদ ডেভিড ইস্টন (David Easton), অ্যালান বল (Alan R. Ball), অ্যামন্ড ও পাওয়েল (Almond and Powel) প্রমুখ ব্যক্তি সরকারের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কিত উপরিউক্ত আলোচনাধারাকে অসম্পূর্ণ ও অবৈজ্ঞানিক বলে মনে করেন। তাঁদের ধারণায় কেবলমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক বা কাঠামোগত আনুষ্ঠানিক রূপটির মধ্যে সরকারের মূল প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায় না, বরং দেশের ঐতিহাসিক ভৌগোলিক অর্থনৈতিক মনস্তাত্ত্বিক কিম্বা সামাজিক বিষয়গুলি সরকারের রূপ ও মূল প্রকৃতিকে প্রভাবিত করে। এইসব কারণে আধুনিক এইসব রাষ্ট্রবিদ সরকার ও তার শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কিত আলোচনার পরিবর্তে রাজনৈতিক ব্যবস্থার (Political System) শ্রেণীবিভাগের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। যেমন—রাষ্ট্রবিদ বল বলেন—'A more rewarding approach to the problems of classifications woulds be to classify types of political systems rather than to concentrate on types of Government.' রাষ্ট্রবিদ ইস্টন বলেন, সমাজের সবরকম রাজনৈতিক কার্যকলাপ ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির গঠন প্রকৃতি ও ক্রিয়াকলাপকে ঘিরে একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার জন্ম হয়। এ কারণেই রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিভিন্ন অংশ পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল।

অ্যালান বল রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন। এগুলি হল ঃ (১) উদার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা (Liberal Democratic System) ; (২) সর্বাত্মক ব্যবস্থা (Totalitarian System) এবং (৩) স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা (Autocratic System)। বলে ধারণায় উদার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এককেন্দ্রিক বা যুক্তরাষ্ট্রিক হ'তে পারে এবং মন্ত্রীসভা শাসিত বা রাষ্ট্রপতি শাসিতও হ'তে পারে। আবার সর্বাত্মক ব্যবস্থা সাম্যবাদী অথবা ফ্যাসীবাদী হ'তে পারে। আর স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থারও দুটি রূপ থাকতে পারে—সাবেকী ও আধুনিক। তা ছাড়া আধুনিক স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা কখনও সামরিক কখনও বা অসামরিক হ'তে পারে।

১৪.৩ সরকার বা শাসনব্যবস্থার শ্রেণীবিভাজনের সমস্যা

বিভিন্ন রাষ্ট্রবিদ্ যাঁদের মধ্যে আছেন ইস্টন, অ্যামন্ড ও পাওয়েল কিম্বা বল প্রমুখ, সরকার বা শাসনব্যবস্থার শ্রেণীবিভাগের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁদের মতে, কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিক বা সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে দেখে তার ভিত্তিতে শাসনব্যবস্থার শ্রেণীবিভাগ করলে তা বাস্তব বা প্রকৃত শাসনব্যবস্থাকেও তার প্রকৃতিকে অনুধাবন করতে সাহায্য করে না। বরং দেখা যায়, সরকারের নীতিনির্ধারণ ও সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে সরাসরি শাসনব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত নয় এবং সংবিধান অনুসারে গঠিত নয় এমন বহু সংঘ ও প্রতিষ্ঠান প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেয়।

এইসব কারণে, বিভিন্ন দেশের সরকারের আনুষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে মিল থাকলেও সরকারের কার্যগত

উপাদানের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। যেমন—ব্রিটেন ও ভারত—উভয় দেশেই সংসদীয় শাসনব্যবস্থা প্রচলিত থাকলেও দুই দেশের সংসদীয় শাসনব্যবস্থার উপাদানগুলি একরকম হয় না। লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো, নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি বহুদলীয় ব্যবস্থা প্রভৃতি ভারতের সংসদীয় শাসনব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। অন্যদিকে ব্রিটেনের সংসদীয় শাসনব্যবস্থার অপরিহার্য উপাদান হ'ল অলিখিত সংবিধান ও এককেন্দ্রিক কাঠামো বংশানুক্রমিক অথচ সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্র ইত্যাদি। আবার ফ্যাসীবাদী ও নাৎসীবাদী একনায়কতন্ত্র এবং সর্বহারার একনায়কতন্ত্র নামে অনেকটা এক হলেও কর্মসূচী লক্ষ্য ও প্রকৃতিগত বিচারে এক নয়।

তেমনি সরকারের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির নাম এক হ'লেও বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় তাদের ভূমিকা স্বতন্ত্র হয়ে থাকে। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপ্রধানের নাম 'রাষ্ট্রপতি' (President)। কিন্তু উভয় দেশের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা এক নয়। মার্কিন রাষ্ট্রপতি প্রকৃত অর্থেই দেশের শাসনপ্রধান (Real Head)। কিন্তু ভারতের রাষ্ট্রপতি হলেন নামসর্বস্ব প্রধান বা নিয়মতান্ত্রিক প্রধান (Constitutional Head)। সম্ভবত, সে কারণে রাষ্ট্রবিদ বল মন্তব্য করেন—Political institutions with the same lable may carry out different functions in the political processes of different States.

এ ছাড়াও অনেক রাষ্ট্রবিদ সরকারের শ্রেণীবিভাগের আরও কতকগুলি অসুবিধার কথা বলেন। তার একটি হ'ল শ্রেণীবিভাগ করতে গিয়ে বেশির ভাগ সময়েই রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মূল্যমান নিরপেক্ষ (Value free) হ'তে পারেন না। দ্বিতীয়ত, এমন অনেক শাসনব্যবস্থা আছে, সেগুলিকে এই শ্রেণীবিন্যাসের ছকের মধ্যে ফেলা যায় না। তৃতীয়ত, বিশ্বের বিশেষ করে আফ্রিকা ও এশিয়ার কোনও কোনও দেশের শাসনব্যবস্থা নিয়ে এই সমস্যায় পড়তে হয়। যেমন—ইরাক, ইরান বা মিশরের শাসনব্যবস্থাগুলি আক্ষরিক অর্থে নায়কতান্ত্রিক নয়, আবার সেগুলিকে উদার গণতান্ত্রিকও বলা যায় না।

১৪.৪ এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা শ্রেণীবিভাজনের সমস্যা

ক্ষমতার বন্টনের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে দু'টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। সংবিধান অনুসারে ক্ষমতা একটি কেন্দ্রে ন্যস্ত থাকলে তাকে বলা হয় এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা। অন্যদিকে সংবিধান অনুসারে ক্ষমতা আঞ্চলিক ভিত্তিতে বিভিন্ন কেন্দ্রের মধ্যে বন্টিত হ'লে তাকে বলে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা। রাষ্ট্রবিদ গার্ণার এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন সরকারের সেই রূপকেই এককেন্দ্রিক বলা হয় যাতে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ শাসনক্ষমতা একটি মাত্র সংস্থা অথবা সংস্থাগুচ্ছের মধ্যে অবস্থিত এবং একটি মাত্র কেন্দ্র থেকে পরিচালিত হয় ও কেন্দ্রীভূত থাকে (Unitary Government is that form in which the supreme governing authority of a State is concentrated in a single organ or set or organs, established at and operating from a common centre)। আইনবিদ্ ডাইসি তাঁর সংজ্ঞায় সর্বোচ্চ আইন প্রণয়নের ক্ষমতার ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি বলেন, একটি কেন্দ্রীয় শক্তি সর্বোচ্চ আইন প্রণয়নের 'বৈধ ক্ষমতার' অধিকারী হ'লে সেই শাসনব্যবস্থাকে এককেন্দ্রিক বলা যায় (....the habitual exercise of supreme legislative authority by one central power)। অবশ্য ইচ্ছে করলে বা প্রয়োজন হ'লে এককেন্দ্রিক সরকার ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করতে পারে বা অন্য কোনও সংস্থাকে আইন তৈরীর

ক্ষমতা দিতে পারে। কিন্তু, সেক্ষেত্রেও এককেন্দ্রিক ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতাই সর্বোচ্চ ; কেন্দ্রীয় আইনসভা প্রণীত আইনই সর্বোচ্চ। যেসব সংস্থার হাতে ক্ষমতা বিকেন্দ্রিত হয়, তাদের ক্ষমতার উৎসাহ কেন্দ্রীয় সরকার এবং সেজন্য তারা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন। মনে রাখা দরকার, এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা।

বিশিষ্ট সংবিধান বিশেষজ্ঞ সি. এফ. স্ট্রং বলেন এককেন্দ্রিক সরকারের বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য হ'ল কেন্দ্রীয় আইনসভার আইনগত প্রাধান্য ; ডাইসি যাকে বলেন 'আইনসভার সার্বভৌমত্ব'। দ্বিতীয়টি হ'ল অন্য কোনও সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন সংস্থার অনস্তিত্ব। কেন্দ্রীয় আইনসভার প্রাধান্য বলতে কী বোঝায়, তা ব্যাখ্যা করে ডাইসি বলেন, এর অর্থ—প্রথমত, কেন্দ্রীয় আইনসভা যে কোনও আইন তৈরী করতে পারে বা কোনও প্রচলিত আইন বাতিল করতে পারে ; দ্বিতীয়ত, আইনসভার তৈরী আইনকে রদ করার অধিকার অন্য কারও থাকে না এবং তৃতীয়ত, কেন্দ্রীয় আইনসভা দ্বারা সৃষ্ট আইন দেশের সর্বত্র প্রযোজ্য হয়।

এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার আর একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল, এই ব্যবস্থার সংবিধানের প্রাধান্যের পরিবর্তে আইনসভার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত থাকে। এই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় অন্য সব আইন তৈরীর সংস্থাগুলিকে অধীনস্থ করার মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ, গোটা দেশের জন্য প্রযোজ্য আইন তৈরীর চূড়ান্ত অধিকারী একমাত্র আইনসভা। স্ট্রং (Strong) একেই বলেন, 'সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন অন্য কোনও সংস্থার অনস্তিত্ব'।

এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার আর একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল এখানকার সংবিধান লিখিত হ'তে পারে, অলিখিতও হ'তে পারে। নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের সংবিধান লিখিত, কিন্তু ইংল্যান্ডের সংবিধান অলিখিত। তবে লিখিত-অলিখিত যাই হোক না কেন, এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা যেসব দেশে আছে, সেখানকার সংবিধান সুপরিবর্তনীয় বা নমনীয়।

১৪.৪.১ এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার গুণাগুণ

এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার কতকগুলি উল্লেখযোগ্য সুবিধা আছে। যেমন—

(১) এই শাসনব্যবস্থার একটি প্রধান গুণ সমগ্র দেশে একই আইন, একই কর্মসূচী এবং একই শাসনপদ্ধতি অনুসৃত হয়। ফলে শাসনকার্য পরিচালনায় যেমন জটিলতা কম হয়, সরকারও তেমন প্রকৃত অর্থে ক্ষমতাসম্পন্ন ও শক্তিশালী হয়।

(২) এককেন্দ্রিক ব্যবস্থার আর একটি সুবিধা হ'ল, নাগরিকদের আনুগত্য একটিমাত্র শাসনব্যবস্থার প্রতি থাকার দরুণ আঞ্চলিকতার সমস্যা মাথাচাড়া দেয় না এবং তার ফলে বিচ্ছিন্নতাকামী শক্তিগুলি বেড়ে ওঠার সুযোগ পায় না। বরং, একই ধরনের আইন ও শাসনব্যবস্থা দেশের ঐক্য ও সংহতিকে সুনিশ্চিত করে।

(৩) এই শাসনব্যবস্থার ক্ষমতা একাধিক সরকারের মধ্যে বণ্টিত হয় না। ফলে কেন্দ্র ও অঞ্চলের মধ্যে ক্ষমতা নিয়ে বিরোধ-বিসংবাদের সম্ভাবনা থাকে না।

(৪) এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার আর একটি বড় সুবিধা হ'ল সংবিধানের নমনীয়তা। এর ফলে পরিবর্তিত সামাজিক চাহিদার সাথে সংগতি রেখে সংবিধান পরিবর্তন সহজসাধ্য হয়।

(৫) শাসনব্যবস্থার সরলতা ও ব্যয়সংক্ষেপ এই শাসনব্যবস্থার আর একটি গুণ। বাস্তবিক কেন্দ্র ও অঞ্চলের দু'ধরনের আইন ও প্রশাসন গড়ে না ওঠার দরুন এই সুবিধা পাওয়া যায়। এবং

(৬) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের জগতে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা খুবই উপযোগী। একটিমাত্র শাসনকেন্দ্র থাকার ফলে আন্তর্জাতিক দায়-দায়িত্ব পালন অনেক বেশি সহজসাধ্য হয়।

তবে, এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার অসুবিধার কথাও একই সাথে মনে রাখা দরকার। যেমন—

(১) একটি মাত্র সরকারের হাতে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে ক্ষমতার অপব্যবহার বা স্বৈরতান্ত্রিক শক্তির সৃষ্টির সম্ভাবনা থেকে যায়। এই সম্ভাবনা বা ঘটনা গণতন্ত্রের বুনিয়াদকে দুর্বল করে। তাছাড়া ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ না হওয়ার দরুণ সরকারের কাজেকর্মে অংশ নেওয়ার সুযোগ কমে যায়, যা শেষ পর্যন্ত নাগরিকদের রাজনৈতিক চেতনার বিস্তার রুদ্ধ করে।

(২) এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় গড়ে ওঠা একই ধরনের আইন ও প্রশাসন বিভিন্ন অঞ্চলের স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্যের পক্ষে ক্ষতিকর। সাধারণভাবে ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি কিংবা অর্থনৈতিক অবস্থার তারতম্য বিভিন্ন অঞ্চলের বৈচিত্র্য আনে। আর দেশের ঐক্য বলতে আঞ্চলিক বৈচিত্র্যের অবলুপ্তি বোঝায় না—বরং স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্যকে বজায় রেখেই ঐক্য স্থাপিত হ'তে পারে।

(৩) আধুনিক রাষ্ট্রগুলি কেবল আয়তনেই বড় নয়, জনসংখ্যার দিক থেকে বিশাল। তার ফলে, দেশের নানা প্রান্তে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সবসময় দেখা যায়। অভিজ্ঞতায় স্পষ্ট এইসব সমস্যা সমাধানে এককেন্দ্রিক ব্যবস্থা তেমনভাবে কার্যকর হয় না। একটি উদাহরণ বিষয়টিকে সহজবোধ্য করতে পারে। জাতিগোষ্ঠীগুলির যে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আজ সমগ্র পৃথিবীতে স্বীকৃত, সেই আত্মনিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনুধাবন করতে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার পরিচালকরা প্রায়শ ব্যর্থ হন।

(৪) ক্ষমতা একটি মাত্র সরকারের হাতে থাকলে তার পক্ষে দায়ভারে ভারাক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে। অথচ, বর্তমানে রাষ্ট্রগুলির দায়দায়িত্ব ও কার্যাবলী অনেক বেড়ে গিয়েছে। অধুনা রাষ্ট্র কেবল আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বা বিদেশীনীতি নির্ধারণ বা ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে রক্ষাই করে না, নানাবিধ কল্যাণমূলক কর্মসূচীর রূপায়ণের দায়িত্বও তাদের নিতে হয়। ফলে, মাত্রাতিরিক্ত দায়ভারে ভারাক্রান্ত সরকার কোনও দায়িত্বই সুচারুভাবে সম্পাদন করতে পারে না।

(৫) কোনও কোনও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার আর একটি দুর্বলতার কথা বলেন। তাঁদের কথায়, এই শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতার কেন্দ্র একটি হওয়ার ফলে দেশের বাইরেও ভিতরে বিপদ দেখা দিতে পারে। কারণ, ক্ষমতার কেন্দ্র একটি এবং সেটি দখল করতে পারলেই রাষ্ট্রকে বিপর্যস্ত করে দেওয়া যায়।

সব মিলিয়ে তাই বলা যায়, জাতীয়তাবোধ সম্পন্ন জনগোষ্ঠী নিয়ে গঠিত ক্ষুদ্রায়তনবিশিষ্ট রাষ্ট্রের পক্ষে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা বিশেষভাবে উপযোগী। ইংল্যান্ডের মত সমজাতিবিশিষ্ট ছোট রাষ্ট্রে এই ধরনের সরকারের সাফল্যের সম্ভাবনা বেশি। আবার যেসব দেশের জনসাধারণ রাজনৈতিকভাবে সচেতন, সেসব ক্ষেত্রেও এককেন্দ্রিক সরকারের সাফল্যের সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু যেসব দেশ আয়তনে বিশাল এবং প্রকৃতিগতভাবে বৈচিত্র্যময়, সেখানে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা মোটেই উপযোগী নয়। ভারতবর্ষ বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই রকমই দেশ।

১৪.৫ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা বলতে বোঝায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গার্ণারের ভাষায়—কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারকে নিয়ে গঠিত একটি মিলিত ব্যবস্থা (It is a system composed of the central and the local governments combined)। আইনবিদ্ ডাইসি এই ব্যবস্থার সংজ্ঞা দিয়ে বলেন, সংবিধান অনুসারে উদ্ভুত ও সংবিধানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কয়েকটি সমশ্রেণীভুক্ত অংশের মধ্যে রাষ্ট্রশক্তির বন্টন।

ডাইলি প্রদত্ত উল্লিখিত সংজ্ঞায় দু'টি প্রবণতার অস্তিত্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একদিকে জাতীয় ঐক্য ও অন্যদিকে আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার ঝোঁক, এই দুই পরস্পরবিরোধী প্রবণতার মধ্যে সংগতিবিধান করার প্রচেষ্টার ফলেই যুক্তরাষ্ট্রের জন্ম। সেজন্য তাঁর মন্তব্য যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় ঐক্য ও ক্ষমতার সঙ্গে 'রাজ্যের অধিকারের' সংগতিবিধান করার রাজনৈতিক উপায় ''(A federal State is a political contrivance intended to reconcile national unity with the maintenance of State rights'')। এর থেকে বোঝা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভবের পেছনে দু'টি প্রবণতা বা শক্তি কাজ করে। একটি জাতীয় ঐক্যের শক্তি, যাকে বলা যায় কেন্দ্রাভিমুখী প্রবণতা বা শক্তি (Centripetal force)। অন্যটি আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার আকাঙ্ক্ষা, যেটি কেন্দ্রাতিগশক্তি (Centrifugal force)। বস্তুত, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যেই কেবল এই প্রবণতাদ্বয়কে অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

আর একজন বিশিষ্ট সংবিধানবিদ কে. সি. হোয়্যার (K. C. Wheare) যুক্তরাষ্ট্র বলতে বোঝান একটি নির্দিষ্ট ধরনের শাসনব্যবস্থা যাতে সংবিধান সমগ্র দেশের সরকার বা জাতীয় সরকার (National Government) এবং আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে এমনভাবে ক্ষমতা বন্টন করে দেয় যে, প্রত্যেকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বাধীন এবং পরস্পরের সহযোগী হয়। (''By the federal principle I mean the method of dividing power so that the general and regional Governments are each, within a sphere, co-ordinate and independent'') এই সংজ্ঞায় কেবল সংবিধান কর্তৃক ক্ষমতা বন্টন নয়, জোর দেওয়া হয়েছে ক্ষমতা বন্টনের নীতিটির উপর যাতে কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকার পরস্পরের অধীনতা থেকে মুক্ত (Independent) এবং পরস্পর সহযোগী (co-ordinate) হ'তে পারে। হোয়্যারের ভাষায় এটিই হ'ল যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি (Federal principle)।

তবে, উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলিতে মূলত যুক্তরাষ্ট্রের আইনগত ও সাংবিধানিক কাঠামোর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থাকে আদর্শস্থানীয় বলে গণ্য করা হয়েছে, অথচ যুক্তরাষ্ট্রের মূল কথা হ'ল সমাজের বহুত্ববাদী চরিত্রের রাজনৈতিক রূপায়ণ। উইলিয়ম লিভিংস্টোন (William S. Livingstone)-এর ভাষায় ঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার হ'ল সেই ব্যবস্থা যার দ্বারা সমাজের বহুত্ববাদী চরিত্র মূর্ত এবং সংরক্ষিত হয়'।

এইসব কারণে, আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা যুক্তরাষ্ট্রের সংজ্ঞা নতুন করে নিরূপণ করার চেষ্টা করেছেন। এঁদেরই একজন হলেন এ. এইচ. বার্চ। বার্চ-এর কথায়, যুক্তরাষ্ট্র হ'ল সেই শাসনব্যবস্থা যেখানে একটি সমগ্র দেশের সরকার এবং কতকগুলি আঞ্চলিক সরকার থাকে এবং তাদের মধ্যে ক্ষমতা এমনভাবে বন্টিত হয় যাতে প্রত্যেকেই নিজ নিজ এলাকায় অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে এবং নিজস্ব প্রশাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে

জনগণকে শাসন করে। এই সংজ্ঞার সব থেকে বড় কথা হ'ল, এখানে যুক্তরাষ্ট্র সাংবিধানিক ব্যবস্থার পরিবর্তে রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে বর্ণিত হয়েছে এবং আঞ্চলিক সরকার-এর স্বাধীনতার পরিবর্তে রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের (autonomy) ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

আধুনিক যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও প্রাচীনতম উদাহরণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। বর্তমানে বহু রাষ্ট্রেই যেমন কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, সুইজারল্যান্ড কিম্বা ভারতে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা দেখা যায়। এইসব যুক্তরাষ্ট্র বিশ্লেষণ করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা যুক্তরাষ্ট্রের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছেন। এর মধ্যে প্রধান কয়েকটি হ'ল ঃ

(১) সব যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থাতেই একটি সবচেয়ে লিখিত ও কিছুটা পরিমাণে দুষ্পরিবর্তনীয় প্রকৃতির সংবিধান অপরিহার্য সংবিধানেই কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারের ক্ষমতার ক্ষেত্র নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় এবং এই ক্ষমতা বিভাজন সুস্পষ্ট করার জন্যই সংবিধানকে অলিখিত হ'তে হয়। তাছাড়া, সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্রীয় ধারাগুলির সংশোধন পদ্ধতিতে কেন্দ্র ও অঞ্চল উভয় সরকারের সম্মতি আবশ্যিক করার জন্যই সংবিধানকে দুষ্পরিবর্তনীয় প্রকৃতির করে তোলা হয়।

(২) যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাতে শাসন-কর্তৃত্ব দু'ধরনের সরকার মধ্যে বন্টন করা হয়। সমগ্র দেশের জন্য জাতীয় বা কেন্দ্রীয় সরকার ও অঞ্চলগুলির জন্য আঞ্চলিক বা রাজ্য সরকার। সংবিধান কেবল এই দুই স্তরের সরকারের মধ্যেই ক্ষমতা বন্টন করে।

(৩) শাসন কর্তৃত্বের বন্টন ব্যবস্থার পাশাপাশি দু'টি সরকারের মধ্যে সুস্পষ্ট ক্ষমতার পার্থক্য যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার আর একটি বৈশিষ্ট্য। অবশ্য ক্ষমতা বিভাজনের নীতি ও পদ্ধতি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি তালিকাতে জাতীয় সরকারের ক্ষমতার ক্ষেত্রগুলিকে সুনির্দিষ্ট করে অন্য সব বিষয় রাজ্যগুলির হাতে অর্পণ করা হয়েছে। আবার, ভারতে তিনটি তালিকা—কেন্দ্র, রাজ্য ও যুগ্ম তালিকা ক্ষমতা বিভাজনের পদ্ধতিটিকে নির্ধারণ করে।

(৪) ক্ষমতা বন্টনের পাশাপাশি কেন্দ্র ও আঞ্চলিক সরকারের নিজস্ব স্বতন্ত্র প্রশাসনিক ব্যবস্থার অস্তিত্ব যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার আর একটি বৈশিষ্ট্য। কেন্দ্রীয় আইনকে রূপায়িত করে কেন্দ্রীয় প্রশাসন আর অঞ্চলগুলিতে আইন অনুযায়ী শাসন ক্ষমতা প্রয়োগ করে আঞ্চলিক প্রশাসনব্যবস্থা।

(৫) সংবিধানের সার্বিক প্রাধান্য যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য কেন্দ্রও আঞ্চলিক—উভয় সরকারের ক্ষমতার উৎস সংবিধান, যাকে অনেক সংবিধানবিদ আবার সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস বলে ভাবতে চান।

(৬) যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার আর একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল 'স্বাধীন ও নিরপেক্ষ যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়। ক্ষমতা বন্টন নিয়ে কেন্দ্র ও আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে কোনও বিরোধ দেখা দিলে বা সংবিধানে উল্লিখিত কোনও বিষয় নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিলে তার মীমাংসার ভার দেওয়া হয় যুক্তরাষ্ট্রী আদালতকে। বস্তুত সংবিধানকে ব্যাখ্যা করা এবং সংবিধানের প্রাধান্য রক্ষাই যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের সব থেকে বড় কাজ বলে এই আদালতকে 'সংবিধানের অভিভাবক' বলা হয়।

(৭) যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার আর একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল দ্বৈত-নাগরিকত্ব'। এর অর্থ নাগরিকরা যেমন সমগ্র দেশের নাগরিক তেমনি নিজ নিজ অঞ্চলেরও নাগরিক। তবে, এই ধরনের নাগরিকত্ব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত কোনও কোনও দেশে দেখা যায়—আর সে কারণে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এই বৈশিষ্ট্যটিকে অপরিহার্য বলে মনে করেন না।

(৮) শেষ বৈশিষ্ট্য হ'ল দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা। আইনসভায় দ্বিতীয় কক্ষটি হয় যুক্তরাষ্ট্রীর কক্ষ—যার মূল লক্ষ্য হ'ল যুক্তরাষ্ট্রী ব্যবস্থার মূলকাঠামোটিকে সুরক্ষিত রাখা। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বা ভারতের মত দেশে এই বৈশিষ্ট্যটি বিদ্যমান।

১৪.৫.১ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার গুণাগুণ

পৃথিবীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষ আজ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় বাস করে। এর কারণ, এই ব্যবস্থার বেশ কিছু সুবিধা। অবশ্য অসুবিধাও কিছু আছে। প্রথমে সুবিধার কথাগুলি বলা যায়। তারপর অসুবিধা বা ত্রুটির কথা।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রথম এবং প্রধান সুবিধা হ'ল ছোট এবং দুর্বল রাষ্ট্রকে এই ব্যবস্থার অধীনে একত্রিত করে একটি বড় ও শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব হয়। আর ছোট ছোট রাষ্ট্র বা অঞ্চলগুলি অতি সহজেই নিজের স্বাতন্ত্র্য ও অস্তিত্ব বিসর্জন না দিয়েও একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের অঙ্গ হতে পারে।

(২) যেসব দেশে নানা জাতিগোষ্ঠীর মানুষ বাস করে, যাদের আচার ব্যবহার ভাষা-সংস্কৃতি পরস্পর থেকে আলাদ সেসব দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা খুবই উপযোগী। কারণ, এই ব্যবস্থায় তারা একই রাষ্ট্রভুক্ত থেকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ভোগ করে এবং তাদের স্বাতন্ত্র্য ও আত্মপরিচয় অবিকৃত রেখে 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য' প্রতিষ্ঠা করা হয়।

(৩) যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় আঞ্চলিক সমস্যাগুলির সমাধান করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয় আঞ্চলিক সরকারগুলির ওপর। অঞ্চলের মানুষকে নিয়ে গড়ে ওঠা এই সরকারের পক্ষে অনেক বেশি যুক্তিসঙ্গত ও দক্ষতার সাথে এই সব সমাধান কার্য সম্পাদিত হয়। সম্ভবত এ কারণেই অনেকে বলেন, এই শাসনব্যবস্থা অনেক বেশি দক্ষ ও যোগ্য।

(৪) এই ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় স্তরে ক্ষমতার কেন্দ্রিভবন না হবার দরুণ স্বৈরাচারী শক্তির উদ্ভব ঘটে না বা ক্ষমতার অপব্যবহারের সুযোগ কমে যায়। আঞ্চলিক সরকারগুলির অনেকটা 'ওয়াচ ডগ' এর মত ভূমিকা নেয়।

(৫) লর্ড ব্রাইস-এর মত রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থাকে এক ধরনের রাজনৈতিক পরীক্ষাগার হিসেবে ভাবতে চেয়েছেন যেখানে কোনও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিয়ে অন্তত আঞ্চলিক স্তরে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ থাকে। পরীক্ষার ফল ইতিবাচক হ'লে সিদ্ধান্তটিকে জাতীয় স্তরে প্রয়োগ করার উদ্যোগ নেওয়া যায়। এবং

(৬) যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সরকারী কাঠামো যেমন স্থায়িত্ব পায়, বাইরের আক্রমণ বা অন্তঃবিপ্লবের দরুণ রাষ্ট্রব্যবস্থা তেমন সহজে ভেঙ্গে পড়ে না। ক্ষমতা একটি মাত্র কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত না থাকার দরুনই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এই প্রতিরোধ শক্তি গড়ে ওঠে।

পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার ত্রুটিগুলির ব্যাপ্তি অপেক্ষাকৃত কম হ'লেও অনুল্লেখ্য নয়। যেমন, এই ব্যবস্থার সব থেকে বড় ত্রুটি হ'ল এর অন্তর্নিহিত দুর্বলতা যা লীককের (Leacock) ভাষায় 'কাঠামোগত ত্রুটি'। এই ধরনের ত্রুটি হ'ল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা যতটা সার্থক অর্থনৈতিক ও অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে প্রায় ততটাই দুর্বল। তাছাড়া, ক্ষমতা বন্টন নিয়ে বিরোধ অথবা স্বতন্ত্র আইন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা কাঠামোগত ত্রুটির আর একটি নিদর্শন।

(২) আঞ্চলিক সরকারগুলির প্রতি আনুগত্য নাগরিকদের জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সম্পর্কিত বিশ্বাস ও প্রত্যয়ে ফাটল ধরতে পারে—অন্তত এক ধরনের সম্ভাবনা থেকে যায়। তাছাড়া, কেন্দ্রাভিগামী ও কেন্দ্রাতিগ

শক্তির ভারসাম্য কোনও কারণে বিনষ্ট হ'লে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনাটাই সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়ে। ফলে, প্রকট হয়ে ওঠে বিচ্ছিন্নতাকামী শক্তির উত্থান।

(৩) দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রের আর একটি সমস্যা। কারণ, এই ধরনের সংবিধান অনেক সময় সমাজ-প্রগতির গতির সাথে পাল্লা দিতে পারে না। এবং

(৪) যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার আর একটি বড় ত্রুটি হ'ল এর ব্যয়বাহুল্য। একাধিক আইনসভা, প্রশাসন ও বিচারব্যবস্থা থাকায় প্রায় সব যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে বিপুল ব্যয়ের বোঝা বহন করতে হয়। আর্থিক দিক থেকে দুর্বল দেশের কাছে এই বোঝা বহন দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়।

সব মিলিয়ে বলা যায়, বহুজাতি ভিত্তিক রাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্র হ'ল এক আদর্শ শাসনব্যবস্থা। তাছাড়া দেশের আয়তন যদি বড় হয়, জনসংখ্যা বেশি হয়—তাহলেও এই ব্যবস্থা কাম্য। সর্বোপরি সন্নিহিত অঞ্চলে বসবাসকারী বিভিন্ন জাতি বা ছোট ছোট দেশ একত্রিত হয়ে রাষ্ট্র গড়তে চাইলে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থাই একমাত্র কাম্য। এখানে বড় রাষ্ট্রের সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়, আবার নিজেদের নিজস্বতাও বজায় রাখা যায়।

১৪.৬ আধুনিক যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীকরণের প্রবণতা

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার মৌল ধারণা হল কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারগুলির ক্ষমতার মধ্যে ভারসাম্য থাকে এবং উভয় ধরনের সরকারই নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে কাজ করে। কিন্তু সাম্প্রতিককালে পৃথিবীর সকল যুক্তরাষ্ট্রেই কেন্দ্রিকতার প্রতি এক প্রবল ঝোঁক দেখা যায়। প্রায় সকল যুক্তরাষ্ট্রেই কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা ও গুরত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পাশাপাশি আঞ্চলিক বা রাজ্য সরকারগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়ছে। আধুনিক যুক্তরাষ্ট্রে এই কেন্দ্রীকরণের প্রবণতাই 'কেন্দ্রপ্রবণতা' হিসেবে পরিচিত। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সুইজারল্যান্ড কানাডা, ভারত বা অস্ট্রেলিয়ার মত প্রায় সব যুক্তরাষ্ট্রেই কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্যের লক্ষণ স্পষ্ট।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এই সাম্প্রতিক কেন্দ্রপ্রবণতার কারণ অনুসন্ধান করেছেন। সংবিধানবিদ হোয়্যার চারটি কারণ দেখিয়েছেন, যেগুলি হ'ল যুদ্ধ, আর্থিক সঙ্কট, সমাজ-কল্যাণমূলক কার্যাবলীর বিস্তৃতি এবং পরিবহন ও শিল্পের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য। আবার রাষ্ট্রবিদ জীন ব্লনডেল-এর মতে কেন্দ্রপ্রবণতার মূল কারণ, আর্থিক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি এবং সামাজিক ক্ষেত্রে —যেমন শিক্ষা, বাসস্থান-সমস্যা, সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদি—কেন্দ্রীয় কল্যাণমূলক কার্যাবলীর বিস্তৃতি। সম্প্রতি বিভিন্ন যুক্তরাষ্ট্রে দেখা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য আঞ্চলিক সরকারকে এড়িয়ে বিভিন্ন ছোট ছোট আঞ্চলিক সংস্থার যেমন শহরের স্বায়ত্তশাসন সংস্থা কিংবা গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন সংস্থার সহেগ সরাসরি যৌথ উদ্যোগ বা 'পার্টনারশিপ' গড়ে তুলেছে। এছাড়া, আর্থিক সহায়তা, কারিগরী পরামর্শ, প্রশাসনিক নির্দেশ এর মাধ্যমে আঞ্চলিক সরকারগুলিকে নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে জাতীয় সরকার প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। অর্থাৎ, এই সব আলোচনায় স্পষ্টত আর্থিক কারণ কেন্দ্রপ্রবণতার সব থেকে বড় উপায়—যে কারণে সংবিধানবিদ কার্ল লোয়েনস্টাইন (Karl Loewenstein) মন্তব্য করেন, আর্থিক পরিকল্পনা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ডি. ডি. টি.-র কাজ করছে (Economic planning is the D. D. T. of federalism) অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার পতন ত্বরান্বিত করেছে। নিম্নলিখিত উপায়ে কেন্দ্রপ্রবণতার কারণগুলিকে আলোচনা করা যায় ঃ

(১) **যুদ্ধ ঃ** আধুনিক শতাব্দীতে যে দুটি বিশ্বযুদ্ধ হয়েছে, তার দু'টিই সামগ্রিক যুদ্ধ। আর এই যুদ্ধে

কেবল সেনাবাহিনী নয়, গোটা দেশই জড়িয়ে পড়েছিল। তাছাড়া, যুদ্ধ আর একটি বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা প্রায় সব দেশেই অর্থনীতির ওপর বিপুল চাপ সৃষ্টি করেছে। যেহেতু সব যুক্তরাষ্ট্রেই প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক সম্পর্ক পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর এই বিপুল ব্যয়বহুল যুদ্ধ পরিচালনা করতে সব কেন্দ্রীয় সরকারকেই দেশের যাবতীয় সম্পদকে একত্রিত হয় এবং যুদ্ধ-পরবর্তীকালে অস্ত্র প্রতিযোগিতাতেও এই চালিয়ে যেতে হয়। আর এর জন্য নীট ফল কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি।

(২) আর্থিক সঙ্কট ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবী জুড়ে যে আর্থিক মহাসঙ্কট দেখা দিয়েছিল তার মোকাবিলা করতে রাষ্ট্রীয় ব্যয় ও উদ্যোগ বাড়াতে হয়েছে। আবার, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বেকারি দ্রব্যমূল্য, বৃদ্ধি, শিল্প-কারখানায় মন্দা ইত্যাদি যে সঙ্কট তৈরী করেছে, সেই সঙ্কটের সমাধান এমনকি আশু উপশমও কোনও আঞ্চলিক সরকারের পক্ষেই করা সম্ভব ছিল না। শেষ পর্যন্ত এই দায়িত্ব নির্বাহের কাজ জাতীয় সরকারগুলিকেই করতে হয়েছে—যার দরুণ কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা অপ্রহিতভাবে বেড়েছে।

(৩) কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধির আর একটি কারণ সাম্প্রতিককালে রাষ্ট্রের জনকল্যাণকর কর্মসূচীর বিস্তৃতি। অধুনা প্রায় সব সরকারকেই শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য সামাজিক নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান প্রভৃতি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে হয়। আর প্রথমত, এইসব ব্যবস্থাই করতে হয় গোটা দেশের জন্য। দ্বিতীয়ত, এর জন্য সরকারকে বিপুল ব্যয়ভার বহন করতে হয় এবং তৃতীয়ত, জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের কর্মসূচীর রূপায়ণের জন্য প্রশাসনিক দক্ষতা প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ, কল্যাণমূলক কাজগুলি সম্পাদনের ভার কখনই আঞ্চলিক সরকারের ওপর ছেড়ে দেওয়া যায় না। পরিবর্তে কেন্দ্রীয় সরকারকেই উদ্যোগ নিতে হয়। ফলশ্রুতি, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি।

(৪) যোগাযোগ ও পরিবহণ শিল্পের অভূতপূর্ব উন্নতিকেও কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ বলে মনে করা হয়। বাস্তবিক যোগাযোগ ও পরিবহন শিল্পের অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে বর্তমানে আন্তঃরাজ্য বা আন্তঃপ্রাদেশিক সম্পর্ক অনেক নিবিড় হয়েছে। শিল্প ও কল-কারখানার ক্ষেত্রে বিপুল সমৃদ্ধি সমগ্র দেশের বাজারকে সংগঠিত করতে চেয়েছে। সর্বোপরি, আর্থিক লেনদেন ও ব্যবসা-বাণিজ্যও রাজ্যের বা অঞ্চলের সীমানা পেরিয়ে জাতীয় স্তরে প্রসারিত হয়েছে। আর এ সবের দরুন কেন্দ্রাভিগামী শক্তি বা জাতীয় ঐক্যের মনোভাব প্রবলতর হয়েছে।

(৫) সাম্প্রতিককালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় সাফল্যও কেন্দ্রপ্রবণতাকে স্পষ্ট করেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির ফলে প্রতিটি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ এবং নির্ভরতা অসামান্যভাবে বেড়ে গিয়েছে। অঞ্চলগুলির মানুষের মধ্যে চলাচল বা 'mobility' বেড়েছে, আর তাই আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের ধারণা অনেকটাই ঝাপসা হয়ে আসছে।

(৬) জাতীয় সরকারের প্রভাব বেড়ে যাবার আর একটি কারণ আর্থিক পরিকল্পনা। উন্নয়নশীল (অনুন্নত' কথাটির ইদানিংকালে আর ব্যবহার করা হয় না) দেশগুলিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এবং সমাজ-কল্যাণমূলক কার্যাবলীকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়? আর কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার অর্থই সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে কেন্দ্রের নির্দেশ দেবার ক্ষমতা বৃদ্ধি।

(৭) প্রায় সব যুক্তরাষ্ট্রেই রাজ্য বা আঞ্চলিক সরকারগুলি কেন্দ্রীয় আর্থিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল।

কেবল আর্থিক নয়, প্রযুক্তিগত সাহায্যের জন্যও তাদের কেন্দ্র-মুখাপেক্ষী থাকতে হয়। স্বাভাবিকভাবেই তাই আঞ্চলিক সরকারগুলির ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণের পরিধি বাড়ছে।

(৮) যুক্তরাষ্ট্রগুলির বিচার বিভাগও কেন্দ্রীয় সরকারের অনুকূলে রায় দিয়ে কেন্দ্রের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সংবিধান ব্যাখ্যার মাধ্যমে আদালত এই ভূমিকা পালন করেছে। অর্থাৎ সংবিধানের সংশোধন ছাড়াই বিচারপতিদের ভাষ্যের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতার পরিধি সম্প্রসারিত হয়েছে।

সব মিলিয়ে তাই একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাগুলিতে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি যেমন এক বাস্তব সত্য, তেমন সমস্যাসঙ্কুল রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কাম্য বলেও মনে হয়। তবে এ ব্যাপারটিও স্মরণ রাখা দরকার যে যুক্তরাষ্ট্রে অংশগ্রহণকারী জাতিগুলির স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যগুলি সংরক্ষণের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের যত্নশীল হওয়া উচিত। তবে সাম্প্রতিককালে সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ধারণা (Co-operative Federalism) প্রসার লাভ করেছে। দু'ধরনের সরকারের পরিপূর্ণ স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা এখন আর বড় করে দেখা হয় না। বরং জাতীয় সরকারের সঙ্গে সহযোগিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গী আজ অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয়।

১৪.৭ অনুশীলনী

১। শাসনব্যবস্থার শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কিত সাবেকী পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা করুন এবং এই ব্যবস্থার জটিলতাগুলি লিখুন।

২। সরকারের চিরাচরিত শ্রেণীবিভাগের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করুন। এই প্রসঙ্গে শ্রেণীবিভাজন প্রচেষ্টার অসুবিধাগুলি দেখান।

৩। এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা কাকে বলে? এই ধরনের শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

৪। এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার সুবিধে-অসুবিধে বা দোষ গুণ কী কী? কোন কোন ক্ষেত্রে এই শাসনব্যবস্থা উপযোগী?

৫। যুক্তরাষ্ট্র বা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা কাকে বলে? যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা করুন।

৬। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করুন। এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলি আলোচনা করুন।

৭। বর্তমান যুক্তরাষ্ট্রসমূহ কেন্দ্রপ্রবণতার প্রধান কারণগুলি কী কী?

১৪.৮ গ্রন্থপঞ্জী

1. Blondel J. (Ed.) : *Comparative Goernment, 1985*
2. Gamer J. W : *Political Science and Government, 1951*
3. Roy & Bhattacharya : *Ploitical Theory 1996.*
4. চক্রবর্তী, হিমাচল ঃ *রাষ্ট্রবিজ্ঞান,* ১৯৯৫।
5. মহাপাত্র, অনাদি ঃ *রাষ্ট্রবিজ্ঞান,* ১৯৯৬।

একক—১৫ ❐ রাজনৈতিক দল

গঠন

১৫.০ উদ্দেশ্য

১৫.১ প্রস্তাবনা

১৫.২ সংজ্ঞা ও প্রকৃতি

১৫.২.১ রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য

১৫.৩ রাজনৈতিক দলের শ্রেণীবিভাগ

১৫.৪ আধুনিক গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী

১৫.৫ আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের ভূমিকা ও গুরুত্ব

১৫.৬ দলব্যবস্থা

১৫.৭ দলব্যবস্থার শ্রেণীবিভাগ

১৫.৮ অনুশীলনী

১৫.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১৫.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন ঃ

- রাজনৈতিক দল বলতে কি বোঝায় ও তাদের বৈশিষ্ট্য ঃ
- রাজনৈতিক দলের কাজ ও
- দলব্যবস্থা

১৫.১ প্রস্তাবনা

আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্তার এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হ'ল রাজনৈতিক দল। শুধু গুরুত্বপূর্ণই নয়, জী ব্লন্ডেল (Jean Blondel) "রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক কাঠামোর এক অনন্য আধুনিক রূপ।" বস্তুত, সরকার ও নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করে রাজনৈতিক দল। আর্ণেস্ট বার্কার (Ernest Barker) সম্ভবত সেজন্য রাজনৈতিক দলকে এমন একটি তরল পদার্থ নিষ্কাশনের জন্য ব্যবহৃত নল (conduit)-এর তুলনা করেছেন—যা সমাজের স্বতঃস্ফূর্ত এলাকা থেকে সরকারের নির্দিষ্ট অঞ্চলে সামাজিক চিন্তার প্রক্রিয়াটিকে বহন করে। অর্থাৎ বার্কারের কথায় সামাজিক চিন্তাকে রাজনৈতিক বাস্তবতা প্রদানের কাজটি করে রাজনৈতিক দল।

তবে জাঁ শার্লো (Jean Charlot) নামে জনৈক ফরাসী রাষ্ট্রবিদ রাজনৈতিক দল সম্পর্কে যে মন্তব্য করেন, রাজনৈতিক দল নতুন বিতর্কিত জটিলএবং অসম্পূর্ণ। এই উক্তিটি চারটি বিষয় স্পষ্ট করে। বিষয়গুলির একটি হ'ল রাজনৈতিক দলের উদ্ভব বেশী দিনের নয়। দ্বিতীয়টি হ'ল এখনও রাজনৈতিক ক্রিয়ার বৈধ মাধ্যম হিসেবে রাজনৈতিক দল সর্বত্র স্বীকৃত নয়। তৃতীয়টি হ'ল, রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা এবং তার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে রাষ্ট্রনীতিবিদগণ একমত পোষণ করেন না। আর চতুর্থ বিষয়টি হ'ল রাজনৈতিক ব্যবস্থার অন্যান্য উপাদানগুলির সাথে সম্পর্কের নিরিখেই রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তু অধ্যয়ন করা যায়।

অবশ্য একথা অনস্বীকার্য যে, পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই রাজনৈতিক দল আছে এবং প্রায় সর্বত্র রাজনৈতিক দল কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কার্যাদি করে থাকে। এইসব কার্যাদির মধ্যে আছে রাজনৈতিক সংবাদ সরবরাহ করা, জনমত গঠনে সাহায্য করা, জনসাধারণ ও তাঁদের প্রতিনিধিদের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করা কিংবা সরকারী উচ্চপদে প্রার্থী সরবরাহ করা। বস্তুতপক্ষে, এইসব কার্যাদির মধ্য দিয়েই জনসাধারণ পরোক্ষভাবে শাসনকার্য পরিচালনায় অংশ নেয়।

১৫.২ সংজ্ঞা ও প্রকৃতি

রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা নিরূপণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে এবং তাঁরা নানাভাবে তাঁদের ধারণাকে উপস্থিাপিত করার চেষ্টা করেছেন। তবে ঊনবিংশ শতাব্দীতে রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে মতবাদ বা মতাদর্শের বিষয়কে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হ'ত। একটি উদাহরণ প্রসঙ্গটিকে সহজবোধ্য করতে পারে। উদার তাত্ত্বিকেরা রাজনৈতিক দল বলতে বোঝাতেন একটি নিদিষ্ট মতাদর্শ বা মতবাদকে আশ্রয় করে সংগঠিত গোষ্ঠী। বিগত ঐ শতাব্দীর গোড়ার দিকে উদারনৈতিক তাত্ত্বিক বেঞ্জামিন কন্স্ট্যান্ট (Benjamin Constant) রাজনৈতিক দলের যে সংজ্ঞা দিয়েছিলেন, বহুদিন অবধি সেটি ছিল স্বীকৃত সংজ্ঞা। কন্স্ট্যান্ট-এর ভাষায় ঃ "একই রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাস করে এমন কিছু লোকের সমষ্টিকে রাজনৈতিক দল" বলা যায়। অনেকটা কাছাকাছি আর একটি সংজ্ঞা দিয়েছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংল্যান্ডের রাজনীতিবিদ ডিস্রেলি (Disraeli) যখন তিনি বলেন, 'রাজনৈতিক দল হ'ল সংগঠিত মতামত'।

মার্ক্সীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ প্রদত্ত রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞাতেও মতাদর্শের প্রশ্নটি সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব পেয়েছে। মার্ক্সীয় সংজ্ঞানুসারে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী বা শ্রেণীর অংশের স্বার্থ রূপায়ণের জন্য সংগঠিত শক্তিই হ'ল রাজনৈতিক দল। এই উক্তির অর্থ রাজনৈতিক দল মানেই কোনও একটি শ্রেণী বা শ্রেণীর অংশের স্বার্থের প্রতিভূ। এই স্বার্থের প্রকাশ ঘটে নির্দিষ্ট মতাদর্শের মধ্যে। সব রাজনৈতিক দলই কোন একটি স্বার্থকে রূপায়িত করার জন্য নির্দিষ্ট মতাদর্শ প্রচার করে এবং রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে চায়। যেমন, বুর্জোয়া শ্রেণীর বিভিন্ন দলগুলি যে মতাদর্শ। তাদের লক্ষ্য হয় রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে সমগ্র বুর্জোয়াশ্রেণী বা তার কোনও অংশের স্বার্থকে বাস্তবায়িত করা। অনুরূপ কমিউনিস্ট দলের মতাদর্শ হ'ল শ্রমিকশ্রেণীর মতাদর্শ। রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠারই হ'ল কমিউনিস্ট দলের লক্ষ্য।

অবশ্য অধুনা একশ্রেণীর পশ্চিমী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাজনৈতিক দলের আলোচনা মতাদর্শের প্রশ্নটিকে বাদ দিয়েছে। এঁরা রাজনৈতিক দলের যে সংজ্ঞা উপস্থাপিত করেন তা মূলত কার্যভিত্তিক (functional)। যেমন ফ্রেড রিগস (Fred Riggs) রাজনৈতিক দল বলতে বোঝান 'যে কোনও সংগঠন—যা আইনসভায় নির্বাচনের জন্য প্রার্থী

দেয়।' আইনসভার নির্বাচনে প্রার্থী দেওয়ার আপাত উদ্দেশ্য ক্ষমতা দখল। পশ্চিমী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের অধিকাংশের মতে ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে সংগঠিত শক্তিই রাজনৈতিক দল। বস্তুত, ক্ষমতা দখলের এই লক্ষ্যই রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অন্যান্য গোষ্ঠী থেকে রাজনৈতিক দলের স্বাতন্ত্র্য সূচিত করে। যোশেফ শুমপিটার (Joseph Schumpeter) বলেন 'প্রতিটি রাজনৈতিক দলের প্রথম ও প্রধান লজ্জা অন্যদের পরাস্ত করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া এবং আসীন থাকা।' অ্যালান বল (Allan Ball)-এর মতে, এই লক্ষ্যই অন্যান্য গোষ্ঠী থেকে রাজনৈতিক দলকে স্বতন্ত্র করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই মাইরন ভাইনার (Myron Weiner) ও যোসেফ লা পালোম্বারা (Joseph la Palombara) রাজনৈতিক দল বলতে গিয়ে বলেন, সেই সংগঠনকে রাজনৈতিক দল বলা হয়—যার বিভিন্ন অঞ্চলে শাখা থাকে যা নির্বাচনে সাধারণ মানুষের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করে এবং একা বা অন্যান্য সংগঠনের সহায়তায় ক্ষমতা দখল করতে এবং ক্ষমতাকে ধরে রাখতে চেষ্টা করে। প্রায় একই দৃষ্টিকোণ থেকে আরও সুস্পষ্ট সংজ্ঞা দিয়েছেন উইলিয়াম এন. চেম্বারস্ (William N. Chambers)। তাঁর মতে ঃ "আধুনিক ধারণায় রাজনৈতিক দল বলতে বোঝায় অপেক্ষাকৃত এক স্থায়ী সামাজিক সংগঠনকে যা সরকারের ক্ষমতায় কেন্দ্রগুলিকে দখল করতে চায় এবং যার একটি সাংগঠনিক কাঠামো থাকে, যে কাঠামোটি সরকারী ক্ষমতার কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত নেতাদের সঙ্গে সমর্থকদের এবং তাদের স্থানীয় ঘাঁটিগুলির সংযোগ রক্ষা করে এবং গোষ্ঠীস্বার্থকে বা অন্তত ঐক্যবদ্ধ আনুগত্যের জন্য কোন একটি প্রতীককে তুলে ধরে।" (A political party in the modern sense, may be thought of as a relatively durable social formation which seeks offices of powers in government, exhibits a structure of organisation which links leaders at the centre of government to a sginificant popular following in the political arena and its local enclaves and generates in group, perspectives or at least symbols of identification of loyalty).

উপরিউক্ত আধুনিক সংজ্ঞাগুলির প্রধান ত্রুটি হ'ল এগুলির প্রায় প্রত্যেকেই রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলকে রাজনৈতিক দলের মূল্য লক্ষ্য বলে মনে করেছেন। কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত, লক্ষ্য নয়, ক্ষমতা নিছক লক্ষ্যপূরণের উপায় মাত্র। দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক দলকে নিছক একটি সংগঠিত গোষ্ঠী হিসেবে অভিহিত করা হ'লেও সংগঠন হিসেবে তার ভিত্তির আয়োজন অস্বীকার করা যায় না। আর এই ভিত্তি বলতে বোঝায় নির্দিষ্ট আদর্শ, মতবাদ উদ্দেশ্য বা কর্মসূচীকে। তৃতীয়ত, উদার গণতন্ত্রে বেশীর ভাগ রাজনৈতিক দলই নির্বাচনের মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে চাইলেও রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞায় অন্যভাবে ক্ষমতা দখলের প্রশ্নটিকে উপেক্ষা করা যায় না। কাজেই বাস্তবে রাজনৈতিক দল বলতে বোঝায় কোনও একটি সামাজিক বা রাজনৈতিক আদর্শ বা মতাদর্শের ভিত্তিতে সংগঠিত গোষ্ঠী—যার লক্ষ্য নির্বাচন বা অন্য উপায়ে জনসমর্থনের সহায়তায় রাষ্ট্রক্ষমতা দখল এবং ঐ ক্ষমতাকে দখল রেখে তার আদর্শ বা মতাদর্শকে বাস্তবায়িত করা।

১৫.২.১ রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য

রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি সম্পর্কিত আলোচনা থেকে এ-কথা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, প্রায় প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে এবং সেগুলির সাহায্যেই রাজনৈতিক দলকে অন্যান্য সব গোষ্ঠী বা সংঘ থেকে স্বতন্ত্র করা যায়। বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল ঃ

(১) সব রাজনৈতিক দলেরই সামাজিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, আদর্শ বা নির্দিষ্ট মতাদর্শ থাকে। এরই ভিত্তিতে সদস্যরা ঐক্যবদ্ধ হয়।

(২) সব রাজনৈতিক দলেরই আশু লক্ষ্য রাষ্ট্রক্ষমতা দখল বা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার পদে অধিষ্ঠিত হওয়া এবং ক্ষমতাকে ধরে রাখা, নির্বাচনের মাধ্যমে বা অন্য উপায়ে।

(৩) রাজনৈতিক দল বলতে অপেক্ষাকৃত স্থায়ী গোষ্ঠীকে বোঝায়। সাময়িকভাবে কোনও একটি লক্ষ্য পূরণের জন্য কিছু লোক গোষ্ঠীবদ্ধ হ'লে, তাকে রাজনৈতিক দল বলা যায় না।

(৪) অপেক্ষাকৃত স্থায়ী সংগঠন হিসেবে প্রায় প্রত্যেক রাজনৈতিক দলেরই কর্মসূচী থাকে, থাকে নেতৃত্ব, সদস্য ও অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার কেন্দ্র। তাছাড়া সংগঠনের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা কার্যকর করার জন্য নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসৃত হয়।

(৫) প্রতিটি রাজনৈতিক দল বিশেষ একটি মতাদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হলেও সামগ্রিকভাবে সমাজের কল্যাণসাধনই তার প্রধান উদ্দেশ্যেরূপে বিবেচিত হয়। তাই উদ্দেশ্য সংকীর্ণ বা সীমাবদ্ধ হ'লে তাকে রাজনৈতিক দল বলা যায় না।

(৬) পাশ্চাত্য রাষ্ট্রনীতিবিদ এস. নিউম্যান (S. Neumann) মনে করেন, রাজনৈতিক দলের আর একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল সব দলই মূলত একটি যৌথ সংগঠন এবং অন্যদিকে নির্দিষ্ট কর্মসূচীর জন্য অন্যান্য সংগঠন থেকে আলাদা হয়।

অবশ্য এ-কথা অনস্বীকার্য গণতান্ত্রিক উপায়ে এবং সংবিধানসম্মতভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকারের জন্য রাজনৈতিক দলগুলিকে চেষ্টা করতে হয়। সম্ভবত সেজন্য বৈপ্লবিক পন্থায় ক্ষমতা দখলের কর্মসূচী যেসব দলকে আবার তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন, যার একটি হল পরোক্ষ ক্যাডারভিত্তিক রাজনৈতিক দল শান্তিপূর্ণ উপায়ে সংবিধানসম্মতভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের পথে বাধা হয়ে ওঠে। ফলে বৈপ্লবিক পদ্ধতি অবলম্বন কোনও কোনও দলের কাছে অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। আর সেই কারণেই আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মতাদর্শের পাশাপাশি রাজনৈতিক দলের সুদৃঢ় সংগঠনের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেন।

১৫.৩ রাজনৈতিক দলের শ্রেণীবিভাগ

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা নানাভাবে রাজনৈতিক দলের শ্রেণীবিভাজন করেছেন। এর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য শ্রেণীবিভাজন করেছেন মরিস দুভার্জার (Maurice Duverger)। রাজনৈতিক দলের সংগঠনের কাঠামোর ভিত্তিতে দুভার্জার সব রাজনৈতিক দলকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন—ক্যাডারভিত্তিক রাজনৈতিক দল ও গণভিত্তিক রাজনৈতিক দল। এই বিভাজনের মূল ভিত্তি হ'ল নেতৃত্বের প্রকৃতি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা কার্যকর করার পদ্ধতি ক্যাডারভিত্তিক দলের বৈশিষ্ট্য হ'ল ঃ (১) অপেক্ষাকৃত কম সংহত সংগঠন, (২) একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর নেতৃত্ব ও (৩) দলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সাধারণ সদস্যদের সীমাবদ্ধ অংশগ্রহণ। অন্যদিকে গণভিত্তিক রাজনৈতিক দলের সদস্য সংখ্যা তুলনায় হয় অনেক বেশী ও বেশী সক্রিয়ও। দলের নেতৃত্ব নির্বাচিত হয়; সদস্যরাও সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় ব্যাপক অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। দলের প্রতি তাদের আনুগত্যের পরিমাণও বেশী হয়। অবশ্য দুভার্জার ক্যাডারভিত্তিক দলকে আবার তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন; যার একটি হ'ল পরোক্ষ ক্যাডারভিত্তিক দল যেখানে চর্চা বা শ্রমিক সংঘ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে জনসাধারণকে

দলের সাথে যুক্ত করা হয়। দ্বিতীয়টি হ'ল ঃ অনমনীয় ক্যাডারভিত্তিক দল যার প্রধান ভিত্তি হ'ল দলীয় শৃঙ্খলা এবং শেষেরটি হ'ল নমনীয় ক্যাডারভিত্তিক দল যেখানে শৃঙ্খলা কম গুরুত্ব পায়।

অন্যদিকে নিউম্যান সংগঠনের প্রকৃতি অনুযায়ী রাজনৈতিক দলকে প্রথমে দু'ভাগে ভাগ করেছেন; যার একটি হ'ল ব্যক্তিগত প্রতিনিধিত্বমূলক দল (Party of individual representation) এবং অন্যটি সংহতিমূলক দল (Party of integration)। প্রথমটির কাজ হ'ল নির্বাচনসংক্রান্ত অর্থাৎ নির্বাচকমণ্ডলীকে সংগঠিত করা। অন্যদিকে সামগ্রিক স্বার্থে ব্যক্তি নির্বাচককে সংগঠিত করার দায়িত্ব পালন করে সংহতিমূলক দল। অবশ্য এই দায়িত্ব পালন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য হ'তে পারে, কর্তৃত্বমূলক ব্যবস্থার জন্যও হ'তে পারে।

আর একজন রাষ্ট্রনীতিবিদ অটো কিরঘাইমার (Otto Kerchhiemer) এক বিশেষ ধরনের রাজনৈতিক দলের কথা বলেন—যার একমাত্র লক্ষ্য হ'ল অধিকাংশ মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করা। এই ধরনের দলকে তিনি নাম দিয়েছেন 'ক্যাচ অল পার্টি'—এর সর্বাপেক্ষা বড় বৈশিষ্ট্য হ'ল সদস্য সংখ্যা হয় গণভিত্তিক দলগুলির মত বিশাল কিন্তু পার্টি সংগঠন হয় ক্যাডারভিত্তিক দলের মত নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণাধীন। তাছাড়া দীর্ঘমেয়াদী মতাদর্শগত লক্ষ্যের পরিবর্তে সদস্যদের আশু স্বার্থপূরণের ওপর এই দল জোর দেয়।

প্রসঙ্গত এ-কথা মনে রাখা দরকার, রাজনৈতিক দলের উপরিউক্ত শ্রেণীবিভাগ কেবলমাত্র পার্টি সংগঠন, অর্থাৎ সদস্য সংখ্যা সদস্যদের ওপর নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণাধীন, সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রে সদস্যদের ভূমিকা ইত্যাদির ওপর জোর দেয়, আদর্শ লক্ষ্য বা মতাদর্শের মত বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দেয় না। অথচ আদর্শ, লক্ষ্য বা মতাদর্শের ভিত্তিতেও রাজনৈতিক দলগুলিকে শ্রেণীবিভক্ত করা যায়। এক সময় ব্রিটেনের রক্ষণশীল ও উদারনৈতিক দলের মধ্যে পার্থক্যের ভিত্তি ছিল ঘোষিত রাজনৈতিক আদর্শ ও কর্মসূচী সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্ট পার্টিগুলির পার্থক্যের ভিত্তিও আদর্শগত। এভাবে আদর্শ ও কর্মসূচীর ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ করলে রাজনৈতিক দলগুলিকে চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় ঃ (ক) রক্ষণশীল, (খ) উদারনৈতিক, (গ) সমাজতন্ত্রী এবং (ঘ) সাম্যবাদী। অবশ্য, এরা প্রত্যেকে বিশেষ ধরনের—যেমন, ইউরোপে রক্ষণশীল দল খ্রীষ্টধর্মভিত্তিক আবার এশিয়া ও আফ্রিকায় তা অনেক আধুনিক হ'লেও মূলত ধর্মভিত্তিক। তেমন, অধিকাংশ জাতীয়তাবাদী দল উদারনৈতিক গণতন্ত্রের ধ্যান-ধারণায় পুষ্ট হ'লেও কখনও কখনও রক্ষণশীল জাতীয়তাবাদী দলেরও দেখা মেলে। সমাজতন্ত্রী দলও বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। কোনও কোনও আরব দেশে যে বাথা সমাজতন্ত্রী দল দেখা যায় তা যেমন সমাজতন্ত্রী দলের একটি রূপ ইউরোপের কোন কোনও দেশে বিদ্যমান খ্রীষ্টবাদী সমাজতন্ত্রীদলও তার এক অন্য রূপ।

১৫.৪ আধুনিক গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী

বিশিষ্ট রাষ্ট্রনীতিবিদ অ্যালান বল বলেন ঃ রাজনৈতিক দলকে বাদ দিয়ে আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার কথা কল্পনা করা কঠিন। বাস্তবিকভাবেই উদার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা রাজনৈতিক দল ছাড়া অসম্ভব। এমনকি, কর্তৃত্বমূলক ব্যবস্থাও অনেকখানি রাজনৈতিক দলনির্ভর। রাজনৈতিক দলের এই গুরুত্বের কারণ তার কার্যাবলী। বল আলোচনা করে দেখান, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল পাঁচটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদন করে। এগুলি হ'ল ঃ প্রথমত, রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে ঐক্যবদ্ধ করা ও স্থায়িত্ব দেওয়া; দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন ধরনের

স্বার্থকে সমষ্টিগত রূপ দেওয়া ; তৃতীয়ত, নির্বাচকমণ্ডলীকে শিক্ষিত ও সক্রিয় করে তোলা ; চতুর্থত, রাজনৈতিক নেতৃত্ব নির্বাচন এবং পঞ্চমত, সমাজের সামনে আদর্শগত লক্ষ্য উপস্থিত করা। অন্যদিকে নিউম্যান তোলা; চতুর্থত, রাজনৈতিক নেতৃত্ব নির্বাচন এবং পঞ্চমত, সমাজের সামনে আদর্শগত লক্ষ্য উপস্থিত করা। অন্যদিকে নিউম্যান রাজনৈতিক দলের কার্যাবলীকে চার ভাগে বিভক্ত করেছেন এগুলি হ'ল ঃ (১) বিশৃঙ্খল রাজনৈতিক মতামতকে ঐক্যবদ্ধ রূপ দেওয়া; (২) নাগরিকদের রাজনৈতিক সম্পর্কে সচেতন ও শিক্ষিত করে তোলা; (৩) সরকার ও জনমতের যোগসূত্র স্থাপন করা এবং (৪) নেতৃত্ব অভিলাষী ব্যক্তিদের নির্বাচিত করা। স্টীফেন ওয়াস্‌বিও মনে করেন, রাজনৈতিক দল মূলত প্রতিনিধি নির্বাচন করে। অন্য আর যে দুটি কাজ করে তার করার কথা তার একটি হ'ল জনসাধারণকে রাজনীতিতে সক্রিয় করে তোলা এবং অন্যটি জনসাধারণকে বিভিন্ন কর্মসূচীর মূল্য বিচার করতে শেখানো।

নিম্নলিখিতভাবে রাজনৈতিক দলগুলির কার্যাবলী বর্ণনা করা যায় ঃ

প্রথমত, বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক মতামত ও ধ্যান-ধারণাকে সুশৃঙ্খলভাবে উপস্থাপন করা হ'ল রাজনৈতিক দলের একটি প্রধান কাজ। রাষ্ট্রনীতিবিদ লর্ড ব্রাইস তাই বলেন, রাজনৈতিক দল অসংখ্য নির্বাচকের মতামতকে সুসংহত রূপ দেয়। রাজনৈতিক দলকে রাষ্ট্রনীতিবিদ নিউম্যান সম্ভবত সেজন্য মতামত বা ধ্যান—ধারণার আদান-প্রদানের মাধ্যম নামে অভিহিত করেন।

দ্বিতীয়ত, যে কোনও সমাজে বিদ্যমান নানা ধরনের স্বার্থ এবং সেগুলিকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা স্বার্থগোষ্ঠীগুলি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অতীব এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় আইনসভার মধ্য দিয়ে এই সব স্বার্থের প্রকাশ ও সমন্বয় ঘটে। এ-কারণেই আইনসভাকে বলা হয় রাষ্ট্রের কর্মনীতি গ্রহণের 'ক্লিয়াবিং হাউস' এবং রাজনৈতিক দল হ'ল তার চালিকাশক্তি। বস্তুত, রাজনৈতিক দল বিভিন্ন স্বার্থকে ঐক্যবদ্ধ রূপ দিয়ে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় স্থায়িত্ব দেয়। অ্যালমণ্ড ও পাওয়েল একে বলেন, রাজনৈতিক ব্যবস্থায় 'স্বার্থ সমন্বয়ের' প্রক্রিয়া।

তৃতীয়ত, জনসাধারণকে রাজনৈতিক বিষয়ে শিক্ষিত ও সচেতন করে তোলার দায়িত্ব পালন করে রাজনৈতিক দল। স্থানীয় থেকে জাতীয় স্তর পর্যন্ত বিভিন্ন স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি সম্পর্কে রাজনৈতিক দল তার মতামত জনসাধারণের সামনে উপস্থিত করে এবং প্রত্যক্ষভাবে না হোক, অন্তত পরোক্ষভাবেও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় তাদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে চায়।

চতুর্থত, রাজনৈতিক দল সরকারের সঙ্গে জনসাধারণের এবং জনমতের যোগসূত্র রচনা করে। বাস্তবিক গণতন্ত্রে এই যোগসূত্র অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কারণ এর মাধ্যমে নেতৃত্ব যেমন সাধারণ মানুষের মনোভাব ও মতামত জানতে পারেন, তেমন তাদের নির্দিষ্ট পথে চালিত করতে ও নিয়ন্ত্রিত রাখতে সমর্থ হন।

পঞ্চমত, রাজনৈতিক দল নেতৃত্ব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এবং গুরুত্ব অপরিসীম, কারণ দলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করে তার নেতৃত্ব। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাতেও সরকারের পরিচালকরা দলের মাধ্যমেই নির্বাচিত হন। বংশপরম্পরায় নির্বাচিত শাসক নির্বাচিত শাসক নির্বাচনের তোয়াক্কা করেন না, তার জন্য তাদের পেছনে জনসমর্থনও থাকে না।

ষষ্ঠত, প্রায় সব রাজনৈতিক দলের প্রতি তাদের সদস্য ও সমর্থকদের আনুগত্যের এক বড় কারণ মতাদর্শ—

যার ভিত্তিতে দলগুলি সমাজের সামনে নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও কর্মসূচী উপস্থিত করে এবং ব্যাপকতম অংশের মানুষকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে।

সপ্তমত, সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় শাসন ও আইন বিভাগের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে রাজনৈতিক দল। কারণ, এই ব্যবস্থায় সংসদ বা আইনসভায় নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বা মোর্চা সরকার গঠন করে এবং তারপর সেই সরকারের সাথে আইনসভার যোগসূত্রের একমাত্র মাধ্যম দল। আবার রাষ্ট্রপতিচালিত শাসনব্যবস্থায় শাসন ও আইন বিভাগের মধ্যে প্রত্যক্ষ কোনও সম্পর্ক না থাকলেও রাষ্ট্রপতি যে দলের সদস্য, ঘটনাক্রমে আইনসভায় সেই দলের আধিপত্য থাকলে উভয়ের মধ্যে পরোক্ষ সম্পর্ক স্থাপনের উদ্যোগ নেয় সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলটি।

অষ্টমত, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সব রাজনৈতিক দলেরই লক্ষ্য বৈধ ও নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে রাজনৈতিক ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া। সেজন্য, রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নিজ নিজ মতাদর্শ ও কর্মসূচী নিয়ে। নির্বাচিত হ'লে সরকার গঠন করা রাজনৈতিক দলের কাজ। সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলে তার কাজ হয় আইনসভায় বিরোধী দল হিসেবে ভূমিকা পালন করা। এবং

সবশেষে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় স্বার্থকে দাবীতে রূপায়িত করা (interest articulation) ও বিভিন্ন স্বার্থকে সমষ্টিগতরূপে প্রবাহিত করা (interest aggregation) খুব গুরুত্বপূর্ণ দুটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া স্বার্থকে দাবীতে রূপায়ণের কাজ প্রধানত স্বার্থগোষ্ঠীগুলি করে। কিন্তু বিভিন্ন স্বার্থের সমন্বয় ও সমষ্টিকরণ ঘটে রাজনৈতিক দলগুলির মাধ্যমে। আধুনিক আচরণবাদী ব্যবস্থা-বিশ্লেষণপন্থী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ মনে করেন, এভাবেই রাজনৈতিক দল সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে জনসাধারণের বিভিন্ন অংশের চাহিদা বা দাবীর সংযোগসাধন করে।

১৫.৫ আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার রাজনৈতিক দলের ভূমিকা ও গুরুত্ব

আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা মূলত প্রতিনিধিত্বমূলক, যার প্রধান ভিত্তি হ'ল রাজনৈতিক দল। বস্তুত স্বতন্ত্র, বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিকে সমষ্টিবদ্ধ করে রাজনৈতিক দল। নির্বাচনের আসরে যোগ্য ব্যক্তির মনোনয়ন, কর্মসূচী এবং নিরবচ্ছিন্ন প্রচার মানুষের নির্বাচন করার কাজটা সহজ করে দেয়। তাছাড়া, নির্বাচিত হ'তে ইচ্ছুক অনেক যোগ্য ব্যক্তির পক্ষেও নির্বাচনের জন্য যে আর্থিক সঙ্গতি ও সাংগঠনিক শক্তি থাকা উচিত তা সংগ্রহ করে ওঠা সম্ভব হয় না। রাজনৈতিক দল এই ঘাটতিটুকু পূরণ করে।

দ্বিতীয়ত, কেবল নির্বাচন নয়, নির্বাচন উত্তরকালে সরকার গঠন ও স্থায়িত্ব রক্ষার প্রশ্নেও রাজনৈতিক দলগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। বাস্তবিক, সরকার গড়ে তোলার পাশাপাশি তাকে স্থায়ী করার প্রশ্নে রাজনৈতিক দলগুলিকে রণকৌশল গ্রহণ করতে হয়। তদুপরি সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রেও রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা অপরিহার্য। নানা ধরনের মত ও দল (মোর্চা সরকারের ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য) এর মধ্যে সমন্বয় আনার কাজটা রাজনৈতিক দলকেই করতে হয়।

তৃতীয়ত, গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের গুরুত্বের আর একটি কারণ হ'ল গণতন্ত্রের আদর্শের রূপায়ণ রাজনৈতিক দল ছাড়া সম্ভব নয়। যেমন গণতন্ত্র মানেই জনমতের শাসন—আর সুগঠিত জনমত গড়ে তোলার প্রশ্নে রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা সন্দেহাতীতভাবে প্রধান। রাষ্ট্রনীতিবিদ লোয়েল (Lowell) তাই বলেন, জনমতকে দৃষ্টিগোচর করা রাজনৈতিক দলের মূল কাজ এবং রাজনৈতিক দলের অস্তিত্বের আসল কারণ (Their essential

function and the true reson for their existence, is bringing public opinion to a focus and framing issues for a public verdict.)

চতুর্থত, গণতন্ত্রের সাফল্যের একটি প্রধান শর্ত যেমন জনমতের প্রাধান্য, তেমনি অন্য একটি প্রধান শর্ত রাজনৈতিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত, সক্রিয়া নাগরিক। এর জন্য শুধু আনুষ্ঠানিক শিক্ষাই যথেষ্ট নয়, রাজনৈতিক শিক্ষা প্রয়োজন। রাজনৈতিক দল বিভিন্ন বিকল্প কর্মসূচী মানুষের কাছে উপস্থিত করে এবং সরকারের কাজকর্ম সম্পর্কে সংবাদ সরবরাহ করে তাঁদের রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তুলতে সাহায্য করে।

পঞ্চমত, গণতন্ত্রের আর একটি মূল নীতি হ'ল শাসনব্যবস্থার ওপর জনসাধারণের নিয়ন্ত্রণ। আর এই নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে রাজনৈতিক দল এক বড় ভূমিকা নেয়। যেমন, দল রাজনৈতিক নেতৃত্বকে নির্বাচন করে এবং পাশাপাশি নেতৃত্বের সঙ্গে দলের সদস্য-সমর্থকদের সম্পর্ক দলের মাধ্যমেই বজায় থাকে। তাছাড়া বিরোধী দলও শাসন কর্তৃত্বের নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

সব মিলিয়ে তাই বলা যায়, আধুনিক গণতন্ত্রে একদিকে যেমন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কার্যসাধনের বন্দোবস্ত রাজনৈতিক দল ছাড়া চল, অন্যদিকে তেমন, গণতন্ত্রের নীতি ও আদর্শের রূপায়ণের জন্য রাজনৈতিক দল অপরিহার্য। ম্যাকাইভার এর ভাষায় বলা যায় ঃ রাজনৈতিক দল না থাকলে ঐক্যবদ্ধ কর্মনীতির ঘোষণা বা কর্মসূচীর সুশৃঙ্খলা বিবর্তন সম্ভব হয় না এবং নিয়মিত সংসদীয় নির্বাচনের সাংবিধানিক পদ্ধতির প্রয়োগ অসম্ভব হয়ে পড়ে।

১৫.৬ দলব্যবস্থা

রাজনৈতিক দলগুলির কাঠামো এবং সেগুলির নির্ধারকসমূহ রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলির কার্যাবলী অনুধাবনের এক প্রস্থ সহায়কের ভূমিকা নেয়। বস্তুত রাজনৈতিক দলগুলি রাজনৈতিক ব্যবস্থার অভ্যন্তরেই কাজ করে এবং স্বাভাবিকভাবে তাই ব্যক্তি আচরণের ওপর সংশ্লিষ্ট এই ব্যবস্থা প্রগাঢ় প্রভাব বিস্তার করে। দ্বিদলীয় ও বহুদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থায় কেন্দ্রীভূত ও নির্দিষ্ট মতাদর্শনির্ভর শৃঙ্খলাপরায়ণ রাজনৈতিক দলগুলি নিশ্চিতভাবেই স্বতন্ত্র আচরণ করে। যেমন ব্রিটিশ রাজনৈতিক ব্যবস্থায় লেবার পার্টি ও লিবারেল পার্টি কখনই নির্দিষ্ট রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে একই মনোভাব পোষণ করে না। সম্ভবত, এ কারণে অ্যালান বল সতর্ক করে দিয়ে এই অভিমত জ্ঞাপন করেন যে কেবলমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ দলগুলির সংখ্যাকে মাপকাঠি করে রাজনৈতিক দলগুলির শ্রেণীবিন্যাস সঙ্গত নয়। একই সংখ্যক বড় রাজনৈতিক দল থাকা সত্ত্বেও দু'টি রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য দেখা যায়। তাই আমরা যখন একদলীয়, দ্বিদলীয় ও বহুদলীয় ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য রচনার চেষ্টা করি, তখন আমরা রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলিকে এক এক গুচ্ছের মধ্যে ভাগ করে নেবার চেষ্টা করি। আর এভাবেই আমরা ব্রিটিশ ও আমেরিকার দলব্যবস্থাকে দ্বিদলীয় ব্যবস্থা, ইতালি ও সুইডিশ ব্যবস্থাকে বহুদলীয় ব্যবস্থা এবং চীন ও তানজানিয়ার দলব্যবস্থাকে একদলীয় ব্যবস্থার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করি—অথচ, এইভাবে শ্রেণীবিন্যাসের মধ্য দিয়ে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলব্যবস্থাগুলির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যাদি সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানা যায় না।

দলব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনায় অ্যালান বল আর একটি সমস্যার কথা বলেন। তাঁর কথায় পার্লামেন্টে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সংখ্যা এবং নির্বাচকমণ্ডলীর সমর্থনের পরিমাণও শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থায়

দলগুলির ক্ষমতা ও প্রভাবের পরিমাপ করতে অসমর্থ। পাশাপাশি এটাও মনে রাখা দরকার যে, দলব্যবস্থা মূলত নমনীয় প্রকৃতির ও পরিবর্তনশীল। তাছাড়া ব্রিটিশ দলব্যবস্থাকে একটি আদর্শস্থানীয় দ্বিদলীয় ব্যবস্থার প্রতীক ধরা হ'লেও সেখানকার লিবারেল পার্টি সেদিন পর্যন্ত এক বড় শক্তি হিসেবে বিবেচিত হ'ত।

১৫.৭ দলব্যবস্থায় শ্রেণীবিভাগ

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা নানাভাবে দলব্যবস্থার শ্রেণীবিভাগ করেছেন। অ্যালান বল অবশ্য এর সাথে সত্যতা ও তথ্যমূলক-এর মত শর্তগুলি জুড়ে দিয়েছেন, এই শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কিত আলোচনার সার্থকতা নিরূপণের জন্য। বল-কথিত শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কিত আলোচনাটি হ'ল এরূপ ঃ ১। অস্পষ্ট বা ইনডিসটিংক্ট দ্বিদলীয় ব্যবস্থা (যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র); ২। সুস্পষ্ট দ্বিদলীয় ব্যবস্থা (যেমন ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া বা পূর্বতন পশ্চিম জার্মানী), ৩। কার্যরত, বা ওয়ার্কিং বহুদলীয় ব্যবস্থা (যেমন, নরওয়ে, সুইডেন); ৪। অব্যবস্থা বা আনস্টেবল বহুদলীয় ব্যবস্থা; ৫। প্রভুত্বকারী বা ডমিন্যান্ট দলীয় ব্যবস্থা (যেমন, ভারত, মালয়েশিয়া); ৬। একদলীয় বা ওয়ান পার্টি ব্যবস্থা (যেমন, স্পেন, মিশর) এবং ৭। সর্বাত্মক বা টোটালিট্যারিয়ান একদলীয় ব্যবস্থা (যেমন, পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন কিংবা নাৎসী জার্মানী ইত্যাদি)।

রাজনৈতিক দলব্যবস্থার সংখ্যা বিচার করলে, যে কোনও শ্রেণীবিভাগ ব্যবস্থার মতই কতকগুলি অস্পষ্টতার মুখোমুখি হ'তে হয়। যেমন, প্রতিযোগিতামূলক ও অপ্রতিযোগিতামূলক দলব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্যের রেখা টানতে গিয়ে কারও কাছে একদলীয় ব্যবস্থা ব্যতিক্রমী প্রকৃতির মনে হ'তে পারে। যেমন, তানজানিয়ার দলব্যবস্থা একদলীয় সর্বাত্মক হ'লেও তার বহুধা প্রকৃতি (high degree of pluralism) দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিদলীয় ব্যবস্থাকে হার মানায়। অ্যালান বল অবশ্য মনে করেন, ইউরোপীয় মডেলগুলি শ্রেষ্ঠতর হ'লেও উন্নয়নশীল দেশগুলিতে গড়ে ওঠা দলব্যবস্থাগুলির ওপর তাদের প্রভাব অনস্বীকার্য এবং কেবলমাত্র আধুনিকীকরণের মাত্রা দিয়ে এইসব তারতম্য বিচার করা যায় না; বরং প্রাতিষ্ঠানিক উপাদানগুলি এক্ষেত্রে বিচার্য হতে পারে।

আবার অনেক দেশের দলব্যবস্থাবিহীন কাঠামো গুপ্ত দলব্যবস্থার কাঠামোকে গোপন করতে চায়, যেমন গ্রীস, কিংবা সংঘবদ্ধ দলব্যবস্থায় অনুপস্থিতিকে প্রকট করে, যেমন থাইল্যান্ড। আবার অনেক সময় নির্দিষ্ট কোনও দলব্যবস্থা পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক কাঠামোকেও প্রতিফলিত করে—যেমন, একদলীয় শাসনব্যবস্থা অনেক সময় প্রতিযোগিতামূলক দলব্যবস্থার ফলশ্রুতি হয়ে ওঠে; কখনও বা ত্রিদলীয় দলব্যবস্থাকে একসময় দ্বিদলীয় দলব্যবস্থার পূর্বসূরী হয়। পাশাপাশি, কোনও কোনও দলব্যবস্থা ইতিহাসসমৃদ্ধ প্যাটার্ণগুলি দ্রুত মেনে নেওয়ার পারদর্শিতা দেখায়, যার সব থেকে বড় উদাহরণ হ'ল আইরিশ দলগুলি, যাদের ভিত্তি ছিল ১৯২১ সালের চুক্তি। অবশ্য এতদ্‌সত্ত্বেও, এ-কথা সংশয়াতীতভাবে বলা যায় না, দলব্যবস্থাগুলির পরিবর্তনের প্রশ্নে উল্লিখিত প্যাটার্ণগুলি ধারাবাহিকভাবে অনুসৃত হবে।

অস্পষ্ট দ্বিদলীয় ব্যবস্থার সর্বপেক্ষা বড় বৈশিষ্ট্য হল ঃ কোনও গণতান্ত্রিক দলের অনুপস্থিতি, দলীয় মতাদর্শের ওপর কম নির্ভরতা, সাংগঠনিক স্তরবিন্যাসের অস্বীকৃতি এবং নির্বাচনী সাফল্য সংক্রান্ত কার্যাবলীর ওপর মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব প্রদান (The characteristics of the indistinct two party systems are the

absence of mass parties, less emphasis on party indeology, lack of a hierarchical structure and a concentration on vote winning functions.) এই ব্যবস্থা, সর্বোপরি, বিকেন্দ্রীকৃত (decentralised) এবং ব্যক্তিক সাফল্যনির্ভর। অবশ্য আয়ারল্যান্ড ও কানাডার মত দেশে ছোট ছোট সামাজিক গণতান্ত্রিক দলগুলির আধিক্য দেখা যায়, তথাপি জাতীয় স্তরে প্রভাবশালী রক্ষণশীল বা উদারদলগুলির সুরক্ষিত অবস্থানকে (entrenched position) চ্যালেঞ্জ জানানোর মত সক্ষমতা তারা অর্জন করতে পারেনি।

দ্বিতীয়ত, সুস্পষ্ট দ্বিদলীয় ব্যবস্থায় দলগুলি অনেক বেশী কেন্দ্রীভূত—এমনকি, পূর্বতন পশ্চিম জার্মানী কিংবা অস্ট্রেলিয়ার মত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও এ-কথা প্রযোজ্য। এখানে দলগুলি অনেক বেশী শ্রেণী ও ধর্মীয় বিশ্বাসনির্ভর এবং দক্ষিণপন্থী রক্ষণশীল দলগুলির সঙ্গে সতত যুধ্যমান যা নির্বাচনী যুদ্ধে অনেকখানি মতাদর্শগত প্রশ্নটিকে বাস্তব করে তোলে। সংখ্যালঘু দলগুলির অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও তারা কখনই সংসদীয় ব্যবস্থার সার্বিক কার্যধারায় তেমনভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে না।

তৃতীয়ত, কার্যরত বহু দলব্যবস্থা বলতে বোঝায় সেইসব দল ব্যবস্থা যেখানে অনেকগুলি রাজনৈতিক দল থাকা সত্ত্বেও ব্যবস্থাটি প্রায় সুস্পষ্ট দ্বিদলীয় ব্যবস্থার মত হয়ে ওঠে, অন্তত সরকারের স্থায়িত্বের মত প্রশ্নগুলিতে। যেমন, সুইডেন ও নরওয়েতে বিভিন্ন সামাজিক-গণতান্ত্রিক দলগুলির (Social democraticparties) পাশাপাশি বিভিন্ন দক্ষিণপন্থী দল, যেমন উদারপন্থী, রক্ষণশীল বা ক্রিশ্চিয়ান দলগুলি থাকলেও সংসদে কার্যকরী সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রশ্নে সামাজিক গণতান্ত্রিক দলগুলি নিশ্চিতভাবেই প্রাধান্য পায়।

চতুর্থত, অব্যবস্থা বা আনস্টেবল বহুদলীয় ব্যবস্থার মূল কথাই হল সরকারের স্থায়িত্বহীনতা। এই ব্যবস্থায় সরকার গড়ে ওঠে মূলত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মোর্চার ভিত্তিতে। এই ধরনের সরকারের সবচেয়ে ভাল উদাহরণ ইতালীয় দলব্যবস্থা। অন্তত আটটি দল সেখানে সংসদে তাদের প্রতিনিধি প্রেরণ করে, অথচ কোনও দলের পক্ষেই এককভাবে ক্ষমতা দখল করা সম্ভব হয় না।

পঞ্চমত, প্রভুত্বকারী বা ডমিন্যান্ট দলব্যবস্থায় একাধিক দলের অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও একটি দলই হয়ে ওঠে প্রাধান্য প্রভুত্বকারী। তুলনায় অন্যান্য রাজনৈতিক দল হয় নিষ্প্রভ। বহু দলব্যবস্থায় একাধিক দলের আঁতাতের মধ্যে দিয়েও প্রভুত্বকালী দলব্যবস্থা দেখা দিতে পারে। ভারতে স্বাধীনোত্তরকালে দীর্ঘদিন ধরে যে দলব্যবস্থা ছিল তাকে প্রভুত্বকারী দলব্যবস্থা বলা যায়; সেখানে বহু দল থাকলেও কংগ্রেস দলের একাধিপত্য ছিল সুস্পষ্ট।

ষষ্ঠত, একদলীয় বা ওয়ান পার্টি ব্যবস্থা, যার সুস্পষ্ট চিহ্নিতকরণ এক কথায় কষ্টসাধ্য। বিপ্লবী এলিট নিয়ন্ত্রিত মিশরের সোস্যালিস্ট ইউনিয়ন (যেখানে সাবেকী মিশরীয় এলিটদের ক্ষমতা দখলের চেষ্টাকে প্রতিহত করার চেষ্টা হয়) সেখান থেকে শুরু করে তানজানিয়ার আফ্রিকান ন্যাশনাল ইউনিয়ন দল (যার মূলত ভিত্তি হ'ল উপদলীয় কোন্দল) পর্যন্ত এই ধরনের দলীয় ব্যবস্থার সবথেকে বড় উদাহরণ। ফ্রাঙ্কোর নেতৃত্বাধীন স্পেনের ফ্যালানজে (Falange) দলের ক্ষেত্রেও এই ধরনের দলব্যবস্থার উদাহরণ হিসাবে দেওয়া যায়, যদিও অধুনা এই দলের প্রভাব অস্তমিত।

সপ্তমত, সর্বাত্মক বা টোটালিটিরিয়ান দলব্যবস্থার সাথে একদলীয় ব্যবস্থার মূল পার্থক্য হ'ল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কার্যসূচীর ওপর নিয়ন্ত্রণ থেকে শুরু করে প্রভুত্বকারী মতাদর্শ এবং রাজনৈতিক

এলিট নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট প্রভুত্বকারী দলটির নিয়ন্ত্রণের মাত্রা।

তবে মনে রাখা প্রয়োজন, রাজনৈতিক দলব্যবস্থার নির্ধারক ও তার পরিবর্তনের কারণগুলি অত্যন্ত জটিল প্রকৃতির এবং বিচ্ছিন্ন করা কষ্টসাধ্য। আপাত অর্থে বৈপ্লবিক পরিস্থিতি কিংবা রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্কটকে সর্বাত্মক ও একদলীয় ব্যবস্থার উৎস হিসেবে ধরা হয় —আবার নতুন সামাজিক ও রাজনৈতিক চাপ অথবা পরিবর্তিত রাজনৈতিক মনোভাব অন্য ধরনের ব্যবস্থার প্রতি সমর্থন জানাতে পারে (Revolutionary situations and political crises are factors in the origins of totalitarian and single party systems ; new social and political pressures and changing political attitudes may produce new demands)। তাই ব্রিটেনে লিবারেল পার্টিকে শেষ পর্যন্ত লেবার পার্টির কাছে একরকম আত্মসমর্পণ করতে হয় বিংশ শতাব্দীর যুথবদ্ধ রাজনৈতিক দাবী পূরণ করার অক্ষমতার কারণে। আবার একথাও সত্য যে, ঐতিহাসিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়া অনেক সময় দলব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের অনুঘটক হিসেবে কাজ না-ও করতে পারে—যার সবথেকে ভালো উদাহরণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যেখানে শিল্পায়ন ও সামাজিক কাঠামোর নাটকীয় সমৃদ্ধি ঊনবিংশ শতাব্দীর দলব্যবস্থায় তেমন কোনো বড় ধরনের পরিবর্তন আনে নি (....the process of historical change may not always lead to alterations in the party system ; the party system of the United States has not significantly changed during the dramatic growth and industrialisation of the country and the parties still effect the early nineteenth century characteristics.)।

১৫.৮ অনুশীলনী

রচনাধর্মী উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

(১) রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা দিন। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী আলোচনা করুন।

(২) বর্তমান বিশ্বের রাজনৈতিক দলব্যবস্থার একটি বিবরণ দিন।

(৩) আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকার মূল্যায়ন করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

(১) রাজনৈতিক দলের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য লিখুন।

(২) মরিস দুভার্জার কীভাবে রাজনৈতিক দলকে শ্রেণীবিন্যস্ত করেছেন?

(৩) অ্যালান বলকে অনুসরণ করে দলব্যবস্থার শ্রেণীবিভাগ করুন।

(৪) প্রভুত্বকারী দলব্যবস্থা সম্পর্কে একটি টীকা লিখুন।

(৫) রাজনৈতিক দলব্যবস্থার নির্ধারকগুলি কী সতত চূড়ান্ত? আপনার মন্তব্য লিখুন।

বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন

(১) রাজনৈতিক উপদল বলতে কি বোঝায়?

(২) দলব্যবস্থা কাকে বলে?

(৩) দলব্যবস্থা কত রকম হয়?

(৪) বহুদলীয় ব্যবস্থা কাকে বলে?

(৫) একদলীয় ব্যবস্থা ও সর্বাত্মক একদলীয় ব্যবস্থা কি এক ধরনের?

১৫.৯ গ্রন্থপঞ্জী

(১) Almond, G. A. & Powell G.B. (Jr.) : Comparative Politics - A Development Approach, 1975.

(২) Ball, R. Alan : Modern Politics and Government, 1973.

(৩) Blondel, J. : Comparative Government—A Reader, 1985.

(৪) Duverger, M. : Political Parties, 1979.

(৫) চক্রবর্তী. হিমাচল ঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞান ১৯৯৫।

একক ১৬ ❐ স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী এবং চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী

গঠন

১৬.০ উদ্দেশ্য

১৬.১ প্রস্তাবনা— রাষ্ট্রতত্ত্বে গোষ্ঠীবাদ

১৬.২ স্বার্থান্বেষী ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর প্রকৃতি ও সংজ্ঞা

১৬.৩ স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর শ্রেণিবিভাগ

১৬.৪ উদার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কার্যাবলী ও ভূমিকা

১৬.৫ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কার্য-পরিচালনার স্তর

১৬.৬ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কার্য-পদ্ধতির নির্ধারকসমূহ

১৬.৭ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী ও রাজনৈতিক দলের সম্পর্ক

১৬.৮ অনুশীলনী

১৬.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১৬.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন ঃ

- স্বার্থন্বেষী ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী কাকে বলে ও তাদের শ্রেণিবিভাগ;
- চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কার্যধারা ও
- চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী ও রাজনৈতিক দলের সম্পর্ক।

১৬.১ প্রস্তাবনা—রাষ্ট্রতত্ত্বে গোষ্ঠীবাদ

আধুনিক রাষ্ট্রের প্রক্রিয়া প্রকরণ (Political process) আলোচনায় পশ্চিমী রাষ্ট্রনীতিবিদগণ রাষ্ট্রকে শুধুমাত্র একটি সুসঙ্গত ঐক্যবদ্ধ ব্যবস্থা হিসেবে দেখেন না। তাঁদের বিচার বিশ্লেষণে রাষ্ট্র সমাজেরই অঙ্গীভূত একটি প্রতিষ্ঠান এবং একে অপরের ওপর নিয়ত ক্রিয়াশীল। এই পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যম হিসেবে তাঁরা গোটা সমাজকে টেনে না এনে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেন সক্রিয় নানা গোষ্ঠীকে। আসলে, পুরসমাজ (Civil society) ব্যাপারটাই একালে নানা সংঘ-সমিতি তথা গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে রয়েছে—যার সঙ্গে তুলনা করা যায় মোজাইক করা ঘরের মেঝের। শিল্পায়ন ও নগরায়নের প্রসারের ফলে এই সব গোষ্ঠীর মধ্যে সচলতা ও সচেতনাও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

গণতান্ত্রিক রাজনীতির প্রেক্ষিতে গোষ্ঠীগুলি ক্রমশই বেশি মাত্রায় সংগঠিত রূপ নিতে চলেছে। গণতন্ত্রে

সরকরার গড়ে ওঠে প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে এবং স্বভাবতই স্বীকার করে নেয় নাগরিকদের প্রতি তার দায়িত্বশীলতা। ফলে, বর্তমান যুগে রাষ্ট্রের সঙ্গে সমাজের যে প্রতিনিয়ত সম্পর্ক রয়েছে সেটি সবিশেষ অনুধাবন করতে হলে বিশেষ প্রয়োজন আলাদা আলাদাভাবে সেইসব জনমণ্ডলীর উদ্ভব ও ভূমিক বিশ্লেষণ—যেগুলির সঙ্গে সরকারের নিয়মিত আদান-প্রাদন চলে।

রাষ্ট্রিক প্রক্রিয়ার এই বিশ্লেষণ থেকে উদ্ভুত হয়েছে যে তত্ত্ব সাধারণভাবে তা গোষ্ঠীতত্ত্ব (Group theory) নামে চিহ্নিত। এই তত্ত্বে আলাদাভাবে ব্যক্তি কিংবা সামগ্রিকভাবে সমাজকে বড় করে দেখানো হয় না। এক অর্থে বলা চলে, সার্বভৌম রাষ্ট্রের বহুত্ববাদী ব্যাখ্যা (pluralist approach) থেকে প্রসারিত হয়েছে এই গোষ্ঠীতত্ত্ব। ফিগিস, মেইটল্যান্ড, ল্যাস্কি প্রমুখ রাষ্ট্রনীতিবিদগণের লেখায় কিছু আভাস থাকলেও এর প্রধান প্রবক্তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আর্থার বেন্ট্‌লী (Arthur Bentley : 1906) ডেভিজ ট্রুমান (David Truman : 1964), রয় ম্যাক্রাইডিস (Roy Macridis : 1964) এবং গ্যাব্রিয়েল আমন্ড (Gabriel Almond)। সংক্ষেপে এই তাত্ত্বিকগণ বলতে চাইছেন, আধুনিক সমাজে বিভিন্ন স্বার্থের মধ্যে একপ্রকারের ভারসাম্য রচনার দায়িত্ব নিতে পারে সংঘবদ্ধ গোষ্ঠীসমূহ। তাদের সাধারণ স্বার্থজড়িত বিষয়গুলি নিয়ে তারা একত্র হতে পারে এবং রাষ্ট্রকে অভিপ্রেত নীতি নির্ধারণে প্রভাবিত করতে পারে। এমনই অসংখ্য গোষ্ঠীর মধ্যে থেকে সরকারের ভূমিকাটি কখনও নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকের কখনও সক্রিয় হস্তক্ষেপের। এই পরিপ্রেক্ষিতেই এই এককটিতে আলোচ্য বস্তু হিসেবে তুলে ধরা হবে স্বার্থান্বেষী ও চাপসৃষ্টিকারী এই দুই প্রকারের গোষ্ঠীর আচরণ ও কার্যাবলী।

১৬.২ স্বার্থান্বেষী ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর প্রকৃতি ও সংজ্ঞা

আধুনিক উদার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্টীগুলি (interest groups and pressure groups) প্রায় অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে। সবার স্বার্থ এক, এরকম কিছু ব্যক্তি যদি গোষ্ঠীবদ্ধ হয় এবং তাদের গোষ্ঠী হিসেবে স্বতন্ত্র পরিচয় এবং জনমত ও সরকারের ওপর প্রভাব থাকে, তাহলে সেই গোষ্ঠীকে স্বার্থান্বেষী বা স্বার্থবাহী বা কেবল স্বার্থগোষ্ঠী বলা হয়। অ্যালান বল-এর ভাষায় ঃ যেসব গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে বৈষায়িক অবস্থার মিল থাকে, সবাই একই পেশায় নিযুক্ত—যেমন, সবাই কৃষক ব্যবসায়ী বা মিস্তির এবং একই মনোভাবাপন্ন হয়, সেসব গোষ্ঠীকে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী বলা হয় (Interest groups...can be defined as those groups in which the shared attitudes of the members result from common objective characteristics)। অ্যালমন্ড ও পাওয়েল স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী বলতে বোঝান ঃ যাদের সদস্যরা একই স্বার্থ ও সুবিধার বন্ধনে গোষ্ঠীবদ্ধ হয় এবং সবাই ঐ সব ও সুবিধা সম্পর্কে সচেতন থাকে (By interest group we mean a group of individuals who are linked by particular bonds of concern or advantage and who have some awareness of these bonds)।

স্বার্থান্বেষী ছাড়াও আর এক ধরনের গোষ্ঠী আধুনিক সমাজে দেখা যায়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ এইসব গোষ্ঠীকে সমমনোভাবাপন্ন গোষ্ঠী (Attitude group) আখ্যা দেন। সমমনোভাবাপন্ন গোষ্ঠী ও স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী একই মনোভাবের অংশীদার হলেও সমমনোভাবাপন্ন গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে বৈষয়িক অবস্থা বা সামাজিক

অবস্থানের প্রশ্নে মিল থাকে না। বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তি বা বিভিন্ন সামাজিক স্তরের কিছু ব্যক্তি যেমন কোনও একটি বিষয়ে মূলত একমনোভাবাপন্ন হয়ে গোষ্ঠী গঠন করে, তখন সেই গোষ্ঠীকে বলা হয় সমমনোভাবাপন্ন গোষ্ঠী।

অন্যদিকে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী বা Pressuro Group বলতে উভয় ধরনের গোষ্ঠীকেই বোঝায়। কোনও একটি স্বার্থান্বেষী বা সমমনোভাবাপন্ন গোষ্ঠী সরকার বা শাসন ব্যবস্থার ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে এবং চাপ দিয়ে সরকারের সিদ্ধান্তকে নিজস্ব গোষ্ঠীস্বার্থের অনুকূলে নিয়ে আসতে সমর্থ হলে সেই গোষ্ঠীকে বলে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী। সরকার বা সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের প্রভাবিত করার ক্ষমতাই চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর প্রধান বৈশিষ্ট্য। রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের ওপর চাপসৃষ্টি বা দাবি উত্থাপনের প্রক্রিয়াকে বলা হয় স্বার্থের গ্রন্থিকরণ (Interest articulation)। বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে গোষ্ঠী তার স্বার্থ গ্রন্থিকরণ করে এবং বলা বাহুল্য যেসব গোষ্ঠীর এই স্বার্থ গ্রন্থিকরণের ক্ষমতা আছে, সেগুলিই হল চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী। অবশ্য, প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলি আইন বা সংবিধান স্বীকৃত নয়, আর সে কারণেই এইসব গোষ্ঠীকে অনানুষ্ঠানিক কাঠামো বা Informal structure বলা হয়।

১৬.৩ স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর শ্রেণীবিভাগ

সাংগঠনিক ও প্রকৃতিগত বিচারে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। অ্যালমন্ড ও পাওয়েল আধুনিক উদার গণতান্ত্রিক সমাজের স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলিকে চার ভাগে বিভক্ত করেছে। এই বিভাজনের ভিত্তি হিসেবে তাঁরা দু'টি বিষয়কে নির্বাচিত করেছেন : এর একটি হ'ল গোষ্ঠীর স্বার্থ গ্রন্থিকরণের ধরন এবং অন্যটি স্বার্থ গ্রন্থিকরণের পদ্ধতি। যে চার ধরনের স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর কথা তাঁরা বলেছেন, সেগুলি হ'ল প্রথমত, স্বতঃস্ফূর্ত স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী বা Spontaneous Interest Group. দ্বিতীয়ত, অসঙ্ঘমূলক স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী বা Non-associational Interest Group, তৃতীয়ত, প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী বা Institutional Interest Group, ও চতুর্থত, সঙ্ঘমূলক স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী বা Associational Interest Group । সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীগুলিকে এভাবে আলোচনা করা যায় ঃ

প্রথমত, স্বতঃস্ফূর্ত স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী ঃ সাধারণভাবে এই সব গোষ্ঠী স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে ওঠে এবং এগুলির আত্মপ্রকাশ

অনেকটা ব্যক্তির আত্মপ্রকাশের আচরণের মত। তবে স্বতঃস্ফূর্ত গোষ্ঠীগুলি হ'ল মূলত অসংগঠিত ও সাময়িক এবং স্বার্থ গ্রন্থিকরণের পদ্ধতি হয়ে প্রচলিত রীতি-বহির্ভূত। দাঙ্গা, মিছিল, অবরোধ, রাজনৈতিক হত্যা এ রকমই কয়েকটি উদাহরণ। অনেকের ধারণা সংগঠিত গোষ্ঠীগুলি দাবি আদায়ে অসমর্থ হওয়ায় এই ধরনের গোষ্ঠীগুলির সৃষ্টি হয়।

দ্বিতীয়ত, অসঙ্ঘমূলক স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী ঃ আত্মীয় সম্পর্ক, জ্ঞাতি, অঞ্চল, বংশ, মর্যাদা বা শ্রেণীকে ভিত্তি করে স্বার্থন্বেষী গোষ্ঠী গড়ে উঠলে তাকে এই পর্যায়ে অন্তভুক্তি করা হয়। তবে এই সব গোষ্ঠী মাঝে

মধ্যে সক্রিয় হয় এবং এই সক্রিয়তার কোনও ধারাবাহিকতা থাকে না। তাছাড়া সাংগঠনিক কাঠামোর অনুপস্থিতিও এই ধরনের গোষ্ঠীগুলির আর একটি বৈশিষ্ট্য। সম্ভবত, এসব কারণে শেষপর্যন্ত অসঙ্ঘমূলক গোষ্ঠীগুলি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় তেমন কোনও প্রভাব ফেলতে পারে না।

তৃতীয়ত, প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী ঃ উদার রাজনৈতিক কাঠামোর রাজনৈতিক দল, আইনসভা, সামায়িক বাহিনী, আমলাতন্ত্র এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে এই ধরনের গোষ্ঠীগুলি গড়ে ওঠে। সাধারণভাবে এই সব গোষ্ঠীর কতকগুলি বৈশিষ্ট্য থাকে ; যেমন এগুলি হয় সুসংগঠিত এবং বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে সৃষ্ট। তাছাড়া গোষ্ঠীর সদস্যদের স্বার্থসিদ্ধি ছাড়াও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক বা সামাজিক ভূমিকা থাকে। উপরন্তু, এই ধরনের গোষ্ঠী সমাজে ও রাজনৈতিক জীবনে প্রভাবশালী হয়। সর্বোপরি, গোষ্ঠীগুলি স্থায়ী প্রকৃতির হয়ে থাকে। সরকারী কর্মচারী বা আমলাতন্ত্রের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের উপদল বা চক্র, সামরিক বাহিনীর মধ্যে না ধরনের চক্র ইত্যাদি হ'ল এইসব গোষ্ঠীর উদাহবণ এবং চতুর্থত, সঙ্ঘমূলক স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী ঃ সঙ্ঘমূলক গোষ্ঠী স্বার্থ গ্রন্থিকরণের বিশেষ ধরনের কাঠামো যাকে আবার বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠী হিসাবেও চিহ্নিত করা হয়; কারণ মূলত, বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে এই ধরনের স্বার্থন্বেষী গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। তিনটি বৈশিষ্ট্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় ঃ (১) এই গোষ্ঠী নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর স্বার্থকে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে; (২) এই ধরনের গোষ্ঠীর সর্বক্ষণের জন্য পেশাদার কর্মী থাকে এবং (৩) এইসব কর্মী কেবল সংশ্লিষ্ট স্বার্থগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করে না নির্দিষ্ট পদ্ধতির মাধ্যমে সুসংহতভাবে দাবি-দাওয়া পেশ করে। বলা বাহুল্য, আধুনিক উন্নত সমাজে সঙ্ঘমূলক গোষ্ঠীর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এইসব গোষ্ঠীর সুবিধা হ'ল, এদের সাংগঠনিক ভিত্তি অন্যান্য উন্নত সমাজে সঙ্গামূলক গোষ্ঠীর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এইসব গোষ্ঠীর সুবিধা হ'ল, এদের সাংগঠনিক ভিত্তি অন্যান্য গোষ্ঠীর থেকে সুদৃঢ় হয় এবং এদের লক্ষ্য ও কর্মকৌশল প্রায় সময় সমাজে বৈধ বলে স্বীকৃত হয়। সর্বোপরি এদের কর্মক্ষেত্রে ব্যাপক হয় বলে এরা অন্য স্বার্থবাহী গোষ্ঠীর স্বার্থও সিদ্ধ করে (Comparative Politics)

১৬.৪ উদার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কার্যাবলী ও ভূমিকা

আর্থার বেন্টলি (Arthur Bentley) ১৯০৮ সালে প্রকাশিত The Process of Government গ্রন্থে প্রথম গোষ্ঠীর ভূমিকার কথা বললেও, প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-উত্তর কালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জগতে তা প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। উদার গণতান্ত্রিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থায় গোষ্ঠীর ভূমিকা সম্পর্কে গোষ্ঠীবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা যেসব প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন তার মধ্যে অন্তত তিনটি বিষয় অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলে প্রতিভাত হয়। এর প্রথমটি হ'ল পরস্পর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত বিভিন্ন গোষ্ঠীর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় বহু রাজনৈতিক সংঘাতের পরিণতি নির্ধারিত হয়। দ্বিতীয়ত, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলি থাকার ফলে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ অনেক ব্যাপ্ত হয়। এবং তৃতীয়টি হ'ল চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর জন্য ক্ষমতার বন্টন আরও ব্যাপক হয়।

উদার গণতন্ত্রে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর উপরিউক্ত ভূমিকা যেসব ভূমিকা কার্যাবলীর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে প্রথান হ'ল গোষ্ঠীস্বার্থের প্রতিফলন। রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যাঁরা যুক্ত থাকেন, তাঁরা যাতে গোষ্ঠীস্বার্থের দাবি পূরণ করেন তার জন্য চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী তাদেরকে প্রভাবিত

করার চেষ্টা করে। বস্তুত, গোষ্ঠীর বিভিন্ন স্বার্থকে সূত্রবদ্ধ করে দাবি আকারে সিদ্ধান্তকারীদের নজরে আনা এবং চাপ দিয়ে সেগুলি পূরণের ব্যবস্থা করাই চাপসৃষ্টকারী গোষ্ঠীর প্রধান কাজ। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ একে স্বার্থ গ্রন্থিকরণ ও স্বার্থ আদায় বলে অভিহিত করে থাকেন।

স্বার্থ গ্রন্থিকরণ করতে গিয়ে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গে জনসাধারণের বিভিন্ন অংশের যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। অনেক সময় চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী শুধু গোষ্ঠী-স্বার্থই নয়, সামগ্রিক স্বার্থকেও প্রাসঙ্গিক করে তোলে এবং তা পূরণের উদ্যোগ নেয়। আর, এই লক্ষ্য পূরণের জন্য সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠী জনমত গঠনের চেষ্টা করে এবং বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে সংযোগসাধনে সক্রিয় হয়ে ওঠে। তাই একদিকে রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গে গোষ্ঠীর এবং অন্যদিকে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে সংযোগসধন চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর এখ গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়ে ওঠে।

সরকারকে প্রভাবিত করার পাশাপাশি, রাজনৈতিক দলের নীতি ও কর্মসূচী নির্ধরণের ক্ষেত্রেও দলভুক্ত বিভিন্ন চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী সক্রিয় ভূমিকা নেয়। এইসব ভূমিকার মধ্যে আছে রাজনৈতিক প্রচারকার্য, প্রর্থি মনোনয়ন, কিংবা প্রার্থীকে নির্বাচিত করার প্রচেষ্টা।

তবে, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হ'ল বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংরক্ষণে উদ্যোগী হওয়া। বস্তুত চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলি বিভিন্ন স্তরের মানুষের দাবিগুলি প্রকাশ করায়, সেইসব মানুষের দাবি অসন্তোষের আকারে ধূমায়িত হয়ে ওঠার অবকাশ পায় না এবং স্বাভাবিকভাবেই তাই রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের দাবি উত্থাপনের সুযোগ সংকুচিত হয়। আর সে কারণে বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ভারসাম্য বজায় থাকে।

পাশাপাশি চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হ'ল রাজনৈতিক পদে ও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করা। এই ধরনের কাজ গোষ্ঠীগুলির কর্মপদ্ধতির অংশ। কারণ হিসেবে বলা যায় পছন্দমত ব্যক্তিকে নিয়োগ করতে পারলে গোষ্ঠীর স্বার্থপূরণ অনেক সহজসাধ্য হয়।

সবশেষে; সরকারী প্রশাসনের ত্রুটি বিচ্যুতি দূর করার চেষ্টা। বিভিন্ন সময়ে স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশাসনকে উপদেশ দান, তথ্য সংগ্রহ ও সরকারকে তথ্য সরবরাহ ইত্যাদি চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী করে থাকে। এইসব কাজ থেকেই আধুনিক গণতন্ত্রে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সঠিক ভূমিকা উপলব্ধি করা যায়। সম্ভবত, সেজন্য অনেকের ধারণা আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের মতই চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীও অপরিহার্য।

১৬.৫ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কার্যপরিচালনার স্তর

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর প্রধান লক্ষ্য হ'ল সরকার গঠনের চেষ্টা না করেও গোষ্ঠীস্বার্থ যাতে পূরণ হয় তার ব্যবস্থা করা। এই প্রচেষ্টা আইনবিভাগ শাসনবিভাগ — যে কোনও একটি বা উভয়ের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন দেশে শাসনবিভাগের ক্ষমতা ও কার্যাবলীর বিস্তৃতি চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলিকে তাদের কর্মকেন্দ্রের পরিবর্তন করতে বাধ্য করেছেন। আর স্বাভাবিকভাবেই তাই তারা তাদের চাপ দেওয়ার ক্ষমতাকে এখন কেন্দ্রীভূত করেছে প্রশাসনের স্তরে। অবশ্য অন্যান্য স্তরেও তারা সমান সক্রিয় থাকে (...obviously activity at one level dose not preclude activity at another)।

প্রশাসনিক স্তরে প্রভাব বিস্তারের একটি সুপরিচিত ও সহজসাধ্য কৌশল হ'ল উচ্চপদাধিকারীদের সঙ্গে

ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও যোগাযোগ রক্ষা করা। ইংল্যান্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনেক সময় দেখা যায় গুরুত্বপূর্ণ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে মন্ত্রীদের নিয়মিত যোগাযোগ থাকে। মন্ত্রী বা আমলারাও নির্দিষ্ট কোনও বিষয়ে পরামর্শের জন্য বা কারিগরী তথ্যের জন্য অনেক সময় বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী বা চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সাহায্য নেয়। বলা বাহুল্য, এভাবে প্রশাসনের সঙ্গে স্বার্থান্বেষী বা চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ইংল্যান্ড বা ফ্রান্সের মতন কোনও কোনও দেশে এই সহযোগিতার সম্পর্ককে আনুষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়েছে 'স্থায়ী উপদেষ্টা কমিটি' (Permanent Advisory Committee) — র মত ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে। এইসব কমিটিতে একদিকে সরকারী প্রশাসকেরা থাকেন, অন্যদিকে থাকেন বিভিন্ন স্বার্থবাহী গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা। এইভাবে আনুষ্ঠানিক বা রীতিসিদ্ধ (formal) কমিটি ইত্যাদি এবং অনানুষ্ঠানিক (Informal) ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও যোগাযোগ মাধ্যমে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রশাসনিক সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। তবে মনে রাখা দরকার, অনানুষ্ঠানিক প্রভাব বিস্তারের প্রক্রিয়াটি চলে মূলত গোপনে, লোকচক্ষুর অন্তরালে।

অন্যদিকে, আইনসভার স্তরে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কার্যকলাপ অনেক বেশি প্রকাশ্যে হয়। স্বাভাবিকভাবে প্রচারের সময়টাও বেশি। আর বাস্তবে দেখা যায় কার্যকলাপের পরিমাণটা প্রচারের থেকে অনেক বেশিই। ইংল্যান্ড বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত উন্নত গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে এই ধরনের কার্যকলাপের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশি। এক সময় চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলি আইনসভাকে প্রভাবিত করত প্রতিনিধিদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের মধ্য দিয়ে। বর্তমানে জনসংযোগ প্রচার এবং সহানুভূতিশীল প্রতিনিধিদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে সহায্য দেওয়ার পদ্ধতি বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। অর্থাৎ আগে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে সংযোগের চেষ্টা করা হ'ত, এখন সহানুভূতিশীল ব্যক্তিকে প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচনের জন্য চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীকে সক্রিয় হতে হয়। সর্বোপরি প্রশাসন ও আইনবিভাগের সঙ্গে জড়িত প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে গিয়ে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলি যেসব কৌশল অবলম্বন করে, তার মধ্যে উৎকোচ বা উপঢৌকন প্রদান ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, আইনসভা স্তরে প্রভাব বিস্তারের একটি সুপরিচিত মাধ্যম হ'ল 'লবিং' (Lobbying)। ইউজিন ম্যাকার্থি (Eugence Mcearthy) – র মতে মার্কিন দেশে 'লবিস্টরা' বিভিন্ন স্বার্থের প্রতিভূ হিসেবে অত্যন্ত সক্রিয় : যারা মূলত ব্যক্তিগত সম্পর্ককে কাজে লাগিয়ে আইনসভার সদস্যদের প্রভাবিত করতে চায়। বলা বাহুল্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে Congressional lobby অতিমাত্রায় নিপুণ ও পেশাদারী মনোবৃত্তিসম্পন্ন।

অবশ্য, পাশাপাশি অন্য আর একটি প্রসঙ্গ এখানে স্মর্তব্য। অতিপ্রচার ও গোপনীয়তার অভাব কখনও কখনও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য পূরণে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। ব্যাপক প্রচার ও আইনসভার সদস্যদের সাথে যোগাগের ঘটনা প্রকাশ হওয়া কোনও গোষ্ঠীর রাজনৈতিক দুর্বলতার পরিচায়ক। তাছড়া, জাতীয় পর্যায়ে প্রচার অভিযান দক্ষতার সাথে সম্পাদিত না হ'লে শেষ পর্যন্ত তা চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলিকে ব্যর্থতার পর্যবসিত করে।

সরকারের বিচার বিভাগও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয় — যদিও এই স্তরে সব দেশেই সমানভাবে গোষ্ঠীর প্রভাব বিস্তারের সুযোগ থাকে না। মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের আইন ও সংবিধান ব্যাখ্য করার ক্ষমতা আইন ও শাসনবিভাগের আদেশ ও চুক্তিকে সংবিধান বিরোধী বলে ঘোষণা করবার ক্ষমতা চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলিকে তার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে প্রলুব্ধ করে। তিনটি উপায়ে এই ধরনের প্রভাব

বিস্তারের চেষ্টা করা হয় — (১) বিচারপতি নিয়োগের পদ্ধতির ওপর প্রভাব প্রয়োগ, (২) বিচারপতিদের কাছে উত্থাপিত বিষয়গুলির ভালমন্দ সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে নিরন্তর প্রচার এবং (৩) বিচার প্রক্রিয়াকে অব্যাহত এবং সক্রিয় হ'তে সাহায্য। ১৯৫৩ সালে পঞ্চাশ হাজার লোকের স্বাক্ষরযুক্ত আবেদন রোজেনবার্গ মামলায় সুপ্রীম কোর্টের কাছে উপস্থিত করা হয়েছিল। বিচারপতিদের নিয়োগের ক্ষেত্রে American Bar Association – এর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া Amici curiae – র (আদালতের বন্ধু) মত প্রতিষ্ঠান আপীলস্তরে মামলার সাথে জড়িত বিষয়ে আদালতকে আইনের জটিল দিক ও নজীর সম্পর্কে ওয়াকিবহাল রাখার চেষ্টা করে। কোনও কোনও দেশে সরাসরি আর্থিক সুযোগ — সুবিধা বা উপঢৌকন ইত্যাদি দিয়েও বিচারপতিদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করা হয়।

তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিচারপতিদের কার্যকালের নিরাপত্তা, দীর্ঘকালের ঐতিহ্য এবং নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে জবাবদিহির ব্যবস্থা না থাকার জন্য বিচারপতিদের পক্ষে গোষ্ঠীর চাপ প্রতিহত করা সম্ভব হয়। এম. ক্রিসলভ মনে করেন, সংখ্যালঘুদের প্রতি সুপ্রীম কোর্টের অনুকূল মনোভাব গোষ্ঠীকেন্দ্রিক চাপকে প্রতিহত করতে সাহায করে।

সব মিলিয়ে বলা যায়, একমাত্র উদার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেই সম্ভব। তবে, পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক দেশে গোষ্ঠীগুলির অবস্থানের মূল কারণ নিহিত তার সমাজ ব্যবস্থার চরিত্রের মধ্যে। ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত লাভালাভের উদ্যোগ, পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রেণীর অস্তিত্ব, শাসক শ্রেণীর বিভিন্ন অংশের আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই পশ্চাত্যের পুঁজিবাদী গণতন্ত্রে বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ সামাজিক দিক হ'তে মানুষের বৈপরীত্যমূলক অবস্থান ও স্বার্থের সংঘাত সমাজকে গোষ্ঠীকেন্দ্রিক ব্যবস্থায় নিমজ্জিত করে। আবার স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দেশের শিক্ষিত ও কারিগরি বিদ্যায় সুদক্ষ অংশ, সামরিক বাহিনী এবং অভিজাত সম্প্রদায় সরকারের ওপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শিল্পায়নের মন্দাহার, যোগাযোগের অভাব, সংগঠিতভাবে কাজ করার অক্ষমতা এবং সরকারের অসহিষ্ণু মনোভাব তাদের কাজের পথে অন্তরায় বলে মনে করা হয়। তবে, কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থা গোষ্ঠীকেন্দ্রিক চাপ থেকে মুক্ত একথা না বলা গেলেও তাদের (গোষ্ঠীগুলির) এক্তিয়ার অত্যন্ত সীমিত, কারণ শাসকচক্র গোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী নয়।

১৬.৬ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কার্য—পদ্ধতির নির্ধারক সমূহ

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী কোন্ পথে তার দাবি আদায়ের চেষ্টা করে এবং কোন্ কোন্ বিষয়ের ওপর গোষ্ঠীর কার্যপদ্ধতি নির্ভরশীল, সে সম্পর্কে যথাথ পরিচয় না পেলে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মূল্যায়ন সম্ভব নয়। অ্যালন বল (Alan R. Ball) এই রকম পাঁচটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন যেগুলর ওপর চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ভূমিকা ও গুরুত্ব নির্ভর করে। এগুলিকেই চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কর্মপদ্ধতি ও ভূমিকা — নির্ধারক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। বিষয়গুলি হ'ল — (১) রাজনৈতিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো (Political Institutional Structure); (২) দলব্যবস্থার প্রকৃতি (The nature of party system); (৩) রাজনৈতিক সংস্কৃতি (Political Culture); (৪) সমস্যার প্রকৃতি (Nature of the issue) এবং (৫) গোষ্ঠীর প্রকৃতি (Nature of the Group)।

নিম্নলিখিত উপায়ে বিষয়গুলি প্রাঞ্জল করা যায় ঃ

প্রথমত, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কার্যাবলী ও কর্মপদ্ধতি অনেকটা নির্ভর করে নীতি প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রয়োগকারী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর ওপর। ইংল্যাণ্ডে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা ও একটি মাত্র কেন্দ্রীয় সরকার ও মন্ত্রিপরিষদের হাতে চূড়ান্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকায় আইনসভার তুলনায় মন্ত্রী ও প্রশাসনিক প্রধানদের ওপর চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীবৃন্দ বেশী পরিমাণে নির্ভরশীল। অর্থাৎ সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় আইনসভার ওপর শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে চাপসৃষ্টিকারীদের চাপ কেনদ্র (Centre of pressure) শাসন বিভাগের ওপর নিবদ্ধ থাকে। আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা বিভাজন থাকায় এবং আইনবিভাগও গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী হওয়ায়, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী সমানভাবে আইন ও শাসন বিভাগের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, মার্কিন আইনসভা বা কংগ্রেস কমিটি ব্যবস্থা খুব শক্তিশালী হবার দরুন অনেক চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীরই লক্ষ্য থাকে এইসব কমিটিগুলি।

প্রসঙ্গত, একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, সরকারের কোনও নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে চূড়ান্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থকলে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কাজ প্রধানত তাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। আবার ক্ষমতা বিভিন্ন কাঠামোর মধ্যে বন্টিত থাকলে এক অংশের বিরুদ্ধে অন্য অংশকে প্ররোচিত করা এবং কোনও বিশেষ সিদ্ধান্ত ভণ্ডুল করে দেবার মধ্যে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী তার কাজ সীমাবদ্ধ রাখে। সর্বোপরি, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী সমানভাবে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্তরে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। স্বাভাবিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নীতি নির্ধারণের ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণের ফলে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর প্রচেষ্টাও বিকেন্দ্রিত হ'তে বাধ্য। সব মিলিয়ে তাই বলা যায়, বিভিন্ন দেশের চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর পদ্ধতিতে তারতম্য আছে এবং একই দেশে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কাঠামোগত পরিবর্তনের সাথে সঙ্গতি বজায় রেখে গোষ্ঠীর পদ্ধতিও পরিবর্তিত হয়।

দ্বিতীয়ত, দল ব্যবস্থার প্রকৃতিও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ভূমিকাকে অনেকটা নির্ধারণ করে। এই ভূমিকা দু'টি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল; যার একটি হ'ল প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলের সঙ্গে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সম্পর্ক এবং শ্রমিক দলের পক্ষে বিভিন্ন শ্রমিক সংস্থার প্রচার অভিযান ব্রিটেনের নির্বচনী যুদ্ধের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। আবার ফ্রান্সের সর্বপেক্ষা শক্তিশালী শ্রমিক সংগঠন সি.জি.টি. কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত একটি শ্রমিক সংঘ। ভারতেও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও শ্রমিক সংগঠনগুলি মধ্যে নিবিড় সম্পক: সুপরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত।

অন্যদিকে রাজনৈতিক দলের মতাদশ। শৃঙ্খলা ও সংগঠন চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর প্রভাব ও প্রতিপত্তি অনেকাংশে নির্ধারণ করে দেয়। যেমন, বহু দলীয় ব্যবস্থায় সরকারের স্থায়িত্বের অভাব, দুর্বল সাংগঠনিক ভিত্তি গোষ্ঠী শিকারের সীমানাকে প্রসারিত করতে সাহায্য করে। তুলনায় দ্বিদলীয় ব্যবস্থায় গোষ্ঠীর চাপের কাছে নতি স্বীকারের সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম, কারণ এই ব্যবস্থার শৃঙ্খলা ও মতাদর্শগত সংহতি। অভিজ্ঞাতায় দেখা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেস কেবল আঞ্চলিক চাপের কাছে মাথা নত করে না, দলীয় কাঠামোর দুর্বলতা, শৃঙ্খলার অভাবও প্রধান দু'টি দলের মধ্যে মতাদর্শগত পার্থক্য কংগ্রেস সদস্যদের বিবিধ চাপের কাছে সহজেই আত্মসমর্পণে বাধ্য করে। অবশ্য, আনেক দেশে দলের সাংগঠনিক ও মতাদর্শগত ঐক্য তথা দলীয় সদস্যদের আপসহীন মনোভাব বিভিন্ন গোষ্ঠীর চাপ সহজেই প্রতিহত করতে পারে।

তৃতীয়ত, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সাফল্য ও ব্যর্থতা অনেকখানি নির্ভর করে বিদ্যমান রাজনৈতিক সংস্কৃতির ওফর। বস্তুত, রাজনৈতিক সংস্কৃতি জনসাধারণের রাজনৈতিক মনোভাব প্রকাশ করে। কোনও কোনও দেশের জনসাধারণের রাজনৈতিক মনোবৃত্তি চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কাজে সহায়ক — আবার কোথাও বা এই ধরনের গোষ্ঠীর অবস্থান জনসাধারণের মধ্যে ব্যপক বিরোধিতার সৃষ্টি করে। অর্থাৎ, সমস্ত ব্যাপারটাই এইসব গোষ্ঠঈ ও বৃহত্তর জনসাধারণের পারস্পরিক সম্পর্ক ও মনোবৃত্তির ওপর নির্ভরশঈল। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর অস্তিত্ব ও কার্যকলাপ উল্লেখযোগ্য বিরোধিতার সামনে পড়ে না, বরং তাকে রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অংশরুপে গণ্য করা হয়। অথচ এশিয়া, আফ্রিকার অনুন্নত দেশগুলিতে সাধারণ শিক্ষার অভাব, রাজনৈতিক চেতনার নিম্নমান, রাজনৈতিক দলের শ্লথগতি, যেমন জনসাধারণের সুচিন্তিত মনোভাব অনুধাবনের পথে অন্তরায়, তেমনই চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলির কার্যকালাপ ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিকূল।

পাশাপাশি রাজনৈতিক সংস্কৃতি প্রকৃতি নির্ধারণ করে দেয় দাবি আদায়ের কোন্ পদ্ধতি চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলি গ্রহণ করবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ফ্রান্সে প্রত্যক্ষসংগ্রামের পদ্ধতির ব্যবহার ইংল্যান্ড বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় অনেক বেশি। ভারতেও শ্রমিক ধর্মঘট বা ছাত্র বিক্ষোভের ঘটনা অপ্রতুল নয়। তাই বলা হয়, জনসাধারণেরা মনোভাব এই ধরনের সংগ্রামের অনুকূল হ'লে স্বাভাবিকভাবেই সাফল্য বেশি আসে।

চতুর্থ, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কার্যকলাপের নির্ধারক হিসেবে সমস্যার প্রকৃতিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। যেমন, কোনও গোষ্ঠীর লক্ষ্য যদি হয় প্রচলিত ব্যবস্থার বিরোধিতা, তাহলে সেই গোষ্ঠী সরকারী সিদ্ধান্তে খুব একটা প্রস্তাব ফেলতে পারে না। অন্যদিকে ব্যবস্থার সমর্থন লক্ষ্য হ'লে এর বিপরীত ফল দেয়। তাই চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলিকে প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট সমস্যার প্রতি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে থাকে। এবং

পঞ্চমত, গোষ্ঠীর প্রকৃতির। নির্ধারক অনুযায়ী বলা হয়, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর লক্ষ্য পূরণের পদ্ধতি তার লক্ষ্যের প্রকৃতির ওফর নির্ভরশীল। বিদ্যমান সরকারী কাঠামোর অনুকূল বা প্রতিকূল গোষ্ঠীর যে কোনও লক্ষ্যের সার্থকতা শেষাবধি নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর বুঝবার শক্তির ওপর। সাধারণভাবে একটি গোষ্ঠীর আকৃতি ও অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গোষ্ঠী সদস্যদের ভূমিকা এই শক্তির মাত্রা নির্ধারণ করে দেয়। যেনম , ব্যাঙ্ক কর্মীদের সংগঠন যে কোনও সময় সরকারকে বিপদে ফেলে দিতে পারে; কারণ ব্যাঙ্ক কর্মীরা এমন ধরনের আর্থিক কার্যাদির সঙ্গো জড়িত যে, সরকারের সঙ্গো অসহযোগ করলে সরকার বাধ্য হয় তাদের দাবি মেনে নিতে। সম্ভবত, সেজন্য সরকার চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলির সাহায্য ও সহযোগিতা সতত দাবি করে।

১৬.৭ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী ও রাজনৈতিক দলের সম্পর্ক

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্টী ও রাজনৈতিক দল একই রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে কাজ করলেও তাদের মধ্যে মৌল পার্থক্য আছে. বস্তুত, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে নিজেদের দাবি ও মনোবৃত্তিকে প্রকাশ করে। অন্যদিকে রাজনৈতিক দলের কাজ হ'ল বিভিন্ন চারসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর দাবি ও কর্মসূচীকে আরও ব্যাপক ও ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচীতে পরিণত করে ভোটদাতাদের কাছে উপস্থিত করা। এইজন্যই স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর গ্রন্থিকরণ (Interest Group Articulation) ও দলীয় সমষ্টিকরণ (Party aggaregtion) চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী

ও রাজনৈতিক দলের পার্থক্য নির্ধারণের মাপকাঠি হিবেবে ব্যবহৃত হয়। অ্যালান বল মনে করেন, স্বার্থের গ্রন্থিকরণ (Interest Articulation) উদার গণতান্ত্রিক দেশে সামগ্রিকতাবাদী দেশের তুলনায় অনেক বেশি সুস্পষ্ট।

বাস্তবিক, সাংগঠনিক দিক থেকে বিচার করলে উভয়ের পার্থক্য বোঝা যায়। রাজনৈতিক দলের সংগঠন চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর তুলনায় অনেক বেশী ব্যাপক। তাছাড়া রাজনৈতিক দলের সদস্যসংখ্যা চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর তুলনায় বেশি। সংগঠন হিসেবে রাজনৈতিক দলের প্রাথমিক কর্তব্য হ'ল প্রার্থী বাছাই করা এবং তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে সরকার গঠন ও পরিচালনা করা, সরকারের কর্মপন্থা ও নীতি নির্ধারণ করা। পক্ষান্তরে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর দায়িত্ব হল সরকারের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে নিজের স্বার্থের অনুকূলে নিয়ে আসা। প্রকৃতপক্ষে, চাপসৃষ্টিকারী উদ্ভবই ঘটে সমাজ জীবনে প্রাথমিকভাবে অর্থনৈতিক বা অন্যান্য গোষ্ঠীস্বার্থকে ভিত্তি করে। পরে তা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল হয়।

আবার উদ্দেশ্যের দিক থেকেও রাজনৈতিক দল চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী বা স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর তুলনায় ব্যাপক। সমজাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের প্রয়োজনে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। সংকীর্ণ গোষ্ঠীস্বার্থের অন্তর্ভুক্ত কোনও বিষয়ই তার বিবেচ্য — বৃহত্তর সামাজিক বা জাতীয় স্বার্থ তার বিবেচ্য নয়। রাষ্ট্রনীতিবিদ নিউম্যান তাই বলেন, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী মূলত সমজাতীয় স্বার্থের প্রতিভূরূপে প্রভাব সৃষ্টির চেষ্টা করে। তার লক্ষ্য নির্দিষ্ট প্রভাব বিস্তার করে সরকারী সিদ্ধান্তকে নিজের স্বার্থরক্ষার সহায়ক করা। বস্তুত, গোষ্ঠীর স্বার্থ ও লক্ষ্যের ওপর প্রভাব বিস্তারের স্তর ও ক্ষেত্র নির্ভরশীল। অপরদিকে, রাজনৈতিক দল কোনও বিশেষ গোষ্ঠীর স্বার্থের আজ্ঞাবহ থাকে না, বরং তা বিভিন্ন প্রকার গোষ্ঠীর কাজ ও স্বার্থের সমন্বয়সাধনের চেষ্টা করে। স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও মতাদর্শের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ থেকে নিজের কর্মসূচীকে বাস্তবায়িত করাই হ'ল রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য।

অর্থাৎ রাজনৈতিক দল একটি নির্দিষ্ট মতাদর্শের ওপর গড়ে ওঠে এবং সংশ্লিষ্ট মতাদর্শগত কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা নেয়। কর্মসূচীর বাস্তবায়ন প্রকৃতপক্ষে তার আস্তিত্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। অথচ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সদস্যরা কোনও না কোনও রাজনৈতিক মতাদর্শের পৃষ্ঠপোষকতা করলেও সেই মতাদর্শ সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর ভিত্তি হিসেবে কাজ করে না। কেবল কোনও সুনির্দিষ্ট স্বার্থরক্ষাই তার চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। সেজন্য রাজনৈতিক দলকে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর তুলনায় আরও বেশী বিষয় ও সমস্যার সমাধানের জন্য নীতি প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়।

দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক দল অত্যন্ত সংগঠিত। তার সদস্যপদ প্রাপ্তির ব্যবস্থা কঠিন হ'লেও সদস্যসংখ্যা সীমিত সংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না তদুপরি দলীয় সদস্যরা কঠোর দলীয় শৃঙ্খলার দ্বারা আবদ্ধ। তুলনায় চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সদস্যসংখ্যা সীমিত এবং গোষ্ঠীগত শৃঙ্খলাও এখানে কঠোর ও জটিল নয়। তাছাড়া তার সাংগঠনিক ভিত্তি হয় শিথিল প্রকৃতির।

তৃতীয়ত, রাজনৈতিক দল প্রত্যক্ষভাবে সরকারী ক্ষমতা দখল করে নিজস্ব কর্মসূচীকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করে। প্রয়োজন হ'লে কয়েকটি সমমনোভাবাপন্ন রাজনৈতিক দল একত্রিত হয়ে কোয়লিশন বা মোর্চা সরকার গঠন করে যৌথভাবে ক্ষমতা ভোগ করে। অথচ, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষমতা

দখল করতে রাজি হয় না — বরং সরকারী নীতিকে প্রভাবিত করাই তার লক্ষ্য। অবশ্য, বিভিন্ন চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর পক্ষে যৌথ মোর্চা গঠন করা সম্ভব নয়, কারণ প্রত্যেকেই বিশিষ্ট স্বার্থের প্রতিভূ বলে পারস্পরিক সমঝোতার সুযোগ ও সম্ভাবনা এখানে কম থাকে।

চতুর্থত, রাজনৈতিক দলের কর্মপদ্ধতি অপেক্ষাকৃত খোলামেলা এবং তাদের বক্তব্যও অনেক বেশী সুনির্দিষ্ট। কিন্তু, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কাজের পদ্ধতি পরোক্ষ এবং সাধারণত গোপনীয়। তাই রাজনৈতিক দল যেখানে তার উদ্দেশ্যকে জনসাধারণের কাছে তুলে ধরে তাদের সমর্থন পেতে চায়, সেখানে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর লক্ষ্য ও পদ্ধতি জনসাধারণের কাছে সব সময় স্পষ্ট হয়ে ওঠে না।

পঞ্চমত, কোনও রাজনৈতিক দলের মধ্যে এক বা একাধিক চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী অবস্থান করতে পারে এবং তারা পরস্পর বিরোধী স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত হয়ে দলের নীতি ও সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হ'তে পারে। অনেক সময় দেখা যায়, কোনও কোনও রাজনৈতিক দল বিভিন্ন গোষ্ঠীর রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সদস্যসংখ্যা সীমিত হওয়ায় এবং কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত থাকার জন্য আভ্যন্তরীণ কোন্দলের সুযোগ কম।

ষষ্ঠত, রাজনৈতিক দল কর্মসূচীর ভিত্তিতে নির্বাচনে অংশ নেয়। চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সেভাবে নির্বাচনে অংশ নেবার সুযোগ কম। পরিবর্তে তার সদস্যরা কোনও দলের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনী আসরে নামতে পারে। কিংবা গোষ্ঠী নেপথ্যে থেকে নির্বাচনকে প্রভাবিত করার চেষ্টা বা সরাসরি কোনও দলের পক্ষে প্রচারে নামতে পারে।

সপ্তমত, রাজনৈতিক দলের সিদ্ধান্তগ্রহণের ব্যবস্থা চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর তুলনায় জটিল ও সময়সাপেক্ষ। এর কারণ দলের বিভিন্ন অংশের ভারসাম্য বজায় রেখে তাকে কোনও বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়।

অষ্টমত, অনেক সময় আঞ্চলিক মনোভাবের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী গড়ে ওঠে।

তবে, আর একটি প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। নাগরিকদের রাজনৈতিক ভূমিকায়অবতীর্ণ করানো হ'ল রাজনৈতিক দলের অন্যতম এক প্রধান কাজ। ইংরাজিতে এই ধরনের কাজকে বলা হয় Political Recruitment। তাছাড়া নাগরিকদের সামনে বিকল্প কর্মসূচী পেশ করা, তাদের সক্রিয় ও সংগঠিত করাও হ'ল দলের দায়িত্ব। অথচ, সক্রিয় ও সংগঠিত করার ক্ষেত্রে গোষ্ঠীর ক্ষমতা খুব সামান্য। অবশ্য রাজনৈতিক নিয়োগের ক্ষেত্রে গোষ্ঠীর ভূমিকা ও প্রভাবের প্রশ্নটিকে অস্বীকার করা যায় না।

উপরিউক্ত পার্থক্য সত্ত্বেও অনেক সময় রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মধ্যে তফাৎ বোঝা কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে। যেমন, প্রশ্ন ওঠে, ভারতের রিপাবলিকান পার্টিকে বা ঝাড়খণ্ড পার্টিকে কী দল মর্যাদা দেওয়া হবে, না চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী বলা হবে? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বার্চ সোসাইটির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। তবে, একথা সত্য যে উন্নত দেশের তুলনায় উন্নয়নশীল দেশগুলিতেই রাজনৈতিক দলগুলির দুর্বলতা এই পার্থক্য নিরূপণের প্রশ্নটিকে অস্বচ্ছ করে।

১৬.৮ অনুশীলনী

১। চাপসসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী বলতে কী বোঝায়? আধুনিক রাষ্ট্রে এদের প্রকৃতি ও ভূমিকা নির্দেশ করুন।

২। চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী বলতে কী বোঝায়? উদার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই গোষ্ঠীগুলির কার্যাবলী আলোচনা করুন।

৩। চাপগোষ্ঠীর সংজ্ঞা দিন। উদার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাগুলিকে চাপগোষ্ঠীর ক্রিয়াকলাপের প্রকৃতি ও স্তরগুলি লিখুন।

৪। চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সংজ্ঞা দিন। রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী মধ্যে পার্থক্য দেখান।

৫। রাজনৈতিক দলের থেকে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহ কী অর্থে ভিন্ন? উদারনীতিক গণতন্ত্রে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলি যেসব পদ্ধতি ব্যবহার করে সংক্ষেপে তার আলোচনা করুন।

১৬.৯ গ্রন্থপঞ্জী

1. Almod, G. A & Powell, G. B. (Jr.) : Comparative Politics, 1975.

2. Bell, Allen R. : Modern Politics and Government, Macmillan, 1973.

3. Key, V.O. : Politics, Parties and Pressure Groups, 1964.

4. Mackenzie, W.J.M. : 'Pressure Groups : The Comparatiave Framework', in *Political Studies, 1955.*

5. চক্রবর্তী, হিমাচল : রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ১৯৯৫।

NOTES

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....